লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

জলসা বিশেষ সংখ্যা

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১৪-১৫ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ৬ জমা. আউ., ১৪৩৭ হিজরি | ১৫ তবলিগ, ১৩৯৫ হি. শা. | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ঈসাব্দ

৯২তম সালানা জলসা ২০১৬ মুবারক হোক

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)-১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৯২তম জলসা সালানা ২০১৬ সফল হোক

মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৯২তম জলসা আগামী ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে এই মহতী জলসার সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করছি এবং সকলের কাছে দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

জলসার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "এ জলসার লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জামা'তের সদস্যগণ যেন এভাবে বার বার পরস্পর সাক্ষাতের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে এমন এক পবিত্র-পরিবর্তন সাধন করে, যাতে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরকালের দিকে ঝুঁকে যায়। আর তাদের ধর্মভীরুতা, তাকওয়া, খোদাভীতি, পরহেযগারী, সহানুভূতি, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধে তারা যেন অন্যদের জন্য একটা আদর্শে পরিণত হয়। নম্রতা, বিনয় ও সততা যেন তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর ধর্মীয় উৎকর্ষের জন্য তারা যেন পরিশ্রমের রাস্তা বেছে নেয়" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-৬ পৃঃ ৩৯৪)।

তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, "যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে বন্ধুদের কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথাবার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমনসব মূল্যবান সত্যনিষ্ঠ তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনানো হবে যা আস্থা, ঈমান ও ধর্মীয়-ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক। এছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। আরহামুর রাহেমীন (সবচেয়ে বড় দয়ালু)-এর দরবারে বিশেষ আকুতি জানানো হবে, আল্লাহ্ যেন এদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং নিজ বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং এদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করেন। একটি সাময়িক উপকার এটাও তারা লাভ করবেন, প্রতি বছর যেসব নতুন নতুন ভাই জামাতে শামিল হয়েছেন, নির্ধারিত তারিখে এখানে এসে তাদের সাথে দেখা করবেন, পরিচিত হবেন এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে উন্নতি লাভ করবেন। ...এ আধ্যাত্মিক জলসায় আরো অনেক আধ্যাত্মিক উপকার লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল ক্বাদীর সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে" (ইশতিহার ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯১ইং, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৫২)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসা সম্পর্কে আরো বলেছেন, "এ জলসার আহ্বান ও আসল উদ্দেশ্য ছিল এইঃ আমাদের জামা'তের লোক এভাবে বার বার সাক্ষাতে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন লাভ করে, যেন তাদের মন আখেরাতের প্রতি পূর্ণভাবে ঝুঁকে যায় আর তাদের মাঝে খোদা তা'লার ভয় সৃষ্টি হয়। তারা সাধনা, তাকওয়া, খোদাভীতি ও পরহেযগারী আর কোমল হৃদয় ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে যায়। বিনয়, নম্রতা ও নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়, আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে উৎসাহ লাভ করে।"

আমাদের প্রাণ প্রিয় হুযূর (আই.) আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করে এই বিশেষ জলসায় তাঁর সন্মানিত প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন, এজন্য আমরা হুযূর (আই.)-এর শুকরিয়া আদায় করছি আর আল্লাহ তাআলার সকাশে সেজদাবনত হয়ে তাঁর আরও করুণা যাচনা করছি। এই মহতী জলসায় আগত দেশ-বিদেশের মেহমানদের জানাই সুস্বাগতম।

আমরা আরো অবগত হয়েছি যে, জলসার সমাপ্তি ভাষণ এবং দোয়া পরিচালনা করবেন আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল এর শক্তিশালী নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে তা সারা বিশ্ব জুড়ে Live telecast হবে এবং বিশ্বের সকল আহমদীসহ গোটা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করবে এবং হুযূর (আই.)-এর পবিত্র দর্শন লাভ করে ধন্য হবে যা আমাদের এই জলসাকে প্রকৃতই এক রূহানী আলোকমালায় উদ্ভাসিত করবে, ইনশাআল্লাহ্।

আসন্ন এই জলসার সার্বিক সফলতার জন্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে আমাদের সকরুণ দোয়া-তিনি নিজ করুণায় এই জলসাকে আধ্যাত্মিকতার সমূহ কল্যাণে ভূষিত করুন।

জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ

সূচিপত্র

৩১ জানুয়ারি ও ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৫ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৯

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ২১

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও চলমান পরিস্থিতি
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী ৩০

**জামেয়া আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের
৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.)-এর
প্রদত্ত ভাষণ** (১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৪) ৩৪

**মজলিস আনসারুল্লাহর ৭৫ বছর পুর্তি উপলক্ষে
হুযূর (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ** ৪০

**মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ৩৭তম
বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযূর (আই.)-এর কল্যাণময় বাণী** ৪৮

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী ৫০

কলমের জিহাদ
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান ৫২

কোন্‌টা ঠিক?
মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ ৫৫

দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণে পুণ্য অর্জিত হয়
মাহমুদ আহমদ সুমন ৫৮

বর্তমান বাইবেলের সংকলন ও এর ঐশী অবস্থান
মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ ৬০

ইসলাম প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও শান্তি নিশ্চিত করে
মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু ৬২

পবিত্র কুরআন ও দোয়া
মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন ৬৫

বাজামাত নামায আদায় করা
মৌলবী এনামুল হক রনি ৬৭

**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের
শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস**
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল ৬৯

সন্তানদের উত্তম তালিম তরবিয়ত
আব্দুস সামাদ ৭১

আল্লাহ্‌পাকের দাসত্ব প্রসঙ্গে
খালিদ আহমেদ সিরাজী ৭৩

মালী কুরবানীর এক উন্নত দৃষ্টান্ত
ডা. শেখ হেলালউদ্দিন আহমদ ৭৪

একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়-দায়িত্ব
রেজোয়ানা করিম রোদেলা ৭৫

**পাঠক কলাম–
"আত্মসংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব।"** ৭৬

**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের উদ্যোগে
শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত** ৮০

আঞ্চলিক সালানা জলসা ৮৩

সংবাদ ৮৯

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৯৪

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর অফিস আদেশ ৯৫

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৯৬

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

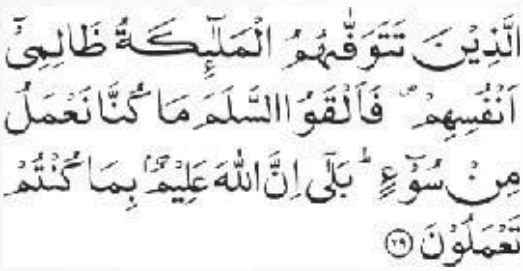
الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ
اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
مِنْ سُوْٓءٍ ؕ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ۝٢٩

২৯। নিজেদের ওপর যুলুমে রত থাকা অবস্থায় ফিরিশ্‌তারা যাদের মৃত্যু দেয় তারা (এই বলে) সন্ধিপ্রস্তাব করবে, 'আমরা কোন মন্দ কাজ করতাম না।' (তখন তাদের বলা হবে) 'অবশ্যই (করতে)। তোমরা যা করতে আল্লাহ্ নিশ্চয় তা ভালভাবে জানেন[১৫৪১]।

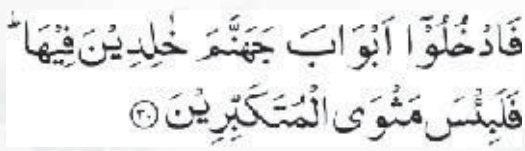
فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝٣٠

৩০। অতএব তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ কর। তোমরা সেখানে দীর্ঘকাল থাকবে। আর অহংকারীদের ঠাঁই অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট।'

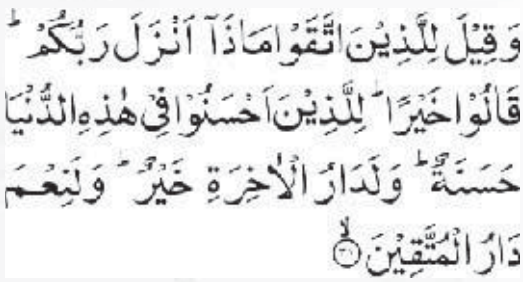
وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ
قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝٣١

৩১। আর যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে তাদের (যখন) বলা হবে, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন' তখন তারা বলবে 'সর্বতোভাবে কল্যাণ'। যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য ইহকালেও রয়েছে কল্যাণ আর নিশ্চয় পরকালের আবাসস্থল হবে (তাদের জন্য) আরো উত্তম। আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উৎকৃষ্ট!

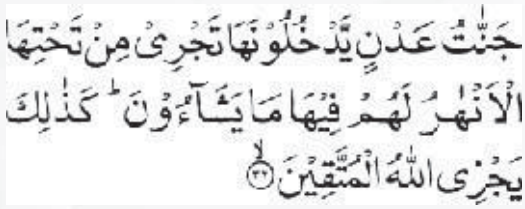
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ
يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝٣٢

৩২। তারা এমন সব চিরস্থায়ী বাগানে প্রবেশ করবে যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে[১৫৪২]। আল্লাহ্ এভাবেই মুত্তাকীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন,

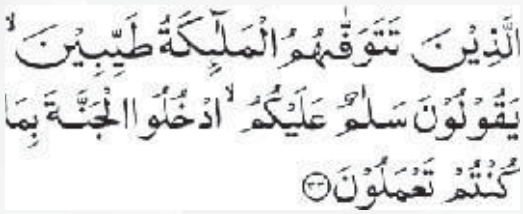
الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ
يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝٣٣

৩৩। (অর্থাৎ) পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশ্‌তারা যাদের মৃত্যু দেয় (তাদেরকে) এরা বলে, 'তোমাদের জন্য চির শান্তি! তোমাদের কৃতকর্মের দরুন তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।'

১৫৪১। অবিশ্বাসীরা আপত্তি করে বলবে, তারা যা কিছু করেছিল তা নির্দোষ মনে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই করেছিল এবং তারা শুধু ঐশী গুণাবলীর প্রতি একনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্যকারীরূপে তাদের মিথ্যা উপাস্যগুলোর পূজা করেছিল। এই আয়াত কাফিরদের ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১৫৪২। মুত্তাকীর আকাঙ্ক্ষা যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভিন্ন সেহেতু তারা কেবল সেই সকল জিনিসের আকাঙ্ক্ষাই করবে যেগুলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী হবে।

হাদীস শরীফ

ফিরিশ্‌তাগণ সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'লার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন, যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান, যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে, তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তারা একে অপরকে আবৃত করেন।

এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী-আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা ঃ এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তা'লা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)।

অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায়, তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলে যান। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমার ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচ্‌না করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি যাচ্‌না করছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচ্‌না করছিল'।

আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না, তারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না, তারা তা দেখে নি।'

তিনি বলেন, 'তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচ্‌না করেছে, তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল, তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি (আল্লাহ্) বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারা তো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন, সেও বঞ্চিত হবে না।"

(মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)।

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে-ও তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল। তিনি বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারা তো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন, সেও বঞ্চিত হবে না।"

অমৃতবাণী

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জলসায় যোগদানের কল্যাণ সম্পর্কে বলেন-

জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞানে ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে, যা ঈমানে প্রতীতি ও তত্ত্বজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি দানের জন্য আবশ্যক। আর ঐসব বন্ধুর জন্য বিশেষ দোয়া ও বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যতটুকু সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার সমীপে চেষ্টা করা হবে। যেন খোদা তা'লা তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। আর তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। এ সব জলসায় যোগদানের ফলে তাদের একটি সামাজিক কল্যাণ এটাও লাভ হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামা'তে শামিল হবেন, ঐ নির্ধারিত তারিখে একত্রিত হয়ে তারা তাদের পুরাতন ভাইদের মুখ দেখে নিবেন আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, এ জলসায় তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে।

"এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না। এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত।"

আর সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার এবং তাদের অভ্যন্তরস্থ অজ্ঞতাপূর্ণ কাঠিন্য ও কপটতা দূরীভূত করার জন্য মহামহিম ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে সাহায্য যাচনা করা হবে। এছাড়া বহু আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হবে, যা ইনশাআল্লাহুল কৃদীর সময়ে সময়ে প্রকাশিত হতে থাকবে।

জলসায় যোগদানে আকাঙ্খী স্বল্প আয়ের লোকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন-

কম আয়ের লোকদের জন্য উচিত হবে তারা যেন পূর্ব থেকেই জলসায় যোগদানের চেষ্টায় রত থাকেন। আর যদি প্রচেষ্টা ও স্বল্পে-তুষ্ট পদ্ধতিতে খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে পথ খরচের জন্য প্রত্যেক দিন বা মাসে মাসে কিছু না কিছু জমা করে পৃথক করে রেখে দেন, তাহলে সময়মত পথ খরচের টাকা এমনিতেই যোগাড় হয়ে যাবে। ... এছাড়া প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার পথ খরচের সামর্থ আছে সে যেন নিজের লেপ (গরম কাপড়) প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইত্যাদি সহকারে অবশ্যই এতে যোগদান করে এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পথে সামান্য বাধা-বিপত্তির পরওয়া না করে। খোদা তা'লা পুণ্যবান বান্দার প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব দেন এবং তাঁর পথে কৃত কোন পরিশ্রম ও দুঃখ-ক্লেশ বিফলে যায় না। এ জলসাকে সাধারণ সম্মেলনাদির ন্যায় মনে করো না, এটা এমন বিষয়, যা সত্যের বিশুদ্ধ সাহায্য ও সহায়তা এবং ইসলামের বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এ জামা'তের ভিত্তি প্রস্তর খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হস্তে রেখেছেন এবং এ জন্য জাতিসমূহকে তৈরী করা হয়েছে, যারা শীঘ্র এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।

(মজমুয়া ইশ্‌তিহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৩৪১-৩৪৩)

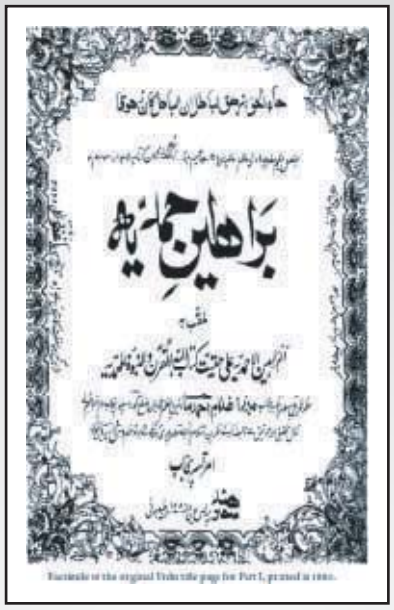

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১০ম কিস্তি)

ভাইয়েরা! সার কথা হলো, আমি যখন মানুষকে এহেন ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিপতিত দেখলাম এবং এমন ভ্রষ্টতার মাঝে নিমজ্জিত পেলাম যা দেখে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় আর দেহ-মন কেঁপে উঠে; তখন তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করাকে নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব ও অলঙ্ঘনীয় ঋণ জ্ঞান করলাম যা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। এভাবে কয়েক দিনের ভেতর স্বল্প সময়ের মাঝে বরং স্বল্পতম সময়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই বইয়ের পান্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেলো যা সচরাচর হয় না। সত্যিকার অর্থে এ গ্রন্থ সত্য সন্ধানীদের জন্য একটি শুভসংবাদ আর ইসলামের অস্বীকারকারীদের জন্য (এর সত্যতার) এক ঐশী প্রমাণ; কিয়ামত পর্যন্ত এর উত্তর তারা দিতে পারবে না ।একারণেই এর সাথে দশ হাজার রূপী পুরস্কারের একটি ঘোষণাও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল যেন তা ইসলামের সত্যতার অস্বীকারকারী সকল শত্রুর জন্য এর সত্যতার প্রমাণ সাব্যস্ত হয় আর তারা যেন স্বীয় মিথ্যা ধারণা ও অলীক বিশ্বাস নিয়ে অহংকার ও আত্মপ্রতারণায় নিমগ্ন না থাকে।

১. হে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানী! এ গ্রন্থটি মনোযোগ ও যত্নসহকারে পাঠ কর।

২. আমার গ্রন্থে যদি একবার তোমার চোখ পড়ে; তাহলে তুমি অবগত হবে যে, এটিই জান্নাত লাভের পথ।

৩. কিন্তু শর্ত হলো সুবিচার ও সততা, কেননা সুবিচার বুদ্ধিমত্তার চাবিকাঠি।

৪. জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে দু'টো বিষয়ই তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকে; একটি হলো জ্যোতির্মন্ডিত হৃদয় আর অপরটি হলো দূরদৃষ্টি।

৫. যার মাঝে বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতা রয়েছে সে সত্য ও সঠিক পথ ছাড়া আর কিছুই সন্ধান করে না।

৬. সে সেই পথকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করে না যা পবিত্র ও সহজ-সরল,

যা সত্য ও সঠিক, সে পথ হতে মুখ ফেরায় না ।

৭. কোন কিছু সত্যনিষ্ঠতার দৃষ্টিকোন থেকে দেখার পর সে আর অনর্থক হঠকারিতা প্রদর্শন করে না।

৮. শুন! যে খোদার সমীপে মুক্তির প্রত্যাশী । মুক্তির প্রাসাদে সঠিক দ্বার পথে প্রবেশ কর।

৯.সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও আর সত্যকে হৃদয়ে স্থান দাও; নোংরা প্রকৃতির

লোকদের ন্যায় মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

১০.কখনও কোন কুৎসিতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ো না; সৌন্দর্য পৃথিবী থেকে হারিয়েই বা যাক না কেন।

১১. কাঁটা ও গোক্ষুরের বীজ বপন করা থেকে জমি খালি রাখাই শ্রেয়।

১২. যদি তোমার বিবেকের চোখ খুলে যেতো তাহলে তুমি বিনয় ও সমর্পিত হৃদয় নিয়ে খোদার পথ সন্ধান করতে।

১৩. আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে তাঁকে সন্ধান করতে; আর স্বপ্নেও তাঁর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতে না।

১৪. কিন্তু যতক্ষণ না খোদার কোন নিদর্শন পেতে, তাঁকে ছেড়ে তুমি এক মুহূর্ত স্বস্তি পেতে না।

১৫. মৃত্যু তোমার মাথায় ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অধিকন্তু তোমার অস্তিত্ব একটি বুদবুদ-তুল্য; কিন্তু তুমি এমন মানুষ যে ঔদাসিন্যের নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

১৬. তোমার পূর্ব পিতা পিতামহদের দেখ; যে কীভাবে তারা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে!

১৭. তাদের পরিণামের কথা তুমি ভুলে গেছ; কতো কত স্বল্প সময়ে তা ভুলে বসেছ!

১৮. মৃত্যুর মোকাবিলায় তোমার কাছে কী কৌশল ও পরিকল্পনা রয়েছে? তাকে বাধা দেয়ার জন্য তুমি কি কোন অনতিক্রম্য প্রাচীর দাঁড় করিয়েছো?

১৯. যখন মৃত্যুরূপী কুমীর মানুষকে আকস্মিকভাবেই টেনে নিয়ে যায়; সেখানে মানুষ কেন এমন অহঙ্কারে লিপ্ত হয়?

২০. হে যুবা! এই নীচ পৃথিবীর প্রতি আসক্ত হয়ো না; এর সব রং-তামাশা সহসাই হারিয়ে যাবে।

২১. এ পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী হয় না আর সময়ও একরকম কাটে না।

২২. ব্যাথাতুর হৃদয় নিয়ে আমরা নিজ হাতে অনেককেই মাটির হাতে সঁপে দিয়েছি। (কবর দিয়েছি)।

২৩. যেখানে আমরা স্বয়ং অগণিত মানুষকে দাফন করেছি সেখানে কেন আমরা শেষ দিবসের কথা স্মরণ রাখবনা?

২৪. তাদের স্মৃতি মন থেকে আমরা কেন মুছে ফেলব? আমাদের দেহ তো লোহা বা কাসা নির্মিত নয়।

২৫. হে বিরোধী! খোদার ক্রোধকে ভয় কর; কেননা আমাদের খোদার শাস্তি বড় কঠোর।

২৬. প্রতিপালককে ভয় না করার কারণে অগণিত শহর ও দেশ ধ্বংস হয়েছে।

২৭. এমন ধৃষ্টদের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই; চিহ্নতো দূরের কথা একটি হাঁড়ও অবশিষ্ট নেই।

২৮. ভয়ের মাঝে জীবন কাটিয়ে দেয়াই মানুষের বিচক্ষণতার পরিচয়; নতুবা সমস্যার পর সমস্যাই দেখতে হবে।

২৯. অপবিত্রতা ও নোংরামীর মাঝে জীবন কাটানোর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।

৩০. এসো, ন্যায়ের পথে পা বাড়াও; বিদ্বেষ কি তওবা করতে বারণ করে?

৩১. বিশ্বাস কর, আমার কথা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠতা হতে উদ্ভুত, এ কোন ফাঁকা বুলি নয় আর অন্তসারশূণ্য দম্ভও নয়।

৩২. আমি সকল ধর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও প্রণিধান করেছি আর আন্তরিকভাবে সবার যুক্তি শুনেছি।

৩৩. আমি সকল ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পড়েছি; আর সকল জাতির পন্ডিতদের দেখেছি।

৩৪. আশৈশব আমি এ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োজিত করি আর এটিকেই নিজের একমাত্র পেশা হিসেবে অবলম্বন করেছি।

৩৫. আমি আমার পুরো যৌবন একই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি; আর নিজেকে অন্য সকল কাজ থেকে দূরে বা পৃথক রেখেছি।

৩৬. আমি একটি দীর্ঘ জীবন এই দুঃখের মাঝে অতিবাহিত করেছি; অনেক দীর্ঘ রজনী এ চিন্তায় চোখ বন্ধ করতে পারিনি।

৩৭. আমি পুরো নিষ্ঠা ও সততার সাথে খোদাভীতি ও ইনসাফের দাবি অনুসারে এ সম্পর্কে চিন্তা করেছি।

৩৮. ইসলামের ন্যায় কোন শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ধর্ম আমি দেখিনি, যার উৎস অতি চমৎকার।

৩৯. এই ধর্ম এত পরিস্কার ও স্বচ্ছ যে, হিংসুক নিশ্চিৎভাবে এতে নিজের চেহারা দেখতে পারে।

৪০. এটি (ধর্ম) এমনভাবে পবিত্রতার পথ প্রদর্শন করে যে, বিবেক এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

৪১. এটি কেবল প্রজ্ঞা যুক্তি ও সুবিচারেরই শিক্ষা দিয়ে থাকে; আর সকল প্রকার অজ্ঞতা ও নৈরাজ্য হতে রক্ষা করে।

৪২. পৃথিবীতে এধর্মের জুড়ি নেই; এর বিরোধী সকল ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এটিই খোদার কাছে কাকুতি।

৪৩. এর নীতি যা মুক্তির মূলমন্ত্র; সত্যতা ও দৃঢ়তায় সূর্যের মত ঝলমল করে।

৪৪. অন্যান্য ধর্মের নীতিও সুস্পষ্ট; কোন প্রচেষ্টা তা গোপন করতে পারে না।

৪৫. যদি অমুসলমানরা অবগত থাকতো তাহলে তারা প্রাণ দিয়ে হলেও ইসলামী বিশ্বাসের সুরক্ষা করতো।

৪৬. মুহাম্মদ (সা.) খোদার জ্যোতির সবচেয়ে মহান প্রতিবিম্ব; ধরাপৃষ্ঠে তাঁর মত আর কেউ জন্ম নেয় নি।

৪৭.সব দেশ সত্য-শূন্য ছিল; সেই রাতের ন্যায় যা সম্পূর্ণভাবে তমসাচ্ছন্ন।

৪৮.খোদা তাঁকে পাঠিয়েছেন এবং সত্যের প্রসার করেছেন; সেই নেতার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন।

৪৯. তিনি পবিত্রতা ও পরাকাষ্ঠার বাগানের ফলপ্রদানকারী ও ফুলেফেঁপে ওঠা চারাগাছ; আর তাঁর সকল বংশধর ফুলতুল্য।

দ্বিতীয়তঃ এ নিবেদনও করতে চাই যে, যদি কোন ব্যক্তি ঘোষণায় উল্লেখিত শর্ত অনুসারে এ গ্রন্থের উত্তর দিতে চায় তাহলে তার জন্য বিজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্ত অনুসারে উভয় প্রকার উত্তর দেয়া আবশ্যক হবে। অর্থাৎ কুরআন শরীফে বিধৃত যুক্তি প্রমাণাদির মোকাবিলায় তার নিজস্ব ধর্মীয় গ্রন্থ হতে প্রমাণাদি উপস্থাপনের পাশাপাশি আমাদের

উপস্থাপিত প্রমাণাদিও খন্ডন করা আবশ্যক হবে। যদি প্রত্যুত্তরে নিজ ধর্মীয় গ্রন্থ হতে প্রমাণাদি উপস্থাপন না করে আর কেবল আমাদের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ খন্ডনেই ব্যস্ত থাকে, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, সে নিজ গ্রন্থের প্রমাণাদি উপস্থাপনে সম্পূর্ণরূপে অপারগ। স্মরণ থাকে, কুরআন মজীদ সত্যিকার অর্থে খোদার গ্রন্থ এবং সকল ঐশী গ্রন্থের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও মহান আর স্বীয় সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপনে অনন্য ও অতুলনীয়।

যদি কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে আমাদের সাথে দ্বিমত রাখে আমরা আন্তরিকভাবে চাই যে, সে নিজের অভিমতের পক্ষে কলম হাতে নিক। আমরা সত্য বলছি যে, তার এমন কষ্ট স্বীকারে আমরা যারপর নাই কৃতজ্ঞ হবো। কেননা কুরআন মজীদে যে সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্টাবলী রয়েছে বা যেসকল যুক্তি ও অখন্ডনীয় প্রমাণাদির ভিত্তিতে কুরআন শরীফের ঐশী বাণী হওয়া প্রমাণিত, তা অন্যান্য গ্রন্থের ভাগ্যে জোটেনি। সাধারণ্যে কীভাবে এটি তুলে ধরা যায়, অহোরাত্র আমাদের এ চিন্তাতেই কাটে। অনেক চিন্তাভাবনার পরও আমরা এর চেয়ে উত্তম কোন পরিকল্পনা খুঁজে পাইনি যে, আমরা কুরআন মজীদের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসকল দিক ও প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছি কোন ব্যক্তি তা তার নিজ ধর্মীয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দাবি করে কোন পুস্তিকা প্রকাশ করুক।

খোদার কাছে আমাদের দোয়া থাকবে যেন এমনিই হয়। সেক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সত্যতার সমুজ্জ্বল সূর্য ও এর মাহাত্ম্য সকল দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তির সামনেও প্রকাশ পেয়ে যাবে; আর ভবিষ্যতে কোন সরলপ্রাণ মানুষ বিরোধীদের প্রতারণার শিকার হবে না। যদি এই গ্রন্থের খন্ডনকারী এমন কোন ব্যক্তি হয়ে থাকে যে কোন ঐশী গ্রন্থের অনুসরণ করে না, তাহলে তার জন্য আমাদের সকল প্রমাণকে ধারাবাহিকভাবে খন্ডন করাই যথেষ্ট হবে অধিকন্তু আমাদের বিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বীয় বিরোধী ধ্যান-ধারণাকে যৌক্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে দেখানোও আবশ্যক হবে।

অতএব যদি এমন কোন ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়, তার শিক্ষণীয় রচনার মাধ্যমে মানুষের অনেক উপকার হবে এবং ব্রাহ্মসমাজীদের যুক্তি-বুদ্ধির স্বরূপও উদঘাটিত হয়ে যাবে যারা সব সময় কেবল যুক্তির জপ করে বেড়ায়। এক কথায় আমরা নিশ্চিৎভাবে জানি, আমাদের গ্রন্থের সেদিন পুরো কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে আর এর প্রকৃত মূল্যও গুরুত্ব তখনই বুঝা যাবে যখন এর সত্যতার পক্ষে প্রদত্ত প্রমাণাদির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ নিজ গ্রন্থের প্রমাণাদিও উপস্থাপন করবে বা এ যুগের তথাকথিত মুক্তচিন্তার মানুষের ন্যায় নিজেদের মনগড়া বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করবে। সত্যিকার অর্থে তুলনামুলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল কোন বস্তুর গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করা যায়। ফুলের সৌন্দর্য ও কোমলতা কেবল তখনই প্রকাশ পায় যদি এর পাশে কাঁটাও থাকে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি কোন কুৎসিৎ ও কাল চেহারা না থাকতো, তাহলে কি করে কেউ সুন্দর প্রেমাস্পদের বাহ্যিক সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারতো?

যদি শত্রুর সাথে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ না হতো, তাহলো রক্ত-ঝরানো তরবারীর ধার (বা তীক্ষ্ণতা) কী করে প্রকাশ পেতো?

আলোর মূল্য বুঝা যায় অন্ধকার ও অমানিশার মাধ্যমে আর উৎকর্ষ বিবেক ও বুদ্ধির সম্মান এবং মহিমা প্রকাশ পায় অজ্ঞতার সাথে তুলনার নিরিখে।

সত্যবাদির যুক্তি, সমালোচনা ও অস্বীকারের মাধ্যমেই স্বীয় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে; আর খোঁড়া যুক্তি অভিযোগকেই সত্য প্রমাণ করে।

যারা এর খণ্ডন লিখতে চায় এখানে তাদের কাছে নিবেদন হলো, তারা যেন একথা স্মরণ রাখে– যদি সত্য প্রকাশ করা, ন্যায় বিচার এবং বিজ্ঞাপনে বর্ণিত শর্ত পুরো করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে উচিৎ হবে আমাদের যুক্তি ও প্রমাণগুলো হুবহু নিজের পুস্তকে উল্লেখ করে ধারাবাহিকভাবে এসবের উত্তর প্রদান করা। অর্থাৎ আমাদের যুক্তি বা প্রমাণ হুবহু উল্লেখ করার পর সবিস্তারে এর উত্তর লিখা বাঞ্ছনীয় হবে; কোন প্রকার অস্পষ্টতা রাখা বা সংক্ষিপ্ত করা সমীচিন হবে না যেন সকল ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সামনে দেখতেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, উত্তর দেয়া হলো কি-না। কেননা সারাংশে যুক্তি-প্রমাণের পুরো ভাব ফুটে উঠে না আর অনেক এমন কথা থাকে যা সংক্ষিপ্ত করতে গেলে শত্রুপক্ষের অসৎ হস্তক্ষেপ বা অতি সরলতার কারণে তা ভেস্তে যায়; বরং প্রায় সময় উহ্য রাখলে বা বাদ দিলে যুক্তি প্রদানকারীর উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

দৃষ্টি আকর্ষণ

আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচিত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' এবং 'আল ইস্তিফ্‌তা' আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এই অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা আরো উত্তম কোন শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হবে বলে মনে করেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়-

পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা, ১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
masumon83@yahoo.com

জুমুআর খুতবা

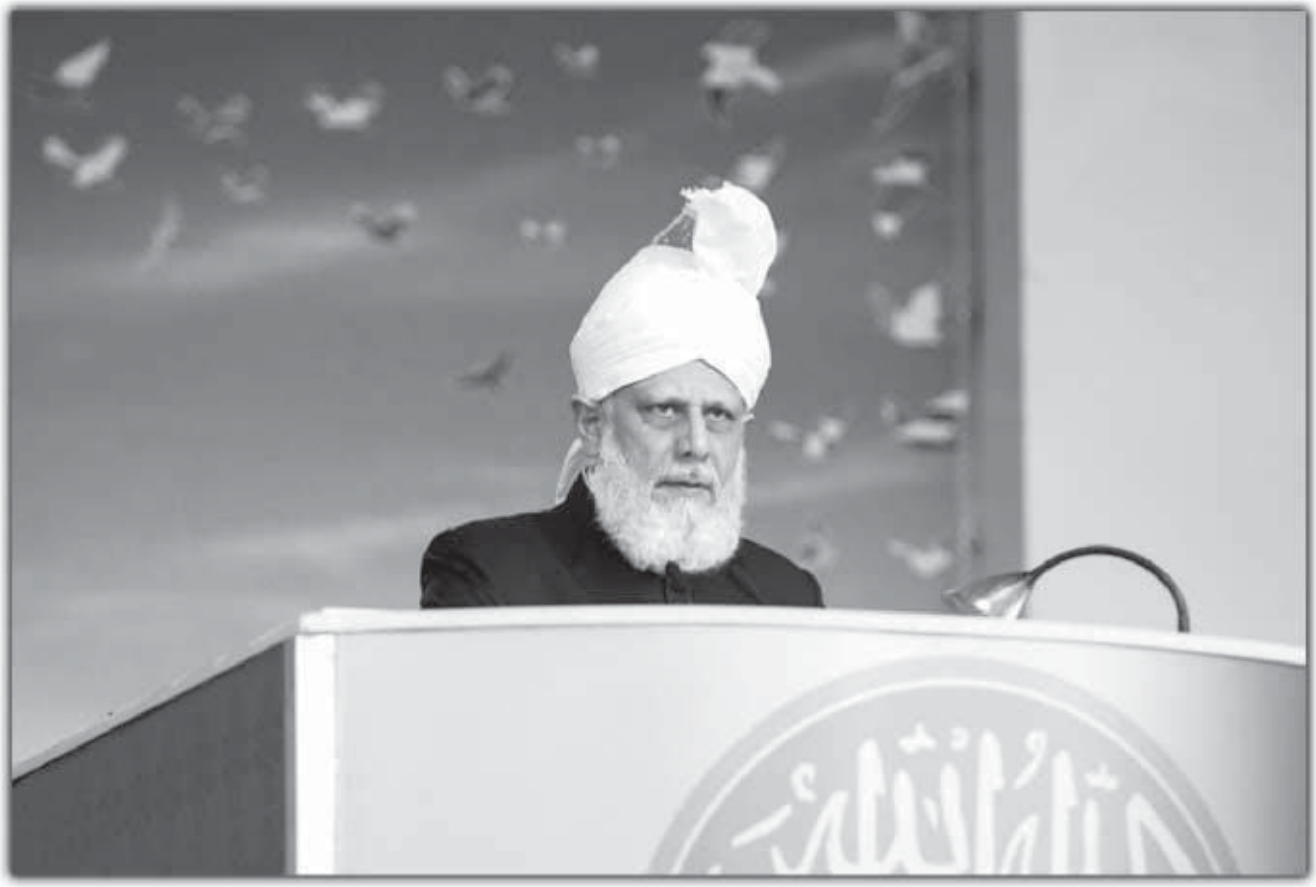

আল্লাহ্ তা'লা নিজের ওলী বা বন্ধুদের এবং পুণ্যবান লোকদের সন্তান-সন্ততিকে প্রজন্ম পরম্পরায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৫ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজের ওলী বা বন্ধুদের এবং পুণ্যবান লোকদের সন্তান-সন্ততিকে প্রজন্ম পরম্পরায় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকেন এবং তাদের স্বীয় অপার দানে ভূষিত করেন। তবে শর্ত হলো, সেই সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলেন, দেখ! মহানবী (সা.) স্বীয় রিসালতের প্রারম্ভিক যুগে নিজ গোত্রের লোকদের সত্যের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করেন। খাবার শেষ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, সমগ্র মানবমন্ডলীকে এক আত্মা বা এক সত্তায় পরিণত করা। এরই নাম জাতিগত বা সমষ্টিগত ঐক্য।"

তিনি (আ.) বলেন, "তসবীহ্‌র দানার মত সবার গণ ঐক্যের মালায় গ্রথিত হওয়াই ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্ম সেটিই যা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে, এক দেহে রূপান্তরিত করে।"

করার পর প্রথম আমন্ত্রণে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য তিনি দন্ডায়মান হন। কথা শুরু করতেই আবু লাহাব সবাইকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তিনি (সা.) তার এই আচরণে হতভম্ব ছিলেন কিন্তু নিরাশ হন নি। তিনি হযরত আলী (রা.)-কে পুনরায় নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন এবং দ্বিতীয়বার ইসলামের বাণী পৌঁছান। তখন উপস্থিত সবার ওপর নিরবতা ছেয়ে যায়, সবাই নীরব ছিল, কেউ কথা বলেনি। হযরত আলী (রা.) দন্ডায়মান হন এবং বলেন, যদিও বয়সে আমি সবার চেয়ে ছোট অর্থাৎ এখানে যারাই উপস্থিত আছেন তাদের সবার মাঝে আমি বয়সে ছোট কিন্তু আপনি যা বলেছেন এ বিষয়ে আপনার সঙ্গ দেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আর সারা জীবন আপনার সঙ্গ দেয়ার অঙ্গীকার করছি।

যাহোক এরপর মক্কায় বিরোধিতা চরমে পৌঁছে এবং মহানবী (সা.)-কে হিজরত করতে হয়। তখন হযরত আলী (রা.)-কেই আল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানীর তৌফিক দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেন এবং বলেন, তুমি এখানে শায়িত থাক, এতে শত্রুরা তোমাকে দেখে আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হবে। তখন হযরত আলী (রা.) এ কথা বলেন নি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! শত্রু আমাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, সকালে যখন তারা জানতে পারবে তখন অসম্ভব নয় যে, তারা আমাকে হত্যা করবে বরং প্রশান্ত চিত্তে হযরত আলী (রা.) তাঁর (সা.) বিছানায় শুয়ে পড়েন। প্রভাতে অবিশ্বাসীদের সামনে (আসল ঘটনা) স্পষ্ট হলে হযরত আলী (রা.)-কে তারা বেদম প্রহার করে। কিন্তু যাহোক ততক্ষণে হযরত রসূলে করীম (সা.) মক্কা থেকে হিজরতের কাজ সমাপ্ত করেছেন। হযরত আলী (রা.)-র এই কুরবানী তাকে পরবর্তীতে কি পরিমাণ পুরস্কারে ভূষিত করেছে বা ভূষিত করার ছিল সে সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর তখন কোন ধারণাই ছিল না। কোন পুরস্কারের জন্য বা কৃপাভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সেই ত্যাগ স্বীকার করেন নি বরং সম্পূর্ণরূপে মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায়, তাঁর প্রেমে এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তখন কেবলমাত্র খোদা তা'লারই একথা জানা ছিল যে, এই ত্যাগের বা এই কুরবানীর বিনিময়ে কত অসাধারণ সম্মান তাঁর লাভ হতে। আর শুধু হযরত আলীরই নয় বরং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার সন্তান-সন্ততি এবং প্রজন্মকেও খোদা তা'লা সম্মানে ভূষিত করবেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত আলীর প্রতি প্রথম যে কৃপা করেছেন তাহলো , মহানবী (সা.)-এর জামাতা হওয়ার সম্মান তিনি লাভ করেছেন। এরপর বিভিন্ন উপলক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর বিভিন্ন কাজের কারণে মহানবী (সা.) তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। একবার মহানবী (সা.) কোন যুদ্ধের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে হযরত আলী (রা.)-কে মদিনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আমাকে মহিলা এবং শিশুদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, হে আলী! তুমি কি তুলনার নিরিখে আমার পক্ষ থেকে সেই মর্যাদা লাভ করা পছন্দ করবে না যা হারুন মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে লাভ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) হারুনকে নিজের অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন, এতে হারুনের মর্যাদার হানী হয়নি। অতএব হযরত আলী (রা.)-রও আল্লাহ্ তা'লা এভাবে সম্মান এভাবে বৃদ্ধি করেছেন। এটি শুধু তার সত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামে যত ওলী এবং সূফী অতিবাহিত হয়েছেন তাদের বেশীরভাগ হযরত আলী (রা.)-এর সন্তান-সন্ততিরই অন্তর্ভুক্ত। এই ওলীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় নিদর্শনাবলী এবং সমর্থনে সম্মানিত করেছেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আমি একটি ঘটনা শুনেছি। সেই ঘটনা হলো, হারুন-উর-রশীদ কোন কারণে ইমাম মূসা রেযাকে কারাবন্দী করে রাখেন আর তার হাত ও পা দড়ি দিয়ে বেধে রাখা হয়। সে যুগে স্প্রিংয়ের জাজিম ছিল না, সাধারণ রুই বা তুলার জাজিম ব্যবাহার হতো। হারুন-উর-রশীদ রাজ প্রাসাদে আরামদায়ক জাজিমে সুখনিদ্রা যাপন করছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন, মহানবী (সা.) এসেছেন এবং তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারায় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির ছাপ ছিল। তিনি (সা.) বলেন, হারুন-উর- রশীদ! তুমি আমাদের ভালোবাসার দাবি তো কর ঠিকই কিন্তু তোমার কি লজ্জা হয় না যে,

তুমি আরাম দায়ক জাজিমে গভীর নিদ্রায় মগ্ন আর আমাদের পুত্র প্রচন্ড গরমের মধ্যে হাত পা বাধা অবস্থায় কারাগারে পড়ে রয়েছে? এই দৃশ্য দেখে হারূন-উর-রশীদ ছটফট করে উঠে বসেন এবং নিজ কমান্ডারদের বা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তখনই কারাভ্যন্তরে যান এবং নিজ হাতে ইমাম মূসা রেযার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দেন।

তিনি হারূন-উর-রশীদকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি তো আমার ঘোর বিরোধী ছিলেন, ব্যাপার কী যে, এখন আপনি নিজেই এখানে চলে এলেন? হারূন-উর-রশীদ তখন স্বপ্ন শুনিয়ে বলেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, প্রকৃত সত্য আমার জানা ছিল না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, দেখ! সে যুগ এবং মহানবী (সা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর যুগের মাঝে কত বড় ব্যবধান ছিল। আমরা অনেক বাদশাহ্‌র সন্তান-সন্ততিকে দেখেছি যে, যারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। তিনি (রা.) বলেন, আমি স্বয়ং দিল্লীতে এক পানি সরবরাহকারীকে দেখেছি যে মোঘল বাদশাহ্‌দের সন্তান-বংশধর ছিল, সে মানুষকে পানি পান করাত। কিন্তু তার মাঝে এতটা লজ্জাবোধ অবশ্যই ছিল যে, সে মানুষের কাছে হাত পাততো না, কায়িকশ্রম করছিল। যাহোক বাদশাহ্‌র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ শ্রমিক হিসেবে দিনাতিপাত করছিল। অপরদিকে হযরত আলী (রা.)-এর সন্তানকে দেখ! এত প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এক বাদশাহ্‌কে আল্লাহ্ তা'লা সতর্ক করেন এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা.) যদি এই সম্মানের কথা জানতেন আর অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন আর শুধু এই সম্মানের জন্য যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে তার ঈমান কেবল ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতো, কোন নিয়ামত বা পুরস্কারের কারণ হতো না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় একজন ওলীর বা খোদার এক বন্ধুর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি জাহাজে আরোহিত ছিলেন এবং এমতাবস্থায় ঝড় উঠে। জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল কিন্তু তার দোয়ায় রক্ষা করা হয়েছে। দোয়ার সময় তার প্রতি ইলহাম হয়, তোমার জন্য আজ আমরা সবাইকে রক্ষা করেছি। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! কেবল বড় বড় বুলি আওড়ালেই এই সম্মান ও মর্যাদা লাভ হয় না বরং এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়, পিতা-পিতামহের পুণ্য বা নেকী অব্যাহত রাখতে হয়। অতএব পুণ্যবানদের ও ওলীদের এবং বুযূর্গদের বংশধর হওয়া তখনই কল্যাণকর হতে পারে যদি মানুষ নিজেও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খোদার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণিত আরও কিছু কথা এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। জামাতের সাথে অর্থাৎ বাজামাত নামায পড়ার বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সচেতনতা সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নামায কত প্রিয় ছিল দেখুন! কোন অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে তিনি (আ.) মসজিদে আসতে না পারলে আর ঘরেই নামায পড়তে হলে তখন আমার মা এবং ঘরের শিশুদের সাথে নিয়ে তিনি বাজামাত নামায পড়তেন অর্থাৎ শুধু নামাযই পড়তেন না বরং জামাতবদ্ধভাবে নামায পড়তেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং একবার বাজামাত নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "খোদা তা'লার অভিপ্রায় হলো, সমগ্র মানবমন্ডলীকে এক আত্মা বা এক সত্তায় পরিণত করা। এরই নাম জাতিগত বা সমষ্টিগত ঐক্য।" তিনি (আ.) বলেন, "তসবীহ্‌র দানার মত সবার গণ ঐক্যের মালায় গ্রথিত হওয়াই ধর্মের উদ্দেশ্য। ধর্ম সেটিই যা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে, এক দেহে রূপান্তরিত করে।" তিনি (আ.) বলেন, "এই যে জামাতবদ্ধ হয়ে নামায পড়া হয় তাও এই ঐক্যের জন্যই যেন সব নামাযী একক সত্তায় রূপ নেয়। যার মাঝে অধিক জ্যোতি রয়েছে তার জ্যোতি দুর্বলের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে তাকেও শক্তিশালী করবে– সম্মিলিতভাবে দাঁড়ানোর আদেশ এজন্য দেয়া হয়েছে অর্থাৎ নামাযীরা যেন পরস্পর থেকে শক্তি অর্জন করে। এই গণ ঐক্য সৃষ্টি এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখার সূচনা আল্লাহ্ তা'লা এভাবে করেছেন যে, প্রথমে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাহলো, সকল পাড়ায় পাড়াবাসীরা পাঁচবেলার নামায নিজ নিজ পাড়ার মসজিদে বাজামাত পড়বে যেন চারিত্রিক গুণাবলী পরস্পরের মাঝে সঞ্চালিত হয়, আর আলোর সাথে আলোর সম্মিলন ঘটে দুর্বলতাকে দূরীভূত করে। অধিকন্তু পারস্পরিক পরিচিতির মাধ্যমে যেন ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।" তিনি (আ.) বলেন, "পরিচিতি খুবই ভালো জিনিস, এর ফলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় যা একতার ভিত্তিও বটে।"

অতএব বাজামাত নামাযে মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয় সেখানে এর সমষ্টিগত কল্যাণও রয়েছে। যারা নামাযের জন্য মসজিদে আসে না বা অনেকে এমনও আছে যারা মসজিদে এসে পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করে ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক স্থাপন করে না, তাদের নামাযে কোন উপকার হয় না। কেননা ইবাদত ছাড়া নামাযের আরো যে উদ্দেশ্য রয়েছে অর্থাৎ ঐক্য সৃষ্টি হওয়া, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সম্প্রীতির বন্ধন রচিত হওয়া তা সাধিত হয় না।

অতএব এই চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের নিজেদের নামাযের হিফাযত করতে হবে আর এই চেতনা নিয়েই আমাদের মসজিদে আসা উচিত যেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে গ্রহণযোগ্য নামায পড়তে পারি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

হযরত মুয়াবিয়ার নামায নষ্ট হওয়া সংক্রান্ত একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শোনাতেন, একবার হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-র ফযরের সময় চোখ খুলেনি বা ঘুম ভাঙ্গেনি আর ঘুম ভাঙ্গার পর দেখেন, নামাযের সময় পেরিয়ে গেছে। এ কারণে তিনি সারাদিন কাঁদতে থাকেন। পরের দিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন এসে নামাযের জন্য তাকে ডাকছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? সে বললো, আমি শয়তান, তোমাকে নামাযের জন্য জাগাতে এসেছি। তিনি বলেন, নামাযের জন্য উঠানোর সাথে তোর কি সম্পর্ক? ব্যাপার কী? সে বললো, গতকাল তোমাকে ঘুমানোর জন্য উৎসাহিত করেছি ফলে তুমি ঘুমিয়েছিলে, নামায পড়তে পারনি, যে কারণে তুমি সারাদিন অশ্রুপাত করেছো এবং দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাকে এই ক্রন্দনের কারণে বাজামাত নামাযের চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি পুণ্য দাও অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাকে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি পুণ্যের ভাগী করার নির্দেশ দেন। শয়তান বলে, এ কারণে আমি খুবই ব্যথিত হয়েছি, নামায থেকে বঞ্চিত রাখার ফলে তুমি অধিক পুণ্যের ভাগী হলে। আজ আমি তোমাকে জাগাতে এসেছি যেন কোথাও তুমি আবার অধিক পুণ্যের ভাগী না হয়ে যাও। তিনি বলেন, শয়তান তখন মানুষের পিছু ধাওয়া পরিত্যাগ করে যখন মানুষ শয়তানের কথা খন্ডন করে, শয়তান তখন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যায় এবং তাকে ছেড়ে চলে যায়। তাই আমাদের উচিত হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে শয়তানকে নিরাশ করা আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করা, নিজেদের নামাযের হিফাযত করা আর যথাসময়ে নামায পড়ার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া।

অনেক সময় কিছু মানুষ তড়িঘড়ি করে কোন কথায় অবগাহন না করে একটি সিদ্ধান্ত করে বসে আর এ কারণে অনেক দুর্বল প্রকৃতির মানুষ হোঁচটও খায় বা স্খলিত হয়। একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এক ভোজ সভায় এক ব্যক্তিকে আমি বাম হাতে পানি পান করতে বারণ করি, সে পান করার জন্য বাম হাতে পানির গ্লাস নিচ্ছিল। আমি বললাম, যদি কোন বৈধ কারণ না থাকে তাহলে ডান হাতে পানি পান কর। সে বলে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও বাম হাতে পানি পান করতেন অথচ হুযূরের এমনটি করার একটি বৈধ কারণ ছিল। আর তাহলো, শৈশবে পড়ে গিয়ে তিনি হাতে ব্যথা পান আর এতে হাত এত দুর্বল হয়ে যায় যে, গ্লাস উঠাতে পারতেন ঠিকই কিন্তু মুখ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। কিন্তু এমন নয় যে, তিনি সুন্নতের অনুসরণ করতেন না বরং রসূলের সুন্নতের অনুবর্তীতার সচেতনতা নিয়ে তিনি বাম হাতে গ্লাস উঠাতেন কিন্তু নিচে ডান হাতের সাপোর্ট রাখতেন বা সাহায্য নিতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর হাতের দুর্বলতার কথা নিজেও এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, *একবার কতিপয় অ-আহমদী বা বিরোধীর সামনে যারা আমার সাথে বিতর্কের জন্য বা আলোচনার জন্য এসেছিল, গ্লাস বা চায়ের পেয়ালা উঠালাম তখন সামনে উপবিষ্ট অ-আহমদী আপত্তি করে বসে, আপনি সুন্নত অনুসরণ করেন না, বাম হাতে পেয়ালা বা গ্লাস ধরে পান করার চেষ্টা করছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ত্বরাপরায়ণতা এবং কু-ধারণা তাকে আমার বিরুদ্ধে আপত্তি করতে প্রবৃত্ত করেছে, অথচ আঘাতের কারণে আমার হাত দুর্বল, আমি ডান হাতে পেয়ালা তুলে মুখ পর্যন্তও নিয়ে যেতে পারি না কিন্তু আমি অবশ্যই বাম হাতের নিচে আমার ডান হাত রাখি।* অতএব ত্বরাপরায়ণতা যেখানে শত্রুকে কু-ধারণায় প্রবৃত্ত করছে সেখানে আপনজনরা বুদ্ধিহীনতা ও ত্বরাপরায়ণ মনমানসিকতার কারণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, নাউযুবিল্লাহ্ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত বিরোধী কোন কাজ করছেন। অথচ তার উচিত ছিল এর কারণ উদ্ঘাটন করা এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন বারণ করেছেন তখন তার বিরত হওয়া উচিত ছিল এবং জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, এর কারণ কি? যাহোক এসব ত্বরাপরায়ণতাই বিভিন্ন প্রকার বিদআতে পর্যবসিত হয় আর ভ্রান্ত তফসীর করে মানুষ ভুল সিদ্ধান্তে বা উপসংহারে উপনীত হয়।

এখন তওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীলতা সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। এর উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ করছেন। তিনি (রা.) বলেন, একটি কথা আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে বারংবার শুনেছি।

তুর্কির বাদশাহ্ আব্দুল হামীদ খান সাহেব যিনি অপসারিত হয়েছেন তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, *সুলতান আব্দুল হামীদ খানের একটি কথা আমার খুবই পছন্দনীয়। গ্রীসের সাথে যুদ্ধের যখন প্রশ্ন আসে তখন তার মন্ত্রীরা অনেক অজুহাত দেখায়। সত্যিকার অর্থে সুলতান আব্দুল হামীদ খান যুদ্ধের পক্ষাপাতী ছিলেন কিন্তু মন্ত্রীরা চাইতো না যে, যুদ্ধ হোক। তাই তারা বিভিন্ন অজুহাত দাঁড় করায়। অবশেষে তারা বলে, যুদ্ধের জন্য এটিও প্রস্তুত আর সেটিও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করে বলে, অমুক বিষয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি যা যুদ্ধের জন্য আবশ্যক।* মন্ত্রীরা এই পরামর্শ দিচ্ছিল। *হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এভাবে ধরে নিতে পার বা তারা খুব সম্ভব এটিই বলে থাকবে যে, সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি গ্রীসকে সাহায্য করার বিষয়ে একমত, আর আমাদের কাছে এর কোন জবাব বা খন্ডন নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, মন্ত্রীরা যখন এই পরামর্শ দিল আর সমস্যার কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরলো এবং বললো, অমুক বিষয়ের ব্যবস্থা নেই তখন সুলতান আব্দুল হামীদ খান বলেন, কোন একটি দিক আল্লাহ্‌র জন্যও ছেড়ে দেয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুলতান আব্দুল হামীদের এই বাক্য খুবই উপভোগ করতেন এবং বলতেন, তার একথা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয়।* অতএব মু'মিনের নিজের চেষ্টা প্রচেষ্টার একটি দিক আল্লাহ্‌র জন্যও ছেড়ে দেয়া উচিত।

বাস্তবিক পক্ষে, সত্য বিষয় হলো, মু'মিন কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছে না বরং সত্যিকার অর্থে কোন মানুষই এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না যেখানে গিয়ে সে বলতে পারে, এখন আর কোন দুর্বল দিক নেই এবং সব কিছুতেই পারফেকশান বা পরিপূর্ণতা এসে গেছে। যদি কোন মানুষ বলে, আমি আমার কাজ এমনভাবে সমাধা করবো যে, এতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বা বিপত্তি থাকবে না, তার এমনটি বলা নির্বুদ্ধিতার শামিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে উপকরণকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করা অর্থাৎ বাহ্যিক উপায়- উপকরণের ব্যবস্থা না করাও নির্বুদ্ধিতার শামিল। তিনি (রা.) বলেন, এখন ইউরোপীয়ান জাতিগুলো প্রথম নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'লার দিকটা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছে। অপরদিকে মুসলমানরা দ্বিতীয় প্রকার নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত অর্থাৎ তারা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার ভ্রান্ত অর্থ করে নিজেদের হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। সচরাচর পাশ্চাত্যের জাতিগুলো খোদাকে ভুলে গেছে আর মুসলমানরা সচরাচর নিজেদের জীবনে বা দৈনন্দিন কাজকর্মে আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করার নামে

পরিশ্রম করে না বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা আরম্ভ করে। তাই সচরাচর এখানকার যুবকদের মাথায় এই প্রশ্ন জাগে যে, উন্নত বিভিন্ন জাতি খোদাকে ছেড়ে দেয়ার কারণেই হয়তো উন্নতি করছে, আর মুসলমানরা ধর্মের অনুসরণের কারণে অধঃপতনের শিকার হচ্ছে বা পশ্চাদপদতার শিকার হচ্ছে। অথচ সত্যিকার অর্থে মুসলমানরা নিজেদের অকর্মণ্যতা আর তাওয়াক্কুলের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে বসেছে আর যেক্ষেত্রে তারা কিছু করে সেক্ষেত্রেও তাদের approach বা কর্মপন্থা হলো ভ্রান্ত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কুরআনের একটি আয়াত হলো,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٣﴾

অর্থাৎ আর আকাশে তোমাদের জীবিকা রয়েছে আর তোমাদের যা কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তাও রয়েছে (সূরা আয্ যারিয়াত: ২৩)। তিনি (আ.) বলেন, এর ফলে এক নির্বোধ প্রতারিত হয় আর চেষ্টা-প্রচেষ্টার বিধানকে নিরর্থক মনে করে। মুসলমানরা বলে, আকাশে তোমাদের রিয্ক রয়েছে আর যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তা তা লাভ হবেই কাজেই কিছু করার প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ই সবকিছু প্রেরণ করবেন। তিনি (আ.) বলেন, অথচ সূরা জুমুআয় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থাৎ তোমরা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় আর খোদার কৃপা সন্ধান কর (সূরা আল্ জুমুআ:১১)। এখানে কৃপা সন্ধানের অর্থ হলো, পরিশ্রম কর আর নিজেদের শক্তিবৃত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগাও। তিনি (আ.) বলেন, এটি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এক দিকে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে অপরদিকে পুরোপুরি আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করতে হবে। এটি দৃষ্টিতে থাকা চাই যে, পুরো চেষ্টা করতে হবে, বাহ্যিক যেসব উপকরণ রয়েছে সেগুলোকে থেকেও পুরোপুরি কাজ নাও, এরপর খোদার ওপর নির্ভর কর। এটিই প্রকৃত মু'মিনের লক্ষণ বা চিহ্ন।

তিনি (আ.) বলেন, এর মাঝে শয়তানী কুমন্ত্রণারও অনেক আশংকা থাকে অর্থাৎ চেষ্টা করা এবং আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করা, দু'য়ের মাঝে পার্থক্য বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উভয়টিকে দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। শয়তান এই উভয়ের মাঝে ঢুকে বাধ সাথে, প্রতিবন্ধিকতা সৃষ্টি করে আর ঈমান নষ্ট করে। তাই এটি দৃষ্টিতে রাখবে। তিনি (আ.) বলেন, অনেকে হোঁচট খেয়ে উপকরণ পূজারীও হয়ে যায়। অনেকেই খোদা প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তিকে অর্থহীন মনে করে বসে। তিনি (আ.) বলেন, মহনাবী (সা.) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন পুরো প্রস্তুতি নিয়ে যেতেন, ঘোড়া ও অস্ত্র-সস্ত্রও সাথে নিতেন। বরং তিনি অনেক সময় দু-দু'টি বর্ম পরিধান করতেন, তরবারিও কোমরে ঝুলিয়ে নিতেন অথচ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল যে,

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের আক্রমণ থেকে তোমাকে নিরাপদ রাখবেন (সূরা আল্ মায়েদা: ৬৮)। অতএব চেষ্টা-সাধনার পর আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে সব বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমের পর তওয়াক্কুলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে নতুবা খোদা তা'লার কৃপা লাভ করা যায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, ***"বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে কল্যাণ সন্ধান করবে"।*** হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর একটি খুবই আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা করেছেন। আমি এখানে সেটি তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম করেছেন, ***"বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে আশিস সন্ধান করবে"***। উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, আর সেই সময় যখন আসবে অর্থাৎ যখন বাদশাহ্রা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে তখন এমন আহাম্মক কে হবে যে, তোমাদের দ্বারা আশিস মন্ডিত হওয়ার চেষ্টা করবে না? কাপড় তো জড়বস্তু, তাঁর সামনে তখন কিছু সাহাবী হয়তো বসে থাকবেন আর অনেকেই তাবেঈন বা কতিপয় তবা-তাবেঈনও হয়তো হবেন।

তিনি (রা.) বলেন, এমন আহাম্মক কে হবে যে তোমাদের মাঝে কল্যাণ অন্বেষণ করবে না। কাপড় তো জড়বস্তু আর তোমরা জীবিত। সেই সময় যখন আসবে, বাদশাহ্রা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পোষাকে কল্যাণ সন্ধান করবে তখন তাঁর সাহাবীগণ, তাবেঈন এবং তবা-তাবেঈনদের মাঝেও তাদের মর্যাদা অনুসারে বরকত অন্বেষণ করা হবে। তোমরা কি দেখনি, হযরত ইমাম আবু হানীফা মহানবী (সা.) থেকে কত পরের যুগে জন্ম গ্রহণ করেছেন বা এসেছেন? কিন্তু বাগদাদের বাদশাহ্ও তার সত্ত্বায় বরকত অন্বেষণ করতো আর শুধু তার মাঝেই নয় বরং তার শীষ্যদের মাঝেও বরকত অন্বেষণ করতো। অতএব তোমরা খোদার কাছে দোয়া করতে থাকো যেন শক্তি অর্জনের পর যুলুম বা অন্যায় না আবার শুরু করে না দাও! আর তোমাদের শান্তিপ্রিয়তা যেন বাধ্যবাধকতার শান্তিপ্রিয়তা না হয়। অর্থাৎ এমন নেকী যেন না হয় যা কেউ বাধ্য হয়ে করে। অর্থাৎ তোমাদের নেকী যেন বাধ্য হয়ে না হয়। তোমাদের পুণ্য যেন প্রকৃত অর্থেই পুণ্য হয়। তিনি (রা.) বলেন, যদি ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পর অত্যাচারী হয়ে যাও তাহলে তোমার আজকের সমস্ত নমনীয়তা, কোমলতা, বিনয় অর্থহীন প্রমাণিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, পূর্বে তোমাদের নখ ছিল না তাই মাথা চুলকানোর প্রয়োজন হয়নি, এখন নখ দিয়েছি তাই তোমরা মাথা চুলকাতে শুরু করেছ! অতএব তোমরা আনন্দিত হও, উল্লসিত হও আর পাশাপাশি ইস্তেগফারও কর আর নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্যও দোয়া কর, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ আমরা শান্তির কথা বলি, নিরাপত্তার কথা বলি, শান্তিপ্রিয়তার কথা বলি, কিন্তু সবকিছু যখন হাতে আসবে আর বাদশাহ্রা যখন আহমদী মুসলমান হবে এবং বরকত বা আশিস সন্ধান করবে তখন আমাদের পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী এবং ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির প্রসার ও প্রচার হওয়া চাই নতুবা, আমাদের আজকের এসব কিছু বাধ্যবাধকতাই গণ্য হবে।

তিনি (রা.) বলেন, সেদিন বেশি দূরে নয় যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম ***"বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে আশিস সন্ধান করবে"*** পূর্ণতা লাভ করবে। বাদশাহাত ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেশের প্রেসিডেন্টও বাদশাহ্ই হয়ে থাকেন। যদি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও

প্রেসিডেন্ট মুসলমান হয়ে যায় তাহলে একজন বাদশাহ্‌র মর্যাদা থেকে তারা কম মর্যাদার হবে না। তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পোশাকে অবশ্যই বরকত সন্ধান করবে। কিন্তু তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বস্ত্রে ***বস্ত্র হতে*** তখনই আশিস সন্ধান করবে যখন তোমরা তাঁর (আ.) রচনাবলীতে বরকত সন্ধান করতে থাকবে। এটি একটি আন্তঃসম্পর্ক, যার কথা তিনি বলছেন। সেই বাদশাহ্ তখন আশিস অন্বেষণ করবে যখন তোমরা যারা পুরনো আহমদী, প্রবীণ আহমদী, সাহাবীদের সন্তান আখ্যায়িত হও, তাবেঈন বা তবা-তাবেঈন আখ্যায়িত হও বা বাদশাহ্‌দের অনেক পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণকারী, তোমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রচনাবলীতে বরকত সন্ধান কর। আর এর অর্থ হলো, তাঁর পুস্তকাবলী পাঠ কর এবং জ্ঞান অর্জন কর। সেসব মসলা-মসায়েলের জ্ঞান অর্জন কর যা সত্যিকার ইসলাম সম্পর্কিত।

তিনি (রা.) বলেন, যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থে তোমরা বরকত বা আশিস সন্ধানে রত হও তাহলে খোদা তা'লা এমন ব্যবস্থা করবেন যে, মানুষ তাঁর পোশাকে বরকত সন্ধান করবে। তবলীগ হবে, জামাতের প্রচার হবে, বাদশাহ্‌রা আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। তখন তারাও বরকত অন্বেষণের চেষ্টা করবে। এরপর তিনি আঞ্জুমানকে সম্বোধন করে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন তবার্‌রুক বা বরকতকময় স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, কাপড় ইত্যাদি রয়েছে যা সঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রেখে যাওয়া বরকতময় স্মৃতিচিহ্নের সংরক্ষণের জন্য রাবওয়াতেও আর কাদিয়ানেও কাজ হচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেকটা কাজ হয়েছে এবং এগুলো সংরক্ষিত করার চেষ্টা চলছে।

যাহোক তিনি আঞ্জুমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আঞ্জুমানের কাজ হলো, এই তবার্‌রুক বা পবিত্র স্মৃতিচিহ্নকে সংরক্ষণ করা। কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞদের ডাকা উচিত, যারা এটি নিয়ে ভাববেন বা চিন্তা করবেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাপড় বা বস্ত্র কীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এসব কাপড় কাঁচবন্ধ করে এমনভাবে রাখা যেতে পারে যেন শত শত বছর তা সংরক্ষিত থাকে অথবা এমন দেশে তা পাঠানো যেতে পারে যেখানে কাপড়ে সহজে পোকা ধরে না, যেমন আমেরিকায় পাঠানো যেতে পারে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা থেকে আশিসমন্ডিত হতে পারে।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল, বয়সে বড় হওয়ার কারণে তাঁর ***'আলাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু'*** খচিত আংটিটি যেন আমার ভাগে আসে। আমরা তিন ভাই ছিলাম, আংটিও তিনটিই ছিল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা বা বাসনা সত্ত্বেও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আম্মাজান লটারী করেন বা টস করেন আর অদ্ভুত ব্যপার হলো, তিনি তিনবার টস করেছেন আর তিন বারই ***'আলাইসাল্লাহ্'***র আংটিটি আমার নামে উঠে আর ***'গারাসতু লাকা বেইয়াদি ওয়া রহমাতী ওয়া কুদরাতী'*** খচিত আংটিটি মিয়া বশীর আহমদ সাহেবের নামে আসে। (যিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দ্বিতীয় ভাই ছিলেন) আর তৃতীয় আংটি যা মৃত্যুর সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে পরিহিত অবস্থায় ছিল, যাতে লেখা ছিল ***'মওলা বাস্'*** তিন বারই তা মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের নামে উঠে। দেখুন! আল্লাহ্ তা'লার কত সুন্দর নিয়ন্ত্রণ। একবার লটারী করলে ভুল হতে পারে কিন্তু তিনবার লটারী করা হয়েছে বা টস করা হয়েছে আর তিনবারই 'আ লাইসাল্লাহ্' খচিত আংটিটি আমার নামে এসেছে আর মিয়া বশীর আহমদ সাহেবের নামে ***'গারাসতু লাকা বেইয়াদী ওয়া রহমাতী ওয়া কুদরাতি'*** খচিত আংটিটি আসে আর মিয়া শরীফ আহমদ সাহেবের ভাগে আসে সেই আংটি আসে যাতে ***'মওলা বাস্'*** লেখা ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে ***'আ লাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু*** খচিত আংটিটি জামাতের হাতে সোপর্দ করব। তখন তিনি একথাও বলেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমাদের কাছে এটি সংরক্ষণেরকোন সুব্যবস্থা নেই, আমি তোমাদের কাছে ততক্ষণ এটি কীভাবে হস্তান্তর করব যতক্ষণ এর তত্বাবধানের দায়িত্ব জামাত নিবে না। যদি এটি আমার সন্তান-সন্ততির কাছে থাকে তাহলে তারা অন্ততঃপক্ষে এটিকে উত্তরাধিকার মনে করে এর সংরক্ষণতো করবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার আংটি আমার সন্তানদের নয় বরং জামাতকে দেই।

এ উদ্দেশ্যে আমি আরেকটি প্রস্তাবও দিয়েছি, আর তাহলো, কাগজে আংটির ছাপ বা প্রতিচ্ছবি নিয়ে বেশি করে ছাপিয়ে এরপর পাথরের আংটি প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু পাথর লাগানোর পূর্বে সেই প্রতিচ্ছবি বা চিত্র গর্তে পুঁতে ফেলা উচিত হবে আর এভাবে এই আংটিগুলোর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আংটির সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অর্থাৎ ***'আ লাইসাল্লাহু বেকাফিন আবদাহু'***র পাথরটিও থাকবে আর সেই চিত্র বা প্রতিচ্ছবিও পাথরের নিচে সংরক্ষিত থাকবে। আর এরপর এক একটি আংটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দেয়া উচিত, যেমন একটি আমেরিকা, একটি ইংল্যান্ড এবং একটি সুইজারল্যান্ডে থাকবে। এভাবে অন্যান্য দেশেও একেকটি করে আংটি পাঠনো যেতে পারে, যাতে প্রত্যেক দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র ও বরকতময় স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত থাকে। পরে তিনি এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন যে, ***'আ লাইসাল্লাহ্*** খচিত আংটিটি খিলাফতের তত্ত্বধানে দিয়ে দেয়া বাঞ্ছনীয় হবে। তিনি (রা.) বলেন, আমার পরে যিনিই খলীফা হবেন তাকে আমার এ আংটি দিয়ে দেয়া উচিত। এভাবে একের পর এক হাত বদল হচ্ছে।

তিনি (রা.) বলেন, সম্প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি পুরনো হাতের লেখা আমার হস্তগত হয়। আমি সেই লেখাটি ইন্দোনেশিয়া পাঠিয়ে দিয়েছি, যেন এই আমানত সেখানে সংরক্ষিত থাকে, আর এটি থেকে সেখানকার জামাত যেন বরকত মন্ডিত হতে পারে। এখন ইন্দোনেশিয়ার জামাতই বলতে পারে, সেই হাতের লেখা সংরক্ষিত আছে কিনা? কিন্তু ইলহামে কাপড়ের উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ইলহাম করেছেন, ***'বাদশাহ্ তোমার বস্ত্রে আশিস সন্ধান করবে'।*** তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাপড় এমনসব স্থানে পাঠিয়ে দেয়া উচিত, যেখানে পুরনো কাপড়ে পোকা ধরে না, যেন দীর্ঘদিন তা সংরক্ষিত থাকে।

এরপর তিনি (রা.) যুবকদের সম্বোধন করে বলেন, যুবকদের এগিয়ে আসা উচিত এবং

নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। কেননা নিত্য-নতুন জিনিস বা নতুন ব্যবস্থাপনা যুবক শ্রেণী উত্তম ভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম, কেননা তারা নতুন আলোর দিক থেকে, নতুন শিক্ষার দিক থেকে এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশি শিক্ষিত। তিনি (রা.) বলেন, এসবকে ইসলামের সেবার জন্য তাদের ব্যবহার করা উচিত, যেন আপনারাও সেদিন দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন যখন তাদের কারণে দেশের পর দেশ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র সত্তায় ঈমান আনবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বইয়ের কথা হচ্ছে। প্রথম দিকে কীভাবে বই ছাপা হতো সে সংক্রান্ত কথা আসছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন বই রচনা করছিলেন, প্রাথমিক যুগের কথা, তখন উপায়-উপকরণ খুবই সীমিত ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে লিপিকারদের নখরা বা ন্যাকামো সহ্য করতেন আর কীভাবে মান ভাল রাখার চেষ্টা করতেন সে সময়কার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) মীর মেহেদী হাসান সাহেবের কথা উল্লেখ করেন। (এটি সে যুগের কথা বলা হচ্ছে, যে যুগে তিনি আহমদী ছিলেন না) মীর সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে ছাপার দায়িত্বে ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোন বইয়ের অনুলিপি ছাপলে তিনি খুব মনোসংযোগ করে তা পড়তেন। (এটি পরের যুগের কথা হচ্ছে) দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন দাঁড়ি ভুল জায়গায় দেয়া হলে তিনি সেই কপি নষ্ট করিয়ে নতুন করে লেখাতেন, এভাবে কর্মচারীরা ২/৪ দিন বা যতক্ষণ নতুন কপি প্রস্তুত না হত বেকার বসে থাকত। সে যুগের প্রেস এবং লেখার ব্যবস্থা ভিন্ন ছিল। আজকালকার মত নয় যে, কম্পিউটারে বসে তাৎক্ষণিকভাবে ছাপিয়ে দিবে। এসব সত্ত্বেও আজকালও অনেক ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে। যাইহোক, তিনি বলেন, এটি প্রস্তুত হওয়ার পর তিনি আবার তা পড়তেন এবং ভুল দেখলে পুনরায় সেটি নষ্ট করিয়ে ততক্ষণ বই ছাপতে দিতেন না, যতক্ষণ নিশ্চিত না হতেন যে, এতে কোন ভুল-ভ্রান্তি নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জিজ্ঞেস করতেন, বই ছাপতে এত বিলম্বের হেতু কী? তিনি বলতেন যে, হুযূর! প্রুফে অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও পরিষ্কার এবং ভাল জিনিস পছন্দ করতেন, তাই কখনো তিনি এটি মনে করতেন না যে, শ্রমিকরা বা কর্মীরা এমনিতেই বসে আছে আর অনর্থক পয়সা নিচ্ছে। তাঁর এই চিন্তা ছিল না যে, লিপিকার বা অন্যান্য কর্মীরা বেকার বসে আছে। তিনি বইয়ের উন্নত মান চাইতেন আর বলতেন, ঠিক আছে, মান উন্নত হওয়া চাই। কর্মীরা কয়েক দিন বেকার থেকে বেতন ভোগ করলেও কোন অসুবিধা নেই। তিনি মানুষের সামনে ভাল জিনিস উপস্থাপন করা পছন্দ করতেন।

এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরেকটি অভ্যাস ছিল, বইয়ে সামান্য ত্রুটি থাকলেও তা ছিড়ে বলতেন, আবার লিপিবদ্ধ কর। লিপিকার পুনরায় লিপিবদ্ধ করত, কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সেটি যতক্ষণ পুনরায় ভালভাবে লেখা না হতো, তিনি প্রবন্ধ ছাপতে দিতেন না। মসীহ্ মাওউদ (আ.) যার হতে লেখাতেন প্রথম দিকে তিনি আহমদী ছিলেন না কিন্তু পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তার ছেলেও আহমদীয়াত গ্রহণ করে। তার মাঝে অর্থাৎ লিপিকারের মাঝে একটি ভাল গুণ যা ছিল তাহলো, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গুরুত্ব বুঝতেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও তাকে চিনতেন। অ-আহমদী হওয়া সত্ত্বেও যখনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুলেখকের প্রয়োজন হতো বা লিপিকারের প্রয়োজন হতো তাকে কাদিয়ান ডাকা হতো।

তিনি বলেন, সেযুগে বেতন যৎসামান্য হতো। মাসিক ২৫ রুপি এবং খাবারের জন্য ভাতা দেয়া হতো। লিপিকারের অভ্যাস ছিল, কাজ সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসতেন এবং বলতেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, আমাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি (আ.) বলতেন, এত তাড়াহুড়ার কি আছে? এখনও বই এর ছাপাকাজ চলছে। আমাদের লিপিকারের প্রয়োজন, তিনি বলতেন, হুযূর, আমাকে যেতেই হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন এখনও তো কিছু লেখার কাজ বাকী আছে। তিনি বলতেন, হুযূর এখানে রুটি বানাতে হয়, এতে আমার সারাটা দিন নষ্ট হয়ে যায়। রুটি বানাবো, না লিখবো? আমার সারা দিন রুটি বানাতেই কেটে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, আচ্ছা আমি আপনার রুটির ব্যবস্থা অতিথিশালা থেকে করিয়ে দিচ্ছি। এভাবে তিনি ৩৫রুপি বেতনও পেতেন আর বিনামূল্যে খাবারও পেতেন। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় হুযূরের কাছে এসে বলতেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি। হুযূর জিজ্ঞেস করতেন, ব্যাপার কি? তিনি বলতেন, হুযূর লঙ্গর খানার রুটিও কি রুটি হল? ডাল পৃথক, পানি পৃথক আর লবনও থাকে না। (এখানেও আজকাল অনেক সময় এভাবেই রান্না করা হয়) কোন সময় এত বেশি মরিচ ঢেলে দেয়া হয় যে, শুষ্ক রুটি খেতে হয়, এই রুটি খেয়ে কোন মানুষ কাজ করতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে, বল কি করব? তিনি বলতেন, এর জন্য অতিরিক্ত কিছু অর্থ আমাকে দিন, এই সমস্যার চেয়ে স্বয়ং রুটি বানানোর কষ্ট সহ্য করা শ্রেয়। আমি নিজেই রুটি বানিয়ে নিব। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন আরো ১০রুপি বৃদ্ধি করেন এবং বলেন, ঠিক আছে এখন থেকে আপনাকে মাসিক ৪৫ রুপি দেয়া হবে। ২৫ থেকে ৪৫ রুপিতে উপনীত হয়। ১০ দিন পর তিনি আবার এসে বলেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, আমাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিন, এখানে সারাদিন রুটি বানাতেই সময় চলে যায়, কাজ আর কি করব? তখন তিনি বলতেন, তাহলে কি করা যায়। তিনি বলেন, হুযূর! লঙ্গরখানায় ব্যবস্থা করিয়ে দিন। তিনি (আ.) বলতেন, ঠিক আছে, তুমি ৪৫ রুপি পাবে আর খাবারও লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা থেকেই ব্যবস্থা করিয়ে দিচ্ছি। তিনি ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করতেন। কিছুদিন পর আবার এসে বলতেন, হুযূর! সালাম করতে এসেছি, আমি যাওয়ার অনুমতি চাচ্ছি, হুযূর জিজ্ঞেস করতেন ব্যাপার কি? তিনি বলতেন, হুযূর, লঙ্গরখানার রুটি আমি খেতে পারি না, এটি কোন রুটি হলো, আপনি আমাকে রুটির জন্য পৃথক ১০ রুপি দিন, আমি নিজেই ব্যবস্থা করব।

হুযূর আরো ১০ রুপি বৃদ্ধি করে ৫৫ রুপি করে দেন। সে ব্যক্তি যেহেতু হুযূরের পবিত্র অভ্যাস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন,

তাই তিনি তার ছেলেকে বলে রেখেছিলেন, আমি তোমার পিছনে লাঠি নিয়ে ছুটবো আর তুমি হৈ-চৈ করতে করতে হুযূরের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করবে। এভাবে পিতা লাঠি নিয়ে ছেলের পিছনে ছুটতো আর সেই ছেলে হৈ চৈ বা চিৎকার করতে করতে হুযূরের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করত আর বলতো, আমাকে মেরে ফেলছে, আমাকে মেরে ফেলছে। ততক্ষণে পিতাও সেখানে এসে পৌঁছতো আর বলতো, বাইরে আস্ আমি তোকে দেখে নিচ্ছি। হুযূর এই অবস্থা দেখে, জিজ্ঞেস করতেন, কি হয়েছে, ছোট ছেলেকে কেন পেটাচ্ছ? সে উত্তর দিত, হুযূর, ৭/৮ দিন পূর্বেই তাকে জুতা কিনে দিয়েছি আর সে হারিয়ে এসেছে, আমি কিছু বলিনি, পুনরায় কিনে দিয়েছি আবার হারিয়ে ফেলেছে, এখন আমার জুতা কিনে দেয়ার সামর্থ কোথায়, তাই আমি তাকে শাস্তি দিব, যদি আজকে শাস্তি না দিই তাহলে আগামীকাল আবার জুতা হারিয়ে ফেলবে। হুযূর বলেন, মিয়া জুতার দাম কত বল? সে বলত, ৩ রুপি।

হুযূর বলতেন, যাও আমার কাছ থেকে ৩ রুপি নিয়ে যাও আর তাকে কিছু বলো না। এভাবে ৩ রুপি নিয়ে সে ফিরে আসত। চার দিন পার হতে না হতেই পুনরায় ছেলে হৈ চৈ করত আর হুযূরের কামরায় প্রবেশ করত, আর হৈ চৈ করে সেই ব্যক্তিও লাঠি নিয়ে আবার তার পিছনে ছুটে আসত আর বলত, বাইরে আয়। সেদিন হুযূরের বলাতে ছেড়ে দিয়েছি, আজকে তোকে ছাড়ব না। হুযূর জিজ্ঞেস করতেন ব্যাপার কি? ছেলেকে মারছো কেন? সে বলত, হুযূর, সেদিন তো আপনার বলার কারণে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আজ একে ছাড়ব না, আজকে পুনরায় জুতা হারিয়ে এসেছে। হুযূর বলেন, তাকে মেরো না, জুতার ক্রয় মূল্য আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও। এভাবে পুনরায় যে টাকা বলত, তা হুযূরের কাছ থেকে নিয়ে চলে যেত আর বলতো, হুযূর এবার ছাড়তাম না শুধু আপনার বলার কারণেই ওকে ক্ষমা করছি। বস্তুতঃ সেই লোক এমনটি করতেই থাকতো। কিন্তু অনুলিখনের কাজ এত সুন্দরভাবে করত যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার হাতেই বই এর অনুলিখন করাতেন আর কোন সাধারণ লিপিকারের হাতে লিখিয়ে খারাপ করা পছন্দ করতেন না, কেননা মানুষের দৃষ্টিতে এভাবে কিতাবের মান হ্রাস পায়।

যাহোক চুটকি বা কৌতুক হিসেবে জুতার কথা উল্লেখ করেছেন বা বেতন বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের বই ছাপা সম্পর্কে যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা স্পষ্ট হয়। অন্যদের সামনে ইসলামের সুরক্ষা ও এর সৌন্দর্য তুলে ধরার জন্য যথাসাধ্য উত্তম জিনিস উপস্থাপন করা উচিত আর স্বজনদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যও সর্বোত্তম রূপে ইসলামের চিত্র সামনে ফুটিয়ে তোলা উচিত।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগ সহ পড়ার চেষ্টা করা উচিত। এর মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে, তবলীগের আগ্রহও বাড়বে। এরফলে আমাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে আর পৃথিবীবাসীকে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করার আমরা যোগ্যতা লাভ করবো। আসল বরকত এবং কল্যাণ হলো, বাদশাহ্‌দের ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হওয়া আর তাদের নিজেদের জীবনকে সেই অনুসারে পরিবর্তন করা। নতুবা অধিকাংশ বরং বলা উচিত, দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব মুসলমান বাদশাহ্ এবং নেতা এখন ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করছে। মুখে ইসলামের জপে কিন্তু হৃদয় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার পিছনে ছুটছে, যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে তাদের হাতে।

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যেখানে ইসলামের প্রসার এবং প্রচার হওয়ার কথা, তাঁর পোশাক থেকে মানুষের আশিস সন্ধান করার কথা, যেসব বাদশাহ্‌রা তাঁর মাধ্যমে আসবে তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুধাবন করেই আসবে। এটিই প্রকৃত আশিস এবং বরকত বা কল্যাণ আর এর জন্য আমাদেরও এ প্রকৃত শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করা উচিত আর সে অনুসারে তবলীগ হওয়া উচিত। যুবকদেরও এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, তবেই ***'বাদশাহ্ তোমার পোশাকে আশিস অন্বেষণ করবে'*** এর সত্যিকার মর্ম এবং অর্থ আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে আর আমরা তা বুঝতেও পারবো আর তবলীগের উন্নত মানও আমরা অর্জন করতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে একথা বুঝার তৌফিক দান করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি কয়েকটি জানাযাও পড়াবো, দু'টো উপস্থিত জানাযা আর একটি গায়েবানা জানাযা।

একটি হলো জনাব চৌধুরী আব্দুল আযীয ডোগার সাহেবের, যিনি কিছুকাল থেকে যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রিতে বসবাস করছিলেন। ২০১৬ সনের ১১ই জানুয়ারী ৮৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মাষ্টার চেরাগ দ্বীন সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। কাদিয়ানের নিকটবর্তী খারা ছিল তার পৈত্রিক নিবাস। মাষ্টার চেরাগ দ্বীন সাহেব হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবের ক্লাস সহপাঠী হওয়ারও সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার পিতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। খারা'য় তাদের পরিবারে আহমদীয়াত তার দাদা হযরত চৌধুরী আমীর বক্স সাহেবের মাধ্যমে এসেছে, আযীয ডোগার সাহেবের পিতার কথা হচ্ছে এখানে।

চৌধুরী আব্দুল আযীয ডোগার সাহেবও সারা জীবন জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। প্রথম দিকে তিনি প্রায় ৩১ বছর পর্যন্ত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দাওয়াখানায় মানব-সেবার কাজ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এরই দাওয়াখানা ছিল এটি, তাতে তিনি কাজ করেছেন, হুযূর স্বয়ং তাকে হিকমত বা দেশীয়-ভেষজ চিকিৎসা-পদ্ধতি শিখিয়েছেন। চতুর্থ খিলাফতের যুগে কেন্দ্র তাকে গাম্বিয়া এবং জার্মানী ইত্যাদি দেশে বিভিন্ন নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠিয়েছে। এভাবে তার জামাতি বিভিন্ন ভবন বা বিল্ডিং নির্মাণের সুযোগ হয়েছে। রাবওয়ায় অবস্থানকালে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ায় মোহতামীম মোকামী হিসেবেও কাজ করেছেন আর কয়েক বছর তাহরীকে জাদীদেও খিদমত করার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৭৪-এ আল্লাহ্‌র পথে বন্দী জীবন কাটানোরও তার সৌভাগ্য হয়।

আহমদী চিকিৎসক এশোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এবং আহমদী ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সনে তিনি লন্ডন থেকে

কভেন্ট্রীতে স্থানান্তরিত হন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানে সেক্রেটারী তরবীয়ত এবং সেক্রেটারী ওসীয়্যত হিসেবে কাজের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও (তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ছিলেন) আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সকল অনুষ্ঠানে অংগ্রহণের চেষ্টা করতেন। জার্মানী এবং ইউরোপের ট্যুরে আমি যেখানেই যেতাম, দেখতাম যে তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন। সম্প্রতি অসুস্থ ছিলেন তা সত্ত্বেও অনেক চেষ্টা করে তিনি হল্যান্ডের সংসদে যে অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কয়েকটি বই প্রকাশের সৌভাগ্যও তার হয়েছে। যেমন সীরাত হযরত আম্মাজান, সীরাত হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব, অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন দোয়া এবং 'আক্বওয়ালে যাররীঁ' নামে পুস্তিকা ছাড়াও চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের একটি বই প্রকাশ করারও সুযোগ পেয়েছেন। খুবই ভদ্র, মিশুক, নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মূসী ছিলেন। তার চার কন্যা এবং তিন পুত্র রয়েছে। ছেলে জার্মানীতে জামাতের কাজের সৌভাগ্য পাচ্ছেন, মেয়েও মিডল্যান্ড লাজনার প্রেসিডেন্ট। তার ভাই তৈয়্যব সাহেব বলেন, ১৯৪৭ সনে যখন হিজরত করেন তখন মাকে অসুস্থ অবস্থায় কাদিয়ান থেকে শিয়ালকোট পর্যন্ত কাঁধে বহন করে নিয়ে যান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও তার এই সেবার কথা এক খুতবায় উল্লেখ করেছেন। তার গ্রাম ছিল 'খাঁরা' যা কাদিয়ানের পাশেই অবস্থিত। দেশ বিভাগের সময় সেখানে তিনি নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। বড় বীরত্বের সাথে মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কাদিয়ানের দরবেশদের হিফাযত এবং বন্দীদের মুক্তি-সংক্রান্ত কিছু বিষয়াদি দেখাশুনার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভারতে একটি প্রতিনিধি দল নিযুক্ত করেন, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর ইনচার্জ ছিলেন, তিনিও সেই কমিটির একজন সভ্য ছিলেন।

ইলিয়াস মুনীর সাহেব বলেন, তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনার তত্ত্বাবধায়ক এবং ইনচার্জ ছিলেন কিন্তু আমি তাকে শ্রমিকদের মত কাজ করতে দেখেছি। অনুরূপভাবে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়ের সময় সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বোত্তম জিনিসের সন্ধান করতেন। বাজারে ঘুরে ঘুরে জামাতের অর্থ সাশ্রয়ের চেষ্টা করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল। একবার তার হাঁটুতে কষ্ট হয়, তিনি বলেন, এটি সাময়িক কষ্ট, এটি স্থায়ী হতে পারে না, কেননা আমার ডান হাঁটুতে একবার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) পা রেখে ঘোড়ায় আরোহন করেছিলেন তাই আশা করি তাঁর কল্যাণে কষ্ট হবে না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চলাফেরাতেই ছিলেন। এক সময় কঠিন অবস্থাও আসে, পরীক্ষার সম্মুখীন হন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই বিশ্বস্ততার সাথে সেই সময় অতিবাহিত করেছেন, নিজের ঈমানকে নিষ্কলুষ এবং পবিত্র রেখেছেন। খোদা তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন, করুণায় সিক্ত করুন, তাঁর প্রিয়দের চরণে ঠাঁই দিন। তার সন্তান-সন্ততিকেও সবসময় খিলাফত এবং জামাতের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ইকবাল নাসিম আযমত বাট সাহেবার। যিনি গোলাম সারোয়ার বাট সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ১৩ই জানুয়ারী ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি কড়িয়াওয়ালা নিবাসী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী করম ইলাহী সাহেবের পৌত্রী, হযরত মিরাবক্স সাহেবের দৌহিত্রী এবং হযরত শেখ মুহাম্মদ বক্স রইছে আযম এর পুত্রবধু, যার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ***'এক না একদিন পেশ হোগা তু ফানাকে সামনে'*** নযমটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত নেক, পুণ্যবতী, সময়মত নামাযে অভ্যস্ত, মিশুক, অতিথি পরায়না, সবার সাহায্যকারীনি একজন ভদ্র মহিলা ছিলেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং সুসম্পর্ক ছিল । তিনি মুসীয়া ছিলেন। তিনি ৩জন পুত্র এবং ২ কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার ভাতিজা নাসিম আক্তার বাট সাহেব এখানে আঞ্চলিক বা রিজিওনাল আমীর। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন।

একটি গায়েবানা জানাযাও রয়েছে, এটি হলো সিদ্দিকা সাহেবার, যিনি কোরাইশী মোহাম্মদ শফি আবেদ সাহেবের স্ত্রী, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ। ২০১৬ সনের ৬ই জানুয়ারী দীর্ঘদিন সহ্যাসায়ী থাকার পর ৮৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুন্সী মেহের উদ্দিন পাটোয়ারী সাহেবের পৌত্রী এবং হাকীম আব্দুল্লাহ্ ওবায়দুল্লাহ সাহেবের কন্যা ছিলেন। দেশ বিভাগের পূর্বেই তার বিয়ে হয়েছিল, পরে কয়েক বছরের জন্য পাকিস্তানে হিজরত করেন এরপর প্রথম কাফেলাতেই কাদিয়ানে ফিরে আসেন। তিনি তার স্বামীর সাথে সারাজীবন দরবেশীর জীবন অতিবাহিত করেছেন। অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন কাটিয়েছেন। সবর তথা ধৈর্য এবং আল্লাহ্‌র ওপর তওয়াক্কুলের মাঝে জীবন কাটিয়েছেন। মুসীয়া ছিলেন, খুব একটা স্বচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও আর্থিক বিভিন্ন তাহরীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তাহাজ্জুদ গুজার ও খোদাভীরু নারী ছিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের কুরআন পড়াতেন। খিলাফতের সাথে ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল।

তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন ছেলে এবং পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। এক ছেলে কোরাইশী আফযাল সাহেব কাদিয়ানে নায়েব নাযের ইশায়াত, এক ছেলে কোরাইশী মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ্ সাহেব অডিটর হিসেবে জামাতের কাজের সৌভাগ্য পাচ্ছেন। তার এক জামাতা কাদিয়ানে জামাতের খিদমত করছেন, আরেকজন লাহোরে জামাতের মুরুব্বী।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকে বিশ্বস্ততার সাথে খিদমতের তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রনয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৬তম কিস্তি)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে এ অধমকে যারা গ্রহণ করলেন আর যারা তাকে অস্বীকার করলেন এতদউভয়ের মাঝে শান্তি ও সৌভাগ্যের অধিকতর নিকটবর্তী কে বা কারা?

জানা আবশ্যক, অত্যন্ত পরিষ্কার ও দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল এ বিষয়টি যে, এ অধমের প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়া যারা মেনে নিয়েছেন তারা সব রকম শঙ্কামুক্ত ও নিরাপদ অবস্থানে উপনীত এবং বহুবিধ পুণ্য ও পুরস্কার এবং ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী সাব্যস্ত হলেন।

প্রথমতঃ তাঁরা নিজ ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করলেন। তাকে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপকারী বা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলেন না এবং তার সম্পর্কে অলীক ও অযথা সন্দেহ-সংশয় অন্তরে জমতে স্থান দিলেন না। এই কারণে তাঁরা সেই পুণ্য ও পুরস্কার লাভের অধিকারী হলেন যা আপন ভাইয়ের প্রতি সুধারণা রাখার অবস্থায় লাভ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ সমাগত সত্য গ্রহণ করার সময়ে তাঁরা কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হলেন না এবং প্রবৃত্তিমূলক আবেগ-উত্তেজনাও তাদের ওপর প্রবল হতে পারল না। এই কারণে তারা এ পুরস্কারের অধিকারী সাব্যস্ত হলেন যে তারা সত্যের ডাকে সাড়া দিয়ে এবং একজন ঐশী আহ্বানকারীর আওয়াজ শোনে ঐশীবার্তা গ্রহণ ও বরণ করে নিলেন আর এ পথে কোনো বাধা আসার দরুন থেমে রইলেন না বা পিছপা হলেন না।

তৃতীয়তঃ ঐশী ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিকাশস্থল ব্যক্তির ওপর ঈমান আনার কারণে তারা ঐসব সন্দেহ-সংশয় থেকে পরিত্রাণ পেলেন যা অপেক্ষা করতে করতে (কাল ক্ষেপনের দরুন) সৃষ্টি হয়, আর অবশেষে নৈরাশ্যের অবস্থায় ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়।

এই সৌভাগ্যশালী লোকেরা কেবল উল্লিখিত শঙ্কাসমূহ থেকেই নিষ্কৃতি পান নি, বরং খোদা তা'লার একটি নিদর্শন এবং তাঁর নবীর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী তাদের জীবদ্দশায় পূর্ণ হতে দেখে ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক উন্নতি লাভ করলেন। আর তাদের শ্রুতিসর্বস্ব ঈমান এক মা'রিফাত তথা চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানের রং ধারণ করলো। এখন এমন সব ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পর্কে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হতে থাকা ঐসব বিস্ময় বা হয়রানীর কবল থেকে তাঁরা মুক্ত হলেন যা পুরো হয়নি বা বাস্তবায়নের পর্যায়ে উপনীত হয়নি ।

চতুর্থতঃ খোদা তা'লার প্রেরিত বান্দার ওপর ঈমান এনে তারা তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছেন যা ঐসব অবাধ্য ও ঐশী-আদেশ অমান্যকারীদের ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে যাদের ভাগ্যে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান ছাড়া অন্য কিছুই জুটে না।

পঞ্চমতঃ তাঁরা ঐসব কল্যাণ ও আশিসের উত্তরাধিকারী বলে সাব্যস্ত হলেন যা ঐ সকল ব্যক্তির ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে যারা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত বান্দাকে সরল অন্তরে গ্রহণ করেন।

এ হলো সেই সব কল্যাণ যদ্বারা ইনশাআল্লাহ্ তাঁরই অনুগ্রহক্রমে ঐ সকল সৌভাগ্যবান লোকদের ভূষিত করা হবে যারা এ অধমকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু যারা গ্রহণ করলেন না তারা এই যাবতীয় সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলেন।

তাদের এমন সন্দেহ করাটাও অলীক ও অযথা যে, (আমাকে) গ্রহণ করার অবস্থায় তাদের কোন ধর্মীয় ক্ষতি বা ত্রুটি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। আমি বুঝতে পারি না যে ধর্মীয় ত্রুটি কী কারণে ঘটতে পারে। ধর্মীয় ক্ষতি বা ত্রুটি তো এ অবস্থায় হতে পারে যে এ অধম যদি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী কোনো শিক্ষায় পরিচালিত হওয়ার জন্য তাঁদের নির্দেশ দিত। যেমন কোনো হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বলে আমি শিক্ষা দিতাম। অথবা 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভের জন্য আবশ্যকীয় ঈমান সম্পর্কিত তাদের আকিদা-বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য ঘটাতাম, অথবা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি শরীয়ত নির্ধারিত আমল ও বিধি-বিধানে আমি বিন্দুমাত্র সংযোজন বা বিয়োজন করতাম। যেমন পাঁচ বেলার নামাযের জায়গায় দশ বেলার নামায প্রবর্তন করতাম, অথবা দুই বেলা নামায নির্ধারণ করতাম। অথবা এক মাসের পরিবর্তে দুই মাসের রোযা বাধ্যতামূলক করতাম কিংবা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য প্রস্তাবনা করতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে ধর্মে সর্বৈব ক্ষতি বরং কুফরী ও প্রকাশ্য ত্রুটি ঘটতো।

কিন্তু এ অধম যেখানে বার বার এটাই বলছে, 'হে ভ্রাতাগণ! আমি নতুন কোনো দ্বীন (ধর্ম) বা নতুন শিক্ষা নিয়ে আসিনি। বরং আমি তোমাদেরই মধ্যকার এবং তোমাদেরই মতো একজন মুসলমান। আমাদের মুসলমানদের আমল ও অনুসরণ করার এবং অন্যদেরও পথ প্রদর্শন করার জন্য কুরআন করীম ছাড়া আর কোনো কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) নেই। আর হযরত খাতামুল মুরসালীন আহমদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কেউ আমাদের পথ প্রদর্শক নেই। আমরা কেবল তাঁরই আনুগত্য ও অনুবর্তিতা করি এবং অন্যদের দিয়েও করাতে চাই। তাই একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্য ওহী-ইলহাম তথা ঐশীবাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত আমার এই দাবীর প্রতি ঈমান আনয়নে (ধর্মচ্যুতিমূলক) আশঙ্কার জায়গা কোনটি ও কী-বা হতে পারে?'

বড় জোর যদি ধরাও হয় যে আমার কাশ্‌ফ ও ইলহাম বুঝতে আমার ধোকা লেগেছে–আমি ধোকাগ্রস্ত, তাহলে গ্রহণকারীর এতে কি-বা ক্ষতি? সে কি এমন কিছু গ্রহণ করছে যার দরুন তার ধর্ম (ইসলাম) পালনে ব্যাঘাত বা বিচ্যুতি সৃষ্টি হতে পারে?

আর আমাদের জীবদ্দশায় যদি সত্যি-সত্যিই হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম আকাশ থেকে নেমে আসেন তাহলে আমি এবং আমাদের জামাত সানন্দে সবার আগে তাঁকে গ্রহণ ও বরণ করে নেব। এতে করে আমরা প্রথম বিষয়টির জন্যও সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবো (অর্থাৎ সদৃশ আকারে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনের বিষয়েও) আমরা একান্ত খাঁটি নিয়্যতে সর্বান্তকরণে খোদাভীতি সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আর এতে ভুল হয়ে থাকলেও (যদি বড় জোর তাই ধরে নেয়া হয় তবুও) আমাদের সওয়াবের মাত্রা এগিয়েই থাকবে–আমরা দু'টি সওয়াব পাব, আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কেবল একটির ভাগী হবেন। কিন্তু আমরা যদি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণকারী হয়ে থাকি এবং আমাদের বিরোধীগণ ভবিষ্যতের প্রত্যাশা রচনায় বিপথগামী হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ঈমান অতি আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিপতিত। কেননা তারা যদি তাদের জীবদ্দশায় সত্যি-সত্যি হযরত মসীহ্ ইবনে-মরিয়মকে 'মহা প্রতাপ ও জাঁকজমকের সঙ্গে' আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখতে পান এবং প্রকাশ্যে নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন যে তিনি ফিরিশ্‌তাদের কাঁধে ভর করে নেমে আসছেন তাহলে তো তাদের ঈমান সহীহ্-সালামত থাকবে। নচেৎ এর বিপরীত অবস্থায় ঈমান বহাল ও অক্ষুন্ন থাকার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আকাশ থেকে হযরত মসীহকে নামতে তাঁরা যদি দেখতে না পান, বরং আকাশের দিকে যাওয়ার জন্য তাদের নিজেরই প্রস্তুতি সাব্যস্ত হয়ে দাঁড়ায় (অর্থাৎ তারা নিজেরাই মৃত্যুমুখে পতিত হন– অনুবাদক), তাহলে নিঃসন্দেহে তারা তখন কতো সন্দেহ-সংশয় সঙ্গে বয়ে নিয়ে প্রস্থান করবেন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কতো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাদের হৃদয় জুড়ে আলোড়িত হতে থাকবে। আর যথাসম্ভব তখন এমন কোনো মারাত্মক সন্দেহের উদ্রেক হবে যার দরুন তৎক্ষণাৎ ঈমানই সাঙ্গ হবে।

কেননা বর্তমান কালটি ইঞ্জিল ও পবিত্র হাদীসের নির্দেশনা ও ইঙ্গিতসমূহ অনুযায়ী সেই সময়কাল, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাব হওয়া উচিত। এ কারণেই অতীত বুযুর্গানে-উম্মতের মাঝে কাশ্‌ফ ও ইল্‌হামের অধিকারী বহু সংখ্যক সিদ্ধপুরুষ মসীহ্‌র আবির্ভাব হিজরি চৌদ্দ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বছরগুলোতেই হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অতএব শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী (কুদ্দিসা সির্‌রুহু)-এর রায় বা অভিমত এটাই এবং মরহুম মৌলবী সিদ্দীক হাসান খানও তাঁর রচিত এক (সুখ্যাত) পুস্তকে এমনটিই লিখেছেন। আর "আল-আয়াতু বা'দাল মিয়াতাইন" (অর্থাৎ 'হিজরি বারো শ' বছর পরে পড়েই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাবসহ কিয়ামত নিকটবর্তী চিহ্নসমূহ প্রকাশিত হবে'– অনুবাদক) হাদীসটির অর্থের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুহাদ্দিস এদিকেই মত প্রকাশ করেছেন।

যদি বলেন, আকাশ থেকে 'দামেস্কের মিনারার নিকট অবতীর্ণ' হওয়াই হলো সকল মুসলমানের সর্বসম্মত বিশ্বাস, এর উত্তরে আমি বিশদভাবে এ পুস্তকেই লিখে এসেছি যে, একথার ওপর 'ইজ্‌মা' (সর্বসম্মত ঐকমত্য) প্রমাণিত নয়। কুরআন করীমে এর উল্লেখ কোথায় আছে? কুরআন করীমে তো কেবল তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে। সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার 'রূহ' তথা আত্মার সাথে হযরত ঈসার আত্মা দ্বিতীয় আকাশে একত্রে রয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। আর দামেস্কে তাঁর অবতরণের কথাটি উপেক্ষা করা হয়েছে। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ্ (দামেস্কের পরিবর্তে) বাইতুল-মুকাদ্দাসে (তথা জিরোশালিমে) হযরত মসীহ্ অবতীর্ণ হবেন বলে বর্ণনা করেছেন। আর এঁদের মাঝে কেউ এ দাবী করেন নি যে, (হাদীসসমূহে বর্ণিত) সকল নাম ও শব্দ বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থেই রয়েছে। বরং তাঁরা সবাই কেবল ভবিষ্যদ্বাণীর আকারটিতে সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস রেখেছেন। অতএব এরপর 'ইজমা' আবার কোন্ বিষয়ে সাব্যস্ত হল?! তবে অবশ্য হি: তেরো শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমন একটি সর্ববাদি সম্মত বিশ্বাস হিসেবে প্রতীয়মান বটে।

অতএব এই অধম যদি প্রতিশ্রুত মসীহ্ না হয়ে থাকে তাহলে আপনারা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে আকাশ থেকে নামিয়ে দেখিয়ে দিন। আপনারা তো সালেহীন তথা সৎ-সাধুগণের বংশধর, কাজেই মসজিদে বসে উচ্ছসিত ক্রন্দন ও আহাযারীর মাধ্যমে প্রার্থনা করুন, হযরত ঈসা-ইবনে-মরিয়ম যেন আকাশ থেকে ফিরিশতাদের কাঁধে ভর করে নেমে আসেন। এর ফলশ্রুতিতে আপনারা যাতে সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারেন। নচেৎ কেন অযথা কুধারণা পোষণ করেন এবং "লা তাক্‌ফু মা লাইসা লাকা বিহি-ইল্‌মুন" [অর্থাৎ 'যা তোমার জানা নাই সে বিষয়ে তুমি কোনো অবস্থান নিওনা' (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭) অনুবাদক] –আয়াতটির আওতাধীন কেন অভিযুক্ত হচ্ছেন? খোদা তা'লাকে ভয় করুন।

মর্মস্পর্শী সূক্ষ্মতত্ত্বঃ কয়েক দিন হলো, এ অধম (আল্লাহ্‌র দরবারে) মনোযোগ নিবদ্ধ (পূর্বক নিবেদন) করলো, "আল-আয়াত বা'দাল মিয়াতাইন"–হাদীসটির আওতায় কি এ ঐশী অভিপ্রায়টি নিহিত রয়েছে যে, হিঃ তেরো শতাব্দীর শেষ প্রান্তে প্রতিশ্রুত মসীহ্ আবির্ভূত হবেন? আর এ অধমও কি হাদীসটির মর্মের অন্তর্গত? অতএব আমাকে কাশ্‌ফী ভাবে নিম্নবর্ণিত নামটির অক্ষরসমূহের আরবী বর্ণ মালার মান-নির্ণয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হলো, দেখ, ইনিই সেই মসীহ্– তেরো শতাব্দী পুরো হওয়ার পরে পরেই যার আবির্ভাব হওয়া নির্ধারিত ছিল। পূর্ব থেকে এ তারিখটিই আমরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম। সে-নামটি হচ্ছে 'গোলাম আহমদ

কাদিয়ানী'। এ নামের বর্ণগত মূল্যমান পুরোপুরি ১৩০০ (তেরো শ')। কাদিয়ান শহরটিতে এ অধম ছাড়া 'গোলাম আহমদ' নামের অন্য কোনো ব্যক্তি নেই। বরং আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক করা হলো যে, এই সময় এ অধম ছাড়া পৃথিবী জুড়ে 'গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' নামটি অন্য কারও নেই। ['গোলাম আহমদ কাদিয়ানী' নামটি আরবী বর্ণ মালার মান-নির্ণয়ের ধারায় নিম্নরূপঃ গাইন-১০০০, লাম-৩০, আলিফ-৯, মিম-৪০, আলিফ-১, হা-৮, মিম-৪০, দাল-৪, কাফ-১০০, আলিফ-১, দাল-৪, ইয়া-১০, আলিফ-১, নুন-৫০, ইয়া-১০ = সর্বমোট ১৩০০। –অনুবাদক]।

এ অধমের সাথে আল্লাহ্ তা'লার চিরায়ত এ রীতি বা প্রয়াশ জারি রয়েছে যে, তিনি কোন কোন গোপন রহস্য উল্লেখিত ধারায় উদ্ঘাটিত করে থাকেন। একবার আমি আদম (আ.) এর জন্ম তারিখ জানার বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে আমাকে ইঙ্গিতে জানানো হয় যে, সূরা আল-আস্‌র-এর অক্ষর সমূহের গাণিতিক মূল্যমানে দৃষ্টি দাও, এগুলো থেকে উক্ত তারিখ নির্ণিত হয়।

একবার আমি আমার বাসভবন-সংলগ্ন মসজিদটির নির্মাণ তারিখ ইল্‌হাম যোগে জানতে চাইলে আমার প্রতি এ ইলহাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয় ঃ "মুবারাকুন ওয়া মুবারিকুন ওয়া কুল্লু আমরিম্ মুবারাকিন ইউজ্‌আলু ফীহি" [(অর্থাৎ, 'এটি এক কল্যাণময় ও কল্যাণকারী মসজিদ এবং কল্যাণজনক সব বিষয় এতে রাখা (বা নিহিত করা) হয়েছে যা সুসম্পন্ন করা হবে'–অনুবাদক]। এটি সেই মসজিদ যার সম্পর্কে আমি এ পুস্তকটিতে লিখে এসেছি যে, আমার বাসভবন এ শহরের পূর্বদিকে জনবসতির শেষ প্রান্তে অবস্থিত ও এ মসজিদেরই সন্নিকট এবং এর পূর্বদিকে মিনারার নীচে (বা পাদদেশে) অবস্থিত– যেমনটি আমাদের মনিব ও অভিভাবক (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে স্পষ্টই প্রতিভাত, 'সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'।

এই কয়েকদিন আগের কথা, এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে খোদা তা'লা আরবী বর্ণমালার মান-নির্ণয়ের ধারায় আমাকে এক সংবাদ জানালেন। এর মোদ্দাকথা হলোঃ "কালবুন ইয়ামূতু আলা কালবিন" অর্থাৎ এক কুকুরতুল্য ব্যক্তি। কুকুর (তথা এর আরবী 'কাল্‌ব' শব্দে)-র বর্ণগুলোর গাণিতিক মান নির্ণয়ের ধারায় নির্ধারিত মেয়াদে মারা যাবে। এ শব্দটিতে (উক্ত ধারায়) বায়ান্ন (৫২) বছর বুঝায়। অর্থাৎ তার বয়স বায়ান্ন বছর অতিক্রম করবে না। যখন সে বায়ান্ন বছরে পদার্পণ করবে তখন সে ওই বছরটিতেই পরলোকের পথে পাড়ি জমাবে।

এখন পুনরায় আমি পূর্ববর্ণিত বিষয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আমাদের জামাত একটি সৌভাগ্যশালীদের জামাত, যারা যথাসময়ে আবির্ভূত এই প্রত্যাদিষ্ট বান্দাকে গ্রহণ করেছে, বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহ্ যাকে পাঠিয়েছেন। তাদের অন্তর তাকে বরণ করে নিতে একটুও সংকোচ করে নি। কেননা তারা ছিলেন ওই সকল সৌভাগ্যশালী, যাদের তিনি নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন। তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। অন্যদের এই ভাগ্য দান করেন নি। তাদের অন্তর খুলে দেন। অন্যদের খুলেন নি। যারা তাকে গ্রহণ করেছে তাদের আরও দান করা হবে। তাদের সমৃদ্ধি দেওয়া হবে। কিন্তু যারা গ্রহণ করে নি তাদের কাছে যা পূর্বে ছিল তাও তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হবে। বহু সত্যপরায়ণ ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যাতে তাঁর সময়কাল দেখতে পান। কিন্তু এরা দেখতে পেয়েও তাঁকে গ্রহণ করে নি। এদের অবস্থার আমি কোন্ জাতির অবস্থার সাথে তুলনা করবো? এদের ক্ষেত্রে এই উপমাটি সঠিক যে, এক বাদশাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক শহরে নিজ পক্ষ থেকে একজন হাকিম নিযুক্ত করে পাঠান যাতে পরখ করে দেখেন, প্রকৃতপক্ষে কে অনুগত আর কে অবাধ্য। আর যাতে ওই সব ঝগড়া-বিবাদেরও বিচার-নিষ্পত্তি হয়ে যায় যা তাদের মাঝে বিরাজ করছে।

অতএব সেই হাকিম ঠিক সে সময় আসলেন যখন তাঁর আসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনি তাঁর সম্মানিত প্রভুর বাণী পৌঁছে দিলেন। সবাইকে সত্য-সঠিক পথের দিকে আহ্বান করলেন এবং প্রতিশ্রুত 'হাকাম' (তথা ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী) হিসেবে তাঁর প্রেরিত হওয়া তাদের বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর সরকার নিযুক্ত কর্মচারী হওয়ার বিষয়ে সন্দিহান হলো। তখন সে-হাকিম এমন চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহ দেখালেন যা নিযুক্তি পাওয়া কর্মচারীদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তারা মানলো না। তাকে গ্রহণ করলো না। বরং তাকে ঘৃণার চোখে দেখলো এবং নিজেদের বড় কিছু মনে করলো। তাদের উদ্দেশ্যে তাঁর 'হাকাম' নিযুক্ত হয়ে আসা তারা মেনে নিল না। বরং তাঁকে ধরে অপমানিত ও অপদস্থ করলো। তার মুখে থু থু দিল। তাকে মারার জন্য দৌড়ালো। তাঁকে অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছিত করলো এবং বহুল পরিমাণে কটু কথা বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তখন তিনি তাদের হাতে নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট যা তার নিয়তিতে নির্ধারিত ছিল তা সবই ভোগ করে আপন বাদশাহ্‌র দিকে ফিরে গেলেন। যারা তাঁর এরূপ দুর্গতি ঘটাতে তৎপর হলো তারা অন্য কোন এক হাকিমের আসার অপেক্ষায় বসে থাকল এবং অজ্ঞতাবশতঃ এ মিথ্যে ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে থাকল যে, এ-তো প্রকৃত হাকিম নয়। বরং সে অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি আসবেন। তারই অপেক্ষা আমাদের করা উচিত এই বলে তারা সারাদিন ওই ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করতে থাকল, আর বার বার উঠে তাকিয়ে দেখলো, কখন সে আসবে। তারা বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়েও আপষে আলোচনা করতে থাকল। এমনকি অবশেষে অপেক্ষায় অপেক্ষায় সূর্য ডুবতে লাগল। তবু কেউ আসল না। পরিশেষে সন্ধ্যালগ্নে পুলিশের বহুসংখ্যক সিপাহী, যাদের হাতে বহু সংখ্যক হাত-কড়া ছিল তারা আসা মাত্র ঐ দুষ্টদের শহর পুড়িয়ে দিল। তারপর সবাইকে ধরে প্রত্যেককে হাত-কড়া পরিয়ে দিল এবং আদেশ লঙ্ঘন ও রাজ প্রতিনিধিদের মোকাবিলা করার অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় শাহী আদালতের দিকে তাদের চালান দিল। সেখান থেকে তাদের সে-সব দন্ডেদন্ডিত করা হলো, যা তাদের প্রাপ্য ছিল।

অতএব, আমি সত্যি-সত্যি বলছি, অনুরূপ অবস্থা হবে এই যুগের অন্যায়-অনাচার ও সীমালঙ্ঘণকারী অস্বীকারকারীদের। প্রত্যেক ব্যক্তি তার মুখ, কলম ও হাতের অন্যায় ও অপরাধের জন্য পাকড়াও হবে। শোনার মত যাদের কান আছে তারা শোনে নিক।

(চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা এসব জলসাকে সকল অর্থে আশিসমন্ডিত করুন, দুস্কৃতকারীদের দুস্কৃতি এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এদিনগুলো কাদিয়ানে জলসা সালানার দিন। আগামীকাল থেকে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কাদিয়ানের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হচ্ছে। একইভাবে আজ অস্ট্রেলিয়ার বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকবে। অনুরূপভাবে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হতে যাচ্ছে। সময়ের পার্থক্য থাকার করণে হয়তো কিছুক্ষণ পরই আরম্ভ হবে। পৃথিবীর অন্য দেশেও হয়তো এই দিনগুলোতে জলসা হচ্ছে বা হবে। আল্লাহ্ তা'লা এসব জলসাকে সকল অর্থে আশিসমন্ডিত করুন, দুস্কৃতকারীদের দুস্কৃতি এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। কাদিয়ানের

জলসা সালানার এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে কারণ, এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রাম। এখানেই তিনি খোদা তা'লার অনুমতি স্বাপেক্ষে জলসার সূচনা করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা এবং খুতবায় জলসা সালানার প্রেক্ষাপটে আমাদের সে যুগ সম্পর্কেও অবহিত করেছেন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিজের যুগ ছিল এবং জামাতের ছিল সূচনালগ্ন। প্রারম্ভিক যুগের জলসা কেমন হতো– সে প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসার চিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে কতিপয় ইলহামের কথাও উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে কতক ইলহামকে এই দিনগুলোতে পূর্ণতা লাভ করতে দেখিয়েছেন বা দেখাচ্ছেন। কোন কোন ইলহাম হয়তো ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে বা একবার পূর্ণ হয়েছে কিন্তু আবার পূর্ণতা লাভ করবে।

এখন আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-র কয়েকটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করবো। প্রারম্ভিক জলসা গুলোর একটির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর বাল্যকালের স্মৃতিচারণ এবং জামাতের চিত্র তুলে ধরেন। এটি ১৯৩৬ সনের কথা, প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে যেখানে এখন মাদ্রাসায়ে আহমদীয়ার ছাত্ররা পড়ে সেই স্থানে একটি জীর্ণ প্রাচীর ছিল। একটি প্রাচীর ছিল যা কাদিয়ানের পুরো জনবসতিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল। তিনি বলেন, আমাদের পিতা-পিতামহের যুগে সেটি কাদিয়ানের সুরক্ষা প্রাচীর ছিল যা খুবই প্রশস্ত ছিল, একটি গরুর গাড়ি তাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারতো। এরপর ইংরেজ সরকারের সেটিকে ভেঙ্গে 'নিলাম' করার পর এর কিছু টুকরো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অতিথিশালা নির্মাণের জন্য হস্তগত করেন। তা এক দীর্ঘাকৃতির ভূমিখন্ড ছিল।

তিনি বলেন, আমার মনে নেই সেই সনটি কী ১৮৯৩-৯৪ নাকি ৯৫ ছিল, এমনই সময় হবে, কিন্তু একই মওসুম এবং একই মাস ছিল। কিছু লোক যারা তখনও আহমদী আখ্যায়িত হতো না, কিন্তু একই লক্ষ্য এবং একই উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাদিয়ানে সমবেত হন। তখনও জামাতকে আহমদীয়া জামাত বলা হতো না, আহমদী নাম রাখা হয় ১৯০১ সনে, ইতোপূর্বে রীতিমতো আহমদীয়াতের স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল না। আমি এটি বলতে পারবো না যে, পুরো কার্যক্রম কি সেখানেই পরিচালিত হয়েছে নাকি কার্যক্রমের একটি অংশ সেস্থানে হয়েছে, যে যায়গার কথা বলছেন, আর কিছুটা মসজিদে পরিচালিত হয়েছে; কেননা আমার বয়স তখন ৭/৮ বছর হবে তাই এর খুঁটিনাটি আমার মনে নেই। তখন এই জনসমাগমের গুরুত্ব আমার বোধগম্য ছিল না, কিন্তু এতটা মনে আছে, আমি সমবেত লোকদের চতুষ্পার্শ্বে ছুটে বেড়াতাম, খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতাম। সে যুগের দিক থেকে আমার কাছে পুরো বিষয়টাই আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল যে, সেই দেয়ালে বিছানো একটি মাদুরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপবিষ্ট ছিলেন আর চতুষ্পার্শ্বে বন্ধুরা সমবেত ছিল যারা জলসা সালানায় উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হন।

তিনি বলেন, হতে পারে আমার স্মৃতিভ্রম হবে, মাদুর হয়তো একটি বা দু'টো হবে কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে একটিই মাদুর ছিল যার চতুষ্পার্শ্বে মানুষ একত্রিত বা সমবেত ছিল। তাদের সংখ্যা দেড় বা দুই শত হবে। ছোটদের নিয়ে সেই সংখ্যা হয়তো আড়াইশ' হবে যাদের তালিকা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ছাপিয়েও দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় একটি বা দু'টি মাদুর ছিল কিন্তু জায়গা ততটাই ছিল যতটা এই জলসা অর্থাৎ যে জলসায় তিনি এর উল্লেখ করছেন সেই জলসার স্টেজ বা মঞ্চের মোট জায়গার সমান ছিল (আজকাল অবশ্য আমাদের জলসার মঞ্চ আরও অনেক বড় হয়ে থাকে)। আমি জানি না কেন, কিন্তু এতটা জানি যে, সেই মাদুরের তিনবার স্থান বদল করা হয়েছে। এক জায়গা থেকে উঠিয়ে দ্বিতীয় জায়গায় এরপর তৃতীয় জায়গায়। প্রথমে একস্থানে বিছানো হয়েছে এরপর উঠিয়ে কিছু দূরে দ্বিতীয় জায়গায় বিছানো হয়েছে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে পরিবর্তন করে আরেক জায়গায় বা আরেক স্থানে কিছু দূরে বিছানো হয়েছে। আমার শৈশবের বয়সের নিরিখে এটি বলতে পারবো না যে, সমবেত লোকদেরকে মানুষ বাধা দিত বা বলতো, তোমাদের অধিকার নেই এখানে মাদুর বিছানোর নাকি অন্য কোন কারণ ছিল। যাহোক আমার মনে আছে, দু'তিন বার সেই মাদুরের স্থান বদল করা হয়।

এখন যারা কাদিয়ানে জলসার উদ্দেশ্যে গিয়েছেন বা উপস্থিত আছেন তারা হয়তো তখনকার সময়ের কথা ধারণাই করতে পারবেন না। এখন একটি বৃহৎ জলসা গাহ্ আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এটি চতুর্দিক থেকে পাকা প্রাচীর ঘেরা আর তাতেও সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা প্রদানের চেষ্টা রয়েছে। ১৯৩৬ সনে যখন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একথা বলেছেন, এরপর ব্যবস্থাপনা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে কাদিয়ানে দেশ বিভাগের সময় এমন যুগও আসে যখন দারুল মসীহ্ বা তার চতুষ্পার্শ্বের কয়েকটি ঘর পর্যন্তই আহমদীরা সীমাবদ্ধ ছিল বরং কয়েকশ' ছাড়া সবাইকে হিজরত করতে হয়েছে। গুটি কতক আহমদী যারা ছিল তারাও অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু আজ পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কাদিয়ান বিস্তৃতি লাভ করছে আর সেখানে আগতরা এখন শুধু সেই বিস্তৃতিই দেখতে পাচ্ছে। যেমন প্রথমবার যারা গিয়েছে, নতুন প্রজন্ম বা যুবক শ্রেণী বা যারা বর্হিবিশ্ব থেকে এসেছেন তারা এখন সম্প্রসারিত কাদিয়ানই দেখছেন। ইতিহাসের জানালায় যদি আমরা উঁকি মেরে তাকাই তাহলে খোদার অপার কৃপাবারি আমরা লক্ষ্য করি। রাবওয়ায় বসবাসকারীরাও আজকাল হয়তো উৎকণ্ঠিত হবেন, তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত, পরিস্থিতি সবসময় একরকম থাকে না। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সেখানেও অবস্থায় পরিবর্তন আসবে আর প্রাণচাঞ্চল্যও ফিরে আসবে। কিন্তু রাবওয়াবাসীরদের দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, পাকিস্তানবাসীদের দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(সূরা আলে ইমরান: ১৪০) অর্থাৎ দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না আর দুঃখ ভারাক্রান্তও হবে না। নিশ্চয় তোমরাই জয়যুক্ত হবে। শর্ত হলো, যদি তোমরা মু'মিন হও।

অতএব ঈমান বৃদ্ধি আর দোয়ার ওপর

জোর দেয়াই খোদার কৃপাবারি আকর্ষণ করে অবস্থায় পরিবর্তন আনে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে আরও বলেন, যারা সেখানে সমবেত ছিলেন, যাদেরকে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা হতো তাদের সেখানে আসার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলছেন, ইসলামকে পৃথিবীতে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়া হয়েছে আর সেই একমাত্র আলো যা ছাড়া পৃথিবী আলোকিত হতে পারে না সেটিকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য মানুষ সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে অর্থাৎ ইসলাম এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-

জলসার আগমনকারীদের আমি নসীহত করবো, মানুষের ভিড় এবং কর্মীর স্বল্পতার কারণে যদি কোন কষ্ট হয় তাহলে আপনারা হোঁচট খাবেন না বা চিন্তামগ্ন হবেন না। এই নসীহত সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, এখানে জলসা হোক বা অন্য কোন স্থানে। যাহোক অতিথি সেবা করা সকল অর্থে আতিথেয়তার চেষ্টা করেন কিন্তু এরপরও ত্রুটি থেকে যায়।

এর জ্যোতিকে নির্বাপিত করার অপচেষ্টা চলছে। সেই অন্ধকার ও অমানিশার প্রজন্ম সেটিকে মিটিয়ে দিতে চায়। তিনি বলেন, একশ পঁচিশ বা ত্রিশ কোটি মানুষের বিশ্বে যা সে যুগে পৃথিবীর জনবসতি ছিল, তাদের মাঝে দু'আড়াই শত সাবালক এখানে সমবেত ছিল, যাদের অধিকাংশের পোষাকে দারিদ্রের ছাপ ছিল স্পষ্ট, তাদের মাঝে হয়তো এমন মানুষ কমই হবেন যারা ভারতের বিরাজমান পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্ত আখ্যায়িত হতে পারেন। তারা সমবেত এবং একত্রিত হয়েছেন এই উদ্দেশ্যে এবং এই মানসে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা যা শত্রুরা নমিত করতে চায়, তারা এই পতাকাকে নমিত হতে দিবেন না বরং সেটিকে তারা উন্নত রাখবেন, তারা আত্মবিসর্জন দিবেন কিন্তু সেই পতাকাকে নমিত হতে দিবেন না। এই একশ' পঁচিশ কোটি মানুষের সমুদ্রের সামনে দু'আড়াই শত দুর্বল মানুষ কুরবানীর প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে এসেছেন। এটি ১৮৯৫/৯৬ সালের কথা, তাদের চেহারায় তা-ই লেখা ছিল যা বদরী সাহাবীদের চেহারায় লিপিবদ্ধ ছিল। যেভাবে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এতে সন্দেহ নেই যে, আমরা দুর্বল আর শত্রু শক্তিশালী কিন্তু তারা যতক্ষণ আমাদের লাশকে পদদলিত না করবে ততক্ষণ আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না, তাদের চেহারার সংকল্পে স্পষ্ট ছিল যে, তারা মানুষ নয় বরং জীবন্ত লাশ যারা নিজেদের সত্তার মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সম্মান এবং তাঁর ধর্মের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শেষ সংগ্রামের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। দর্শক তাদের দেখে তিরস্কার করতো, হাসিঠাট্টা করতো আর তারা আশ্চর্য ছিল যে, এরা কি-ইবা করতে পারবে? এদের কিইবা করার শক্তি আছে।

তিনি বলেন, আমি মনে করি তখন একটি বা দু'টো মাদুর ছিল। যাহোক এর জন্য এই স্টেজ বা এই মঞ্চের সমপরিমান জায়গা ছিল। আমি জানি না কেন কিন্তু এতটা জানি, তিনবার সেই মাদুরের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। এরপর ইউসুফের ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইউসুফ যখন মিশরের বাজারে বিক্রি হওয়ার জন্য আসেন তখন এক বৃদ্ধাও দু'টো রুই বা তুলার ছোট গোলক নিয়ে আসেন, হয়তো এগুলোর বিনিময়ে আমি ইউসুফকে ক্রয় করতে পারবো। বস্তুবাদী মানুষ এই ঘটনা শুনে হাসে, আর আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ তা শুনে অশ্রু বিসর্জন দেয় কেননা; তাদের হৃদয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই আবেগ সঞ্চার হয় যে, যেখানে কোন জিনিষের মূল্য থাকে সেখানে মানুষ এই বস্তুজগতের হাসিঠাট্টার ভ্রুক্ষেপ করে না। কিন্তু আমি বলবো, ইউসুফ তো একজন মানুষ ছিলেন আর তখন ইউসুফের যোগ্যতাও প্রকাশ পায়নি কেননা বয়স কম ছিল। এজন্যই তার ভাইয়েরা অতি স্বল্প মূল্যে তাকে বিক্রি করে দেয়। এমতাবস্থায় যদি বৃদ্ধার মাথায় এই ধারণা আসে যে, হয়তো রুইয়ের দু'টো গোলকের পুটলির বিনিময়ে আমি ইউসুফকে ক্রয় করতে পারবো তাহলে এটি অবান্তর বা অবাস্তব কোন কথা নয়।

বিশেষ করে আমরা যদি এ কথাটিকে সামনে রাখি যে, যেই দেশ থেকে এই কাফেলা এসেছিল সেখানে রুই বা তুলা হতো না, তারা মিশর থেকেই রুই আমদানি করতো বা নিয়ে যেত তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, রুইয়ের মূল্য হয়তো তখন অনেক বেশি ছিল আর সেই বৃদ্ধা সত্যিই ভাবতো, রুই দিয়ে ইউসুফকে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু যেই মূল্য নিয়ে তারা একত্রিত হয়েছিলেন এটি অবশ্যই এমনই যৎসামান্য ছিল অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পাশে যে, দু'আড়াই শ' মানুষ সমবেত ছিল, তারা যেই মূল্য নিয়ে একত্রিত হয়েছিলেন তা নিশ্চয় যৎসামান্য ছিল আর ইউসুফকে ক্রয় করার ঘটনা থেকেও মহান ও গভীর প্রেমের দৃষ্টান্ত বৈ-কি। এটি কি? আসলে এটি সেই প্রেম যা মানুষের বিবেকের ওপর পর্দা লেপন করে। সেই বৃদ্ধা ভেবেছিল, ইউসুফকে ক্রয় করার জন্য এই রুই বা তুলাই যথেষ্ট কিন্তু এখানে আরেকটি মূল্যের কথা বলা হচ্ছে যা প্রেমের মূল্য, যা বিবেকের ওপর পর্দা লেপন করে। আর এ প্রেম মানুষকে এমন ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত করে যা কল্পনারও ঊর্ধ্বে। দুই বা আড়াই শত মানুষ যারা সমবেত হয়েছিল তাদের হৃদয় থেকে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে তা খোদার আরশের সামনে ফরিয়াদ করে।

নিঃসন্দেহে তাদের অনেকের পিতামাতা হয়তো জীবিত আছেন বা তারা হয়তো নিজেরাও পিতামাতা বা দাদা হবেন কিন্তু পৃথিবী যখন তাদের হাসিঠাট্টা করে, পৃথিবীর মানুষ যখন তাদেরকে পরিত্যাগ করে, আপনপর সবাই যখন তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয় এবং বলে, যাও হে উন্মাদরা! আমাদের ছেড়ে চলে যাও। আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে

বড়, বয়স্ক, পিতা, দাদা বা যুবক হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তাদেরকে ঘর থেকে বহিস্কার করে, বলে যে, বিতাড়িত হও। এমন মানুষ বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও এতিম হয়ে যায়। এতিম আমরা তাকেই বলি যার কোন উত্তরাধিকারী থাকে না আর যার কোন সাহায্যকারী থাকে না।

অতএব পৃথিবী যখন তাদেরকে বিতাড়িত করলো তখন তারা এতিম হয়ে গেল আর আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এতিমের আহাজারি আরশ্‌কে প্রকম্পিত করে– অনুসারে তারা যখন কাদিয়ানে সমবেত হয় আর সব এতিম সম্মিলিতভাবে আহাজারি করে। সেই আহাজারির ফলে এমন কিছু সৃষ্টি হয়েছে যা তোমরা আজ এই ময়দানে দেখতে পাচ্ছো। অর্থাৎ সেই জলসায় মানুষ একটি প্রশস্ত ময়দানে সমবেত ছিল, তাদের দিকে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ইশারা করছেন। অতএব হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর সামনে উপবিষ্ট কয়েক হাজার মানুষকে বলেছিলেন, সেই দু'আড়াই শ' মানুষের আহাজারির ফসল আজ তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছো অর্থাৎ এই ময়দানে সেই দু'আড়াই শ' মানুষের আহাজারির ফসল তোমরা দেখছো আর সেই ময়দানেই তোমরা বসে আছো।

আজ আমি যেমনটি বলেছি, কাদিয়ানের জলসাগাহ্ আরও বিস্তৃত হয়েছে। আমি জলসায় অংশগ্রহণকারী নর ও নারী যারাই আছেন, তাদেরকে বলবো, এক প্রশস্ত ময়দান যাতে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে, যেখানে এক ভাষার পরিবর্তে, সেই যুগে হয়তো একটি ভাষাতেই সবকিছু বলা হতো যেখানে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, কাদিয়ানে এখন এক ভাষার পরিবর্তে বেশ কয়েকটি ভাষায় আওয়াজ পৌঁছানো হচ্ছে।

এখন আপনারা সেখানে বসে খুতবাও শুনছেন, আর সাত আটটি ভাষায় সবাই অনুবাদও শুনতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষ সেখানে এখন উপস্থিত আছেন। যেখানে পাকিস্তান থেকে আগত অধিকার বঞ্চিত আহমদীরাও বসে আছেন। নিজেদের মাঝে এদের সবার সেই ঈমান এবং নিষ্ঠা সৃষ্টি করা উচিত, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক বন্ধন রচনা করা উচিত, সেই প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়া উচিত যা সেই দু'আড়াই শ' মানুষের মাঝে ছিল যাদের দৃষ্টান্ত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তুলে ধরেছেন।

অনুরূপভাবে এখন অস্ট্রেলিয়ায়ও জলসা হচ্ছে যেমনটি আমি বলেছি আর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলেও জলসা হচ্ছে। সর্বত্র আপনারা যদি এই মানসে সমবেত হয়ে থাকেন যে, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার বাণী আমাদেরই পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে, যেভাবে সেই দু'আড়াই শ' মানুষ আড়াই শ' বীজ বা আটিতে পরিণত হয়েছেন যা ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল আর কাদিয়ানের বিস্তৃতি এবং ময়দান আর সেসব পুণ্যবানের বা পুণ্যাত্মাদের প্রজন্ম, আমেরিকান জামাত ও সেই জামাতের বিস্তৃতি, অস্ট্রেলিয়ার জামাত এবং তাদের যে ক্রম বিস্তারের দৃশ্য আমরা দেখছি, অস্ট্রেলিয়াতেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মাশাআল্লাহ্ নতুন নতুন জায়গা ক্রয় করা হচ্ছে, এসবের সৌন্দর্য যদি আমাদের বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে নিজেদের ঈমানী অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি করতে হবে। নতুবা শুধু জলসার জন্য সমবেত হওয়া যথেষ্ট নয়। যদি এই দু'আড়াই শ' বীজ বা আটি নিজ প্রভাব প্রকাশ করে থাকে তাহলে আজ আমাদের দায়িত্ব হবে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করা। আর যেভাবে খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্। তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল একশ' বিশ-পঁচিশ কোটি, আর আজকে পৃথিবীর জনসংখ্যা সাতশ' কোটির অধিক, বলা হয় সাতশ' ত্রিশ কোটি। অথচ আমাদের সংখ্যা এখনও পৃথিবীর জনবসতির মোকাবিলায় আর সহায়-সম্পদের দিক থেকে খুবই নগণ্য।

কিন্তু আমাদেরও সে কাজই করতে হবে যা আমাদের পিতা পিতামহরা করে গেছেন। অতএব একথা সব আহমদীর সামনে রাখতে হবে, আমাদের লক্ষ্য অতীব মহান যা আমাদের অর্জন করতে হবে। কাদিয়ানে যারা জলসায় অংশগ্রহণ করছেন তাদের বলছি, এই দিনগুলোতে প্রচুর দোয়া করুন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এমন নিদর্শন সহস্র সহস্র রয়েছে আর স্বাক্ষ্যও অগণিত যা স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করে থাকে; হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তাঁর একটি ইলহাম হলো, ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক। ইয়াতূনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমীক। অর্থাৎ দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তোমার কাছে আসবে এবং দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে উপহার আনা হবে। আর আতিথেয়তার অভিনব সব উপকরণ সৃষ্টি করা হবে। আর এত অজস্র ধারায় মানুষ আসবে যে, যে পথে তারা আসবে সে পথে গর্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এটি এক অসাধারণ নিদর্শন।

দেখুন! এই মহান নিদর্শনের সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা কোন যুগে দিয়েছিলেন! সেই অবস্থা যারা দেখেছেন তারা এখনও জীবিত আছেন। তখন অবস্থা কেমন ছিল তা যারা দেখেছেন আর তারা এখনও জীবিত আছেন। তিনি (রা.) বলেন, আমার বয়স কম ছিল কিন্তু সেই দৃশ্য এখনও আমার স্মৃতিতে অম্লান। এখন যেখানে মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে ছিল একটি আস্তাকুড় অর্থাৎ ময়লা আবর্জনার স্তুপ ছিল। মাদ্রাসার জায়গায় দিনের বেলায়ও মানুষ যেতো না আর বলতো, এটি অলক্ষুনে স্থান। প্রধানতঃ কেউ সেখানে যেতো না আর গেলেও একা যেতো না; বরং দু'তিনজন একসাথে যেতো কেননা; তাদের ধারণা ছিল, এখানে গেলে জ্বিন ভর করে। জ্বিন ভর করতো কিনা জানা নেই কিন্তু এটি ছিল বিরান জায়গা আর এমন জনবসতিহীণ জায়গা সম্পর্কেই মানুষ এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, সেখানে গেলে জ্বিন বা ভূত-প্রেত ভর করে।

তিনি (রা.) বলেন, আমার এমন কোন অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু অনেকেই বলে, তখন কাদিয়ানের অবস্থা এমন ছিল যে, দু'তিন রুপির আটাও এখানে পাওয়া যেতো না। এটি ছিল একটি গন্ডগ্রাম গ্রাম আর এখানে ছিল কৃষিজীবি মানুষের বসতি। নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে মানুষ নিজেই গম ভাঙ্গাতো বা আটা বানাতো। তিনি বলেন, আমাদেরও মনে আছে, আমাদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন হতো তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাউকে লাহোর বা অমৃতসর পাঠিয়ে সেখান থেকে তা আনিয়ে নিতেন। মানুষের অবস্থা দেখ! এদিকে কেউ আসতো না। বরযাত্রী হিসেবে কোন অতিথি আসলে হয়তো আসা হতো কিন্তু সচরাচর এখানে কারও আনাগোনা ছিল না। আমার শৈশবের সেই দিনগুলোর কথাও স্মৃতিপটে অম্লান। হুযূর আমাকেও সাথে নিয়ে যেতেন।

আমার মনে আছে, বর্ষাকালের কথা, একটি ছোট গর্তে পানি জমে যায়। আমি লাফ দিয়ে পার হতে পারিনি, তিনি (আ.) নিজেই আমাকে কোলে তুলে পার করেন। এরপর কখনও শেখ হামেদ আলী সাহেব আর কখনও হুযূর নিজেই আমাকে কোলে তুলে পার করতেন। তখন অতিথিও ছিল না আর এ ঘরও ছিল না। কোন প্রকার উন্নতির

লক্ষণও ছিল না। কিন্তু এক অর্থে এটিও উন্নতির যুগ ছিল। সেই যুগে বাহ্যতঃ কোন উন্নতির লক্ষণ ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি একটি উন্নতির যুগ ছিল। কেননা তখন হাফেয হামেদ আলী সাহেব এসে গিয়েছেন। আর এরও পূর্বে যখন কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে কেউ জানতো না তখন আল্লাহ্ তা'লা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমার কাছে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসবে আর দূর-দূরান্ত থেকে তোমার কাছে উপহার পাঠানো হবে। সে সময়কার অবস্থার ধারণা করতে গিয়ে খোদার এই প্রতিশ্রুতির কথা এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে, 'হে সেই ব্যক্তি যাকে তার পাড়ার মানুষও জানতো না, যাঁকে তাঁর শহরের বাইরে অন্য শহরের মানুষ চিনতো না, যাঁর অপরিচিতির কারণে মানুষের এই ধারণাই ছিল যে, মির্যা গোলাম কাদের সাহেবই তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে বলেছেন, "আমি তোমার মত ব্যক্তিকে সম্মান দেব, পৃথিবীতে খ্যাতি দান করব আর সম্মান তোমার কাছে আপনা-আপনিই আসবে।"

এটি প্রণিধানযোগ্য একটি বিষয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিজ কানে শুনেছি; তিনি বলতেন, যদি চিন্তা করা হয় তাহলে বুঝা যাবে, "কাফিরও রহমত হয়ে থাকে। যদি আবু জাহ্‌ল না হতো তাহলে এত বিশাল কুরআন কোত্থেকে নাযিল হতো। যদি সবাই আবু বকরই হতেন তাহলে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ই নাযিল হতো।" এটি থেকে বোঝা যায়, যারা আল্লাহ্‌র হয়ে যায় সবকিছুতে তারা কল্যাণই দেখে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যখন বিরোধিতা হয় তখন তিনি দেখছিলেন যে, এখন আরও অধিক সম্মান লাভ হবে এবং উত্তরোত্তর সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আজ যখন আমরা কাদিয়ানের দৃশ্য দেখি যে, পৃথিবীর বিশ পঁচিশটি দেশের মানুষ এখানে পৌঁছেছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন সেখানে নিত্য-নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে।

এরপর জলসা সালানার আতিথেয়তার প্রেক্ষাপটে একটি ইলহামের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে, শেষ জলসার মোট উপস্থিতি ছিল সাতশ', অথচ এখন এক একটি ব্লকে কয়েক হাজার মানুষ উপবিষ্ট আছে, জলসার সময় কয়েক হাজার মানুষ প্রতিটি ব্লকেই বসে আছেন, কিন্তু তখন মোট সংখ্যা ছিল সাতশ'। সেটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের শেষ বছর ছিল। মোট সাতশ' মানুষ জলসায় আসে আর তাতেই ব্যবস্থাপনা এতটা ভেঙ্গে পড়ে। মোট সাতশ' অতিথি আর এর ফলেই ব্যবস্থাপনা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। রাত তিনটা পর্যন্ত মানুষ খাবার পায়নি। আর তাঁর (আ.) প্রতি ইলহাম হয়, 'ইয়া আইয়্যুহান নবী আতএমুল জায়েআ ওয়াল মু'তার'। অর্থাৎ হে নবী! ক্ষুধার্ত এবং যাদের অবস্থা শোচনীয় তাদের খাবার খাওয়াও। সকালে জানা যায়, রাতের তিনটা পর্যন্ত মানুষ লঙ্গর খানার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু তারা খাবার পায়নি। এরপর নতুনভাবে তিনি (আ.) বলেন, এখন খাবার রান্না কর এবং তাদের খাবার খাওয়াও।

দেখ! সাতশ' মানুষের উপস্থিতির কারণে অবস্থা এপর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু সেই সাতশ' মানুষের যে অবস্থা ছিল তাহলো, তিনি যখন ভ্রমণের জন্য বের হতেন তখন সাতশ' মানুষও তাঁর ভ্রমন সঙ্গী হতো, ব্যাপক ভিড় ছিল। বাহির থেকে আগত লোকেরা এ দৃশ্য কখনও দেখেনি। বাইরে দুইশ' মানুষকেও কোন আধ্যাত্মিক নেতার চতুষ্পার্শ্বে একত্রিত হতে দেখা যেতো না, মেলায় হয়তো এমনটি হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাদিতে এমনটি তা দেখা যায় না। তাই তাদের জন্য এটি ছিল বিস্ময়কর বিষয়। মানুষ ধাক্কা খাচ্ছিল। হুযূর এক পা উঠালে হোঁচট খেয়ে তার পা থেকে জুতা খুলে যেতো। মানুষের ব্যাপক ভিড় ছিল। এরপর কোন আহমদী তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলতো, হুযূর জুতা পরে নিন এবং তাঁর (আ.) পায়ে জুতা পরিয়ে দিতো। এরপর আবার তিনি পা উঠালে কারও পা লেগে জুতা খুলে যেতো আবার কেউ বলতো, হুযূর! একটু দাঁড়ান জুতা পরিয়ে দেই। ভ্রমণের সময় এই দৃশ্যের অবতারণা হতো। একজন নিষ্ঠাবান আহমদী জমিদার বন্ধু দ্বিতীয় জমিদার ব্যক্তিকে যিনি নিজেও আহমদী ছিলেন পাঞ্জাবীতে বলেন, 'ও তু মসীহ্ মাওউদ দা দাস্ত পানজা লে লেয়া?' অর্থাৎ, তুমি কি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করমর্দন করেছো? অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কি করমর্দন করেছো? তিনি বলেন, এখানে করমর্দনের সুযোগ কোথায়? কেউ কাছেই ঘেষতে দেয় না, মানুষের ভিড় এমন যে, কেউ কাছেই আসতে দিচ্ছে না। মুসাফাহ্‌র সুযোগ পাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, তখন যে প্রেমিক জমিদার ছিলেন তিনি দেখে বলেন, এই সুযোগ তুমি আর কোথায় পাবে? তোমার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও মানুষের ভিড় চিরে যাও আর মুসাফাহ্ করে আস।

তিনি বলেন, কোথায় সেই সময় যা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি আর কোথায় আজকের চিত্র যা আবার আমরা নিজের চোখে দেখছি যে, সহস্র সহস্র মানুষ। এক সময় সাতশ' মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়েছেন, মুসাফাহ্ বা করমর্দন করা কঠিন ছিল বা কঠিন মনে করা হত কিন্তু আজ খোদা তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার সমর্থনের দৃশ্য দেখুন! বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সহস্র সহস্র মানুষ কাদিয়ানে সমবেত হয়েছেন, তাদের নিজ নিজ রুচি অনুসারে খাবারও রান্না করা হচ্ছে, আতিথেয়তাও হচ্ছে আর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জলসাতেও এমনটিই হচ্ছে।

এছাড়া এই জলসার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- একথাও বলেছেন, "কাজ অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে, জামাত অনেক বড় হয়ে গেছে, মনে হয় আমাদের কাজ এখন শেষ।" হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের অন্তিম বছর কাদিয়ানে জলসা সালানায় সমবেত লোকদের কথা আমার মনে আছে যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন বার বার বলতেন, "আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে-ই কাজের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই কাজ সাধিত হয়েছে। এখন জামাত এত বড় হয়ে গেছে আর এত বেশি মানুষ ঈমান এনেছে যে, আমরা মনে করি আমাদের এ পৃথিবীতে আসার যে উদ্দেশ্য ছিল সেটি পূর্ণতা লাভ করেছে।"

এখন দেখুন! কোথায় সেদিন যখন জলসা সালানায় এমাত্রার ভিড়কে এক অনেক বড় ভিড় মনে করা হয় আর অপরদিকে আজকের অবস্থা দেখুন! লাহোর শহরে আমাদের একটি মসজিদের জুমুআতেই প্রায় সমসংখ্যক মানুষ সমবেত হয়। এখন তো সহস্র সহস্র মানুষ মসজিদে একত্রিত হয়। এখানে লন্ডনেই সহস্র সহস্র মানুষ এখন বসে আছে, জুমুআর জন্য। আমি পূর্বেও একবার বলেছি, এটি খোদা তা'লার সাহায্য এবং তাঁর সমর্থনের এক অসাধারণ নিদর্শন আর যেসব জামাতের সাথে তাঁর সমর্থন এবং সাহায্য থাকে তারা

এভাবেই উন্নতি করে আর শত্রুর দৃষ্টিতে কাটার মতো বিঁধে, শত্রু নগ্নভাবে শত্রুতা আরম্ভ করে এবং তার হিংসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু খোদা তা'লার নিয়তি অবশ্যই পূর্ণ হয়, শত্রুর বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা নিজ জামাতকে উত্তরোত্তর উন্নতি দেন এবং পৃথিবীতে ক্রমাগতভাবে জামাত উন্নতি করতে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়টি আমাদের জন্য অনেক বড় আনন্দের কারণ কিন্তু একইসাথে আমাদের দায়িত্বের প্রতিও এটি মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেসব লক্ষ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার জন্য আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি।

এরপর দেখুন! কেবল পাকভারত উপমহাদেশেই নয় বরং আজ পৃথিবীর দু'শতাধিক দেশে জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে, উন্নতি করে চলেছে। হিংসুকের হিংসাও একইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে পাকিস্তান বা ভারতে শত্রুতা হত, ইন্দোনেশিয়ার প্রেক্ষাপটে শত্রুতার কথা শুনেছিলাম, দু'দিন পূর্বে কিরগিস্তানেও আমাদের এক স্থানীয় কিরগিজ আহমদীকে শহীদ করা হয়, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ইনশাআল্লাহ্ আজ তার নামাযে জানাযাও আমি পড়াব।

একইভাবে আজকে কিছুক্ষণ পূর্বেই বাংলাদেশের একটি শহরে জুমুআ হচ্ছিল, জুমআর নামাযের সময়ে আমাদের মসজিদেও বোমা বিস্ফোরণ হয়, খুব সম্ভব আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল। যাহোক কয়েকজন আহমদী আহত হয়েছেন, পুরো রিপোর্ট পরে আসবে। আল্লাহ্ তা'লা আহতদের নিরাপদ রাখুন, এটি যেন প্রাণহারী না হয়। আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের আরোগ্য দান করুন। যাহোক, এই হিংসা এবং বিরোধিতা আহমদীয়াতের উন্নতি দেখে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এটি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু একই সাথে খোদার নিয়তি যে সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্। জামাত উন্নতি করছে আর ইনশাআল্লাহ্ করে যাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে যার অর্থ একাধিক , আমরা এর কোন একটি বিশেষ অর্থ করতে পারি না। আমরা জানি না এটি কখন কীভাবে পূর্ণ হবে আর সেই ইলহাম হলো "লঙ্গর উঠা দো" এই লঙ্গর বলতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, যদি নৌকার সাথে সম্পৃক্ত লঙর বা নোঙর বুঝানো হয় অর্থাৎ পানিতে নৌকা বা জাহাজকে নোঙ্গর করার জন্য যা ব্যবহার করা হয় যদি সেই নোঙ্গর বোঝায় তাহলে অর্থ হবে, হবে বের হও আর আল্লাহ্‌র বাণী সর্বত্র প্রচার কর আর লঙ্গর বলতে যদি বাহ্যিক লঙ্গরখানা বা অতিথিশালা করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে,আগমনকারীদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, এখন লঙ্গরখানার আর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তাই লঙ্গর প্রত্যাহার কর, মানুষকে বল, তারা নিজেরা যেন নিজেদের খাদ্যের এবং আবাসনের ব্যবস্থা করে। এই উভয় অর্থের কোন একটি আমরা স্থির করতে পারি না বা নির্ধারণ করতে পারি না আর সময়ও নির্ধারণ করতে পারি না যে, এটি কোন সময় হবে। যাহোক যতদিন অতিথিদের আতিথেয়তা মানুষের জন্য সম্ভবপর ততদিন নির্দেশ হল "ওয়াস্‌সে মাকানাকা" তুমি তোমার গৃহ সম্প্রসারিত কর। আর অতিথিদের জন্য জায়গা কর। অতএব এরজন্য অন্ততঃপক্ষে কাদিয়ানে বা যে যে স্থানে জামাতের জন্য সম্ভব তাদের অতিথিদের আবাসনের স্থায়ী এবং অস্থায়ী ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম "ওয়াস্‌সে মাকানাকা"র অধীনে আবাসনের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও কাদিয়ানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ব্যাপকতা আসছে, নতুন নতুন অতিথিশালা হচ্ছে এবং জায়গা প্রস্তুত রয়েছে, অতিথিদের যথাসাধ্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করা হয়। যাহোক ঘরের সুযোগ-সুবিধা দেয়াতো সম্ভব নয় তাই অতিথিদেরও এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, যতটা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে এর ভেতর থেকেই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে জলসায় আসার যে মূল উদ্দেশ্য আছে তা লাভের চেষ্টা করুন আর শুধুমাত্র আতিথেয়তা বা আবাসনের সুযোগ-সুবিধার দিকে চেয়ে থাকবেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আরো একটি ইলহাম এবং ইচ্ছার কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন যে, জামাতের সেসব বন্ধু যাদের জন্য জলসায় আসা সম্ভব তাদের একত্রিত হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র শোনার এবং শোনানোর জন্য যেন একত্রিত হন, যার ব্যবস্থা এদিনগুলোতে এখানে নেয়া হয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশে যাতায়াত বা পরিবহন ব্যবস্থা এতটা উন্নত নয় যতটা ইউরোপে সহজসাধ্য। ভারতের বাহিরে অনেক দেশে এসব উপকরণে আরো অধিক অপ্রতুলতা রয়েছে, যেমন আফগানিস্তান, ইরান বা ভারতের বাহিরে যেসব দ্বীপ আছে সেখানে। সে যুগের নিরিখে বলেছেন, আমাদের জামাতে এখনও এমন মানুষ যোগ দেয়নি যারা সম্পদশালী, যারা দূর-দূরান্তের দেশ থেকে যখন বিমান চলাচল সফরকে অনেক সহজসাধ্য করে তুলেছে, জলসা সালানার সময় কাদিয়ানে আসতে পারে।

এখনও অনেক সম্পদশালী নেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অনেক স্বচ্ছল মানুষ জামাতে যোগ দিচ্ছেন। উল্লিখিত যুগের কথা বলতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, যদি এমন মানুষ আমাদের জামাতে যোগ দেন তাহলে দূর-দূরান্তের মানুষের জন্য এখানে পৌঁছা কঠিন কিছু নয়, যেখানে সর্বপ্রকার ভ্রমন মাধ্যম সহজলভ্য; তাদের সর্বোচ্চ টাকা পয়সার প্রশ্ন থেকে যায়; কিন্তু এমন মানুষ আমাদের জামাতে এখনও অনেক কম বা সত্যিকার অর্থে আদৌ নেই। আজ আমরা দৃষ্টিপাত করলে দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে মানুষ কাদিয়ান যায়। তিনি বলেন, আমাদের জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী এখনও ভারতেই সীমাবদ্ধ আর এখনও পাক-ভারতেই তাদের বসবাস। তাদের বেশিরভাগ পুরুষ যারা বার্ষিক জলসার সময় কাদিয়ান যান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে অগণিত মানুষ এমনও আছে যারা উন্নতি আরম্ভ হলে ঔদাসিন্য এবং আলস্য প্রদর্শন করে, আসল ভাবার বিষয় এটিই। তারা মনে করে, জামাত অনেক বড় হয়ে গেছে। এমন লোকদেরকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার জন্য জলসা সালানার সময় কাদিয়ান যাওয়া সম্ভব, যদি এখানে আসতে সে আলস্য দেখায় তাহলে এর আবশ্যকীয় প্রভাব পড়বে তার প্রতিবেশীর ওপর ও সন্তান-সন্ততির ওপর।

আমি দেখেছি যারা বছরে একবারও বার্ষিক জলসা সময় কাদিয়ান আসে, পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে আসে, তাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদিও সেসব শিশু-কিশোর আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত থাকে না কিন্তু পিতামাতাকে তারা অবশ্যই বলে, আব্বা আমাদেরকে কাদিয়ান ভ্রমণের জন্য নিয়ে চল, এভাবে শৈশবেই তাদের হৃদয়ে আহমদীয়াত দৃঢ়তার সাথে গ্রথিত হয়, অবশেষে বড় হয়ে আহমদীয়াতের অসাধারণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরার সামর্থ অর্জন করে। এছাড়া বাচ্চাদের মন-

মস্তিষ্কের বা মন- মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ষিক জলসার জনসমাবেশ অসাধারণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিশুরা অভিনব বিষয় ও জনসমাবেশের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। বার্ষিক জলসা এসে শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই দেখে না বরং তার প্রকৃতির নতুনত্বের সন্ধানের দৃষ্টিকোণ থেকেও সে উপভোগ করে আর তার জন্য এটি আকর্ষণীয় এবং স্মরণীয় দৃশ্য হয়ে যায়। যারা কাদিয়ান যেতে পারে, যাদের সাধ্য-সামর্থ আছে তাদের যাওয়া উচিত, তবে, দেশীয় জলসায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিত।

তিনি বলেন, যে পিতা জলসায় আসেন তারা তাদের সন্তানদের হৃদয়ে এখানে আসার প্রেরণা সঞ্চার করেন আর অনেক সময় সন্তানের পীড়াপীড়ি বাচ্চাকে জলসা সালানায় নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। এরপর সেই দ্বিতীয় পদক্ষেপ উঠে যার কথা আমি উল্লেখ করেছি। অতএব এ দিনগুলোতে এমন কোন কারণে কাদিয়ান যাওয়াকে উপেক্ষা করা যা বাদ দিলেও চলে, এটি শুধু একটি নির্দেশের অবাধ্যতাই নয় বরং সন্তান-সন্ততির ওপরও যুলুম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে নির্দেশ রয়েছে জলসায় আস, শুধু এরই অবাধ্যতা করছে না বরং সন্তান-সন্ততির ওপরও মানুষ যুলুম করছে। ভারতের আহমদীদেরকে কাদিয়ান যাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

তিনি বলেন, সত্য কথা হলো, আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের জামাতে এখনও সম্পদশালী মানুষ যোগদান করেনি। একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্বল্প সময়ে যাওয়ার যাতায়াতের যে ভ্রমন মাধ্যম রয়েছে তা এত ব্যয় বহুল যে, বহির্বিশ্বের আহমদীদের জন্য এ দিনগুলোতে কাদিয়ান পৌঁছা কঠিন কিন্তু যদি কোন যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বড় বড় সম্পদশালী মানুষ আমাদের জামাতে যোগ দেয় বা সফরের যে ব্যয়ভার আছে তা যদি কমে যায়, সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা হস্তগত হয় তাহলে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকে মানুষ এ সময়ে আসবে। আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বা বিদেশ থেকে মানুষের কাদিয়ান আসার বিষয়টি বড়ই কঠিন মনে হতো, কিন্তু আজকে আমরা এ প্রেক্ষাপটে দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লা কত বড় অনুগ্রহ করেছেন।

যাহোক তিনি বলেন, কোন সময় আমেরিকায় যদি আমাদের সম্পদশালী মানুষ থাকে তারা যাতায়াতের জন্য টাকা খরচ করতে পারেন তাহলে হজ্জ ছাড়াও তাদের জন্য আবশ্যক হবে, তারা যেন জীবনে দু'একবার কাদিয়ানের জলসা সালানায় আসেন। আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়, নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীরা হজ্জে যায় না, এর পরিবর্তে কাদিয়ান চলে যায়। তিনি বলেন, হজ্জের পর, যাদের সামর্থ আছে তারা প্রথমে হজ্জে যাবে, এছাড়া কাদিয়ান যাওয়ারও চেষ্টা করা উচিত কেননা; কাদিয়ানে জ্ঞানের কল্যাণে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং কেন্দ্রের আশিস বা যে বরকত আছে তাতে মানুষ আশিস মন্ডিত হয়। যদিও সেখানে এখন খিলাফত নেই কিন্তু সেই জায়গার এক আধ্যাত্মিক আবেদন রয়েছে, সেখানে গেলেই এটি অনুভূত হয়।

তিনি বলেন, আমি এই বিশ্বাস রাখি, একদিন আসবে যখন দূর-দূরান্তের মানুষ এখানে আসবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্ন রয়েছে, তিনি দেখেছেন, তিনি বায়ুমন্ডলে সন্তরনরত আর বলছেন, ঈসা তো পানিতে হাঁটতেন আর আমি বাতাসে সাঁতার কাটছি আর আমার খোদার কৃপা তার তুলনায় আমার ওপর বেশি, এই স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। এই স্বপ্নের অধীনে আমি মনে করি, সে যুগ অচিরেই আসবে, যেভাবে কাদিয়ানের জলসায় টমটম গাড়ি চলার কারণে রাস্তা ক্ষয় হয়ে যেতো আর গাড়ি চলাচলে রাস্তা গর্তবহুল হয়ে যেতো অনুরূপভাবে ট্রেন মানুষকে টেনে কাদিয়ান আনে, একইভাবে কোন যুগে জলসার দিনগুলোতে কিছুদিন পর পর এই সংবাদও আসবে যে, এখনই অমুক দেশ থেকে এতটি উড়োজাহাজ এসেছে। এ কথাগুলো জগদ্বাসীর দৃষ্টিতে অভিনব মনে হলেও খোদার দৃষ্টিতে নয়। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এখন এই দৃশ্য আমরা অহরহ দেখছি।

আমি বলেছি, পৃথিবীর ২০/২৫টি দেশের মানুষ উড়োজাহাজের মাধ্যমে কাদিয়ান এসেছেন আর কিছু এমন দেশের মানুষ, স্থানীয় মানুষ পূর্বে যাদের কথা ভাবাও যেত না যে, তারা সেখানে আসবেন। আর এটিও অসম্ভব নয় যে, কোন সময় হয়ত চার্টার ফ্লাইট চলবে, কাদিয়ানের জলসায় যোগদানের জন্য মানুষ চার্টার ফ্লাইটে আসবে। তিনি বলেন, এটি খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত, তিনি তাঁর ধর্মের জন্য মক্কা-মদীনার পর কাদিয়ানকে কেন্দ্র বানাতে চান। মক্কা ও মদীনা সেই দু'টো স্থান, যেই স্থানের সাথে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার সম্পর্ক আছে, তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মনিব ও অভিভাবক।

এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কাদিয়ানের ওপর এ দু'টি স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কিন্তু মক্কা এবং মদীনার পর যেই স্থানকে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর হিদায়াতের কেন্দ্র আখ্যা দিয়েছেন সেটি তাই যা মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি-প্রতিচ্ছায়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আপন নিবাস আর যা এখন ধর্ম-প্রচারের একমাত্র কেন্দ্র। আমাকে আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, আজকাল মক্কা এবং মদীনা যা কোন সময় বরকতমন্ডিত স্থান হওয়ার পাশাপাশি তবলীগেরও কেন্দ্র ছিল, আজকে সেখানকার মানুষ এই দায়িত্ব ভুলে বসেছে কিন্তু এই অবস্থা সবসময় বিরাজ করবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা এসব অঞ্চলে অর্থাৎ আরব দেশসমূহে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা করলে তখন এই পবিত্র স্থান অর্থাৎ মক্কা এবং মদীনাও তাদের প্রকৃত সম্মান ফিরে পাবে, প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পাবে।

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি নসীহত খুবই প্রণিধানযোগ্য। মানুষ কাদিয়ানে বসে শুনছেন, পৃথিবীর অন্যত্রও শুনতে পাচ্ছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, খোদার এই কৃতজ্ঞতার পর সব বন্ধু যারা এখানে সমবেত আছেন তাদের নসীহত করছি, প্রত্যেক সেই বিষয় বা বস্তু যা আনন্দের কারণ তার সাথে কষ্টও সহাবস্থান করে, ফুলের সাথে কাঁটাও থাকে, অনুরূপভাবে উন্নতির সাথে হিংসা এবং বিদ্বেষ আর সম্মান ও উন্নতির সাথে অবনতিও থেকে থাকে। এক কথায় যে বস্তু ভাল এবং উন্নত মানের হয়ে থাকে তা হস্তগত করার পথে কিছু বিরোধী শক্তিও বাধ সাধে, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। আসল কথা হলো, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতার যোগ্যতাই রাখে না যতক্ষণ সে সমস্যা এবং কষ্ট সহ্য না করবে। এ কারণেই নবীদের জামাতকে কিছু না কিছু কষ্ট সহ্য করতে হয়। কোন সময় এমন পরীক্ষা তাদের ওপর আসে যে, দুর্বল এবং অপরিপক্ক ঈমানের মানুষ মুরতাদ হয়ে যায় আর কোন কোন সময় মানুষ ছোট ছোট কষ্টের সম্মুখীন হয়ে থাকে; কিন্তু কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ এর ফলেও হোঁচট খায়।

তিনি বলেন, আমার মনে আছে, পূর্বেও একবার আমি একথা উল্লেখ করেছি, কাদিয়ানে একবার পেশাওয়ার থেকে একজন অতিথি এসেছিলেন, সে যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মাগরিবের নামাযের পর

মসজিদে বসতেন, অতিথিরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করত আর যেমনটি আমি বলেছি, নবীদের সাথে তাদের অনুসারীদের গভীর ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সম্পর্ক থাকে। নবীদের দেখে আর কিছুই তাদের চোখে পড়ে না, তারা অন্য কোন বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। যেভাবে আমাদের মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, জলসার দিনগুলোতে একবার যখন হযরত সাহেব বাইরে আসেন তার চতুষ্পার্শ্বে বহু মানুষ সমবেত হয়, ভিড় জমে যায়, সেই ভিড়ে এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করমর্দন করে আর সেখান থেকে বের হয়ে সাথীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি মোসাফাহ্ করেছো বা করমর্দন করেছো? এর কথা পূর্বেই এসে গেছে। সেই ব্যক্তি বলে, এত ভিড়ে সুযোগ পাওয়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে? তিনি বলেন, যেভাবে পার করমর্দন কর, তোমার শরীরের প্রতিটি হাড়গোড়ও যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, মোসাফাহ্ কর, এই সুযোগ প্রতিদিন আসে না, সেই ব্যক্তি যায় এবং করমর্দন করে আসে। এক কথায় নবীকে দেখে মানুষের হৃদয়ে একপ্রকার গভীর আবেগ ও উচ্ছাসের সৃষ্টি হয় আর এই আবেগ এত ব্যাপক হয়ে থাকে যে, নবীর সেবকদেরকে দেখেও অনেক সময় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন নামাযের পর মসজিদে আসন গ্রহণ করতেন তখন মানুষ তাঁর সবচেয়ে কাছে বসার জন্য ছুটে আসত, যদিও তখন মানুষের সংখ্যা কমই ছিল। তা সত্ত্বেও সবাই এটিই চাইতো যে, আমি হুযূরের সবচেয়ে কাছে বসব। এক ব্যক্তির ভাগ্যে বা অদৃষ্টে যেহেতু পরীক্ষা ছিল তাই সে একথা বুঝে উঠতে পারেনি যে, আমি কার বৈঠকে এসেছি, এই ব্যক্তি পেশোয়ার থেকে এসেছিল। সে এসে সুন্নত পড়া আরম্ভ করে, এত দীর্ঘ সুন্নত পড়ে যে, প্রথমে কিছুক্ষণ মানুষ তার অপেক্ষা করতে থাকে কিন্তু অপেক্ষমানরা যখন দেখলো, অন্যরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর সবচেয়ে নিকটের স্থান দখল হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও দ্রুত এগিয়ে এসে হুযূরের কাছে গিয়ে বসে পড়ে কিন্তু দ্রুত গতিতে আসার কারণে কারো কুনুই তার গায়ে লাগে যে সুন্নত পড়ছিল, এতে সে খুব ক্ষেপে যায় এবং বলতে আরম্ভ করে, অদ্ভুত নবী এবং মসীহ্ মাওউদ বটে যার বৈঠকে যারা নামাযীদের এভাবে কুনুই মারা হয় । এই সামান্য বিষয়ের কারণে মুরতাদ হয়ে সে সেখানে থেকে চলে যায়। এক কথায় যে বিষয় ঈমানের উন্নতির কারণ হতে পারে তা তার জন্য পতন ডেকে আনে আর তার দৃষ্টান্ত সেই জামাতের উপমার ন্যায় যে জামাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সত্যিকার আলো আসলে সেই জামাতের জ্যোতি বা আলো হারিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কাদিয়ান আগমনকারীদের এবং জলসায় আগমনকারীদের আমি নসীহত করবো, মানুষের ভিড় এবং কর্মীর স্বল্পতার কারণে যদি কোন কষ্ট হয় তাহলে আপনারা হোঁচট খাবেন না বা চিন্তামগ্ন হবেন না। এই নসীহত সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, এখানে জলসা হোক বা অন্য কোন স্থানে। যাহোক অতিথি সেবা করা সকল অর্থে আতিথেয়তার চেষ্টা করেন কিন্তু এরপরও ত্রুটি থেকে যায়। আমি যেমনটি বলেছি, আজও কাদিয়ানে আগমনকারী বা যেখানেই কেউ জলসায় যায়, স্মরণ রাখবেন, ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কষ্ট হলেও সানন্দে সহ্য করুন, সেটি যেন ঈমানের দৃষ্টিকোন থেকে আপনার জন্য স্খলন ডেকে না আনে। কাদিয়ানের এবং অন্যান্য জলসায় অংশগ্রহণকারীরা যেন খোদার কৃপা এবং আশিসের মাঝে সময় অতিবাহিত করে আর প্রতিটি জলসা যেন খোদার ফযল এবং আশিসবারি নিয়ে আসে আর অংশগ্রহণকারী সকলেই যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হয় আর নিজেরাও এদিনগুলো যেন দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করে।

আর আমি যেভাবে বলেছি, রাশিয়ার কিরগিস্তানে আমাদের একজন আহমদীকে শহীদ করা হয় যার নাম হলো ইউনুস আব্দুল জলিলোফ, ২২শে ডিসেম্বর ৮-৫০ মিনিটে কিরগিস্তানের পূর্বে অবস্থিত গ্রাম কাশগারকিস্তাকে দু'ব্যক্তি তার ওপর গুলি বর্ষণ করে ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাঁর ঘরের বাইরে ইউনুস সাহেব এক প্রতিবেশীর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন, গাড়ীতে দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মানুষ আসে ইউনুস সাহেবকে লক্ষ করে ১২টি ফায়ার করে, সাতটি বুলেট শরীর ভেদ করে বেরিয়ে যায়, আর দু'টো বুলেট শরীরের ভেতরেই থেকে যায়, আক্রমণকারীরা ইউনুস সাহেবের সাথে দাঁড়ানো প্রতিবেশীকে কিছুই বলেনি শুধু ইউনুস সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। যাহোক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তার পিতা এবং ভাই অ-আহমদী। তার আত্মীয়স্বজন কোন পরিচিত মৌলভী দ্বারা জানাযা পড়িয়েছে। তখন পর্যন্ত আহমদীরা সেখানে পৌঁছতে পারেনি, যাহোক মৌলভী কোন ভদ্র মানুষ ছিল, সে একথাও বলেছে যে, এই মৃত্যু খুবই হৃদয় বিদারক। আমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার বান্দা আর এভাবে আল্লাহ্‌র কোন বান্দাকে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। পরে আহমদীরা সেখানে পৌঁছে এবং তার ঘরেই আহমদীরা গায়েবানা জানাযা পড়ে। আশঙ্কা ছিল, আহমদী হওয়ার কারণে মৌলভীরা হৈ চৈ করবে, কিছুটা হলেও বিরোধিতা ছিল কিরগিস্তানে, আশঙ্কা ছিল দাফন করতে দিবে না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে দাফনের কাজও সমাপ্ত হয়েছে। সেখানকার অপরাধ তদন্তকারী বিভাগ বা পুলিশের কর্মীরা আসে এবং জামাতের কোন কোন সদস্যকে তাদের অফিসে নিয়ে যায়, তাদেরকে পুরো তথ্য সরবারহ করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এটি শুনে তারা আশ্চর্য হয়, আমরা তো আপনাদের সম্পর্কে ভিন্ন কিছু শুনে রেখেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দেন, যা কিছু করা সম্ভব হয় এই সত্যকে সামনে আনার জন্য আমরা করব, পুলিশ চেষ্টাও করেছে আর দুই হত্যাকারীকে তারা কিছুক্ষণ পর গ্রেফতারও করেছে। আর যে বিষয় সামনে এসেছে তাহলো, সিরিয়ার লোকদের সাথেই তাদের যোগসূত্র। তারা বলেছে, আমাদের এক ব্যক্তি যে এখান থেকে সিরিয়া গিয়েছিল সে ফিরে এসেছে এবং বলেছে চার ব্যক্তি, অর্থাৎ চারজন আহমদীকে হত্যা করতে হবে। প্রথমে একজন আহমদীকে ছুরিকাঘাত করা হয়, রড দিয়ে পিটানো হয়, তার হাড় ভেঙ্গেছে, আহত হন, মৃতপ্রায় ফেলে চলে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেছেন। দু'তিন মাস বা ছয় মাস পূর্বের কথা এটি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্য দান করেছেন, এখন তিনি ভালো আছেন। কিন্তু এখানে এরা তাকে শহীদ করতে সফল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

যাহোক পুলিশ গ্রেফতারের চেষ্টা করছে। এদের সবাই সমুচিত শাস্তি পাবে আল্লাহ্‌র কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। স্থানীয় আহমদীদের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তারা লিখে পাঠিয়েছেন, ইউনুস সাহেবের এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে কাশগার জামাত

দুঃখে ভারাক্রান্ত কিন্তু তারা লিখেছেন, আমরা কোন কিছুকে ভয় করি না, এই শাহাদাতের পরও আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী বা আগত মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বাণীর প্রচার কাজ অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তারা ঈমানের দিক থেকে খুবই দৃঢ়। ইউনুস সাহেব আব্দুল জলীলোফ ১৯৭৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, ২০০৮ সনে তিনি বয়আত করেন।

তিনি এদেশের প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতা হয় কিন্তু তিনি আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বয়আতের পর তার জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আসে। সব সময় ধর্মীয় জ্ঞানের সন্ধানে রত থাকতেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুবাল্লিগদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখতেন। যখনই ধর্মের নতুন কোন কথা শিখার সুযোগ পেতেন খুবই আনন্দিত হতেন। পাঁচ বেলার নামায বাজামাত পড়তেন। শাহাদতের সময়ও নিজ জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্বপালন করছিলেন। জামাতের খুবই সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। তিনি শোকসন্তপ্ত পরীবারের সদস্য হিসেবে স্ত্রী, তিন কন্যা এবং একজন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। বড় মেয়ের বয়স ৯ বছর, দ্বিতীয় মেয়ের বয়স ৬ বছর, তৃতীয় মেয়ের বয়স ৩ বছর আর সবচেয়ে ছোট ছেলের বয়স মাত্র ৩ মাস।

আমাদের এমন একজন মুবাল্লিগ যিনি সেখানে কাজ করেছেন; তিনি লিখেন, ইউনুস সাহেব তার পরিবারে একমাত্র আহমদী ছিলেন, পরে তার স্ত্রীও বয়আত করেছেন। সর্বজনপ্রিয় এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, সব সময় মুখে হাসি লেগে থাকত, প্রশস্তচিত্ত এবং মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ধর্ম শিখা এবং তবলীগের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। নামায পড়তেন বিগলিত চিত্তে। স্থানীয় জামাতের উন্নতি নিয়ে সব সময় চিন্তিত থাকতেন আর এজন্য অনেক দোয়াও করতেন। জামাতের প্রতিনিধি এবং মুবাল্লিগদের সাথে গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মানের আচরণ করতেন। সবার সাথে গভীর ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। আইনি জটিলতার কারণে সেখান কোন কোন মুবাল্লিগকে ফিরে যেতে হলে তিনি খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন, মুবাল্লিগ চলে যাচ্ছে। রাশিয়ার মাটিতে (পূর্বে রাশিয়া ছিল এখন কিরগিযিস্তান) ইসলাম এবং আহমদীয়াতের খাতিরে রক্তের নযরানা পেশকারী প্রথম আহমদী শহীদ।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার রক্তের প্রতিটি বিন্দু অগণিত পুণ্য প্রকৃতির এবং নেক প্রকৃতির মানুষকে জামাতভুক্ত করার কারণ হোক।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির হাফেয এবং নাসের হোন এবং তাদেরকে ঈমান এবং বিশ্বাসে উত্তরোত্তর উন্নতি দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

যুগ খলীফার খুতবা শুনুন

নিজেকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন

প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে জুমআর খুতবা শোনার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিন। একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ তা'য়ালাই প্রবর্তন করেছেন, এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যায়। এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। অতএব এই বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিন। যদি আমরা এটিই না জানি যে, কি বলা হচ্ছে, তাহলে আনুগত্য কি করে হবে?

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের তরবীয়তের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছেন এর থেকে যেন আমরা পরিপূর্ণরূপে লাভবান হই। আর শুধুমাত্র তরবীয়তই নয় বরং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রেও এটি (MTA) অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদি কোন কারণে লাইভ বা সরাসরি খুতবা শোনা না হয় তাহলে রেকর্ডিং শুনতে পারেন। ইন্টারনেটেও খুতবাগুলো রয়েছে। অতএব আপনাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত এবং প্রত্যেকেরই এই বিষয়টি প্রয়োজন রয়েছে অর্থাৎ এম টি এ-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলুন যাতে আপনারা এই ঐক্যের এবং একতার অংশে পরিণত হতে পারেন।

৯ই অক্টোবর ২০১৫, জুমুআর খুতবা।

mta বাংলা

visit ▶ mtabangla.tv

please Subscribe ▶ MTA BANGLA | Follow us ▶ MTA BANGLA

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও চলমান পরিস্থিতি

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
মুবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সম্মানিত সভাপতি এবং উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এই মহতী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও চলমান পরিস্থিতি। আমার বক্তব্য হবে ইসলামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার শিক্ষা কী আর এটি বিনষ্টকারীদের বিষয়ে কী করণীয়?

প্রথমেই চলমান পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা কথা বলে নেয়া যাক। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যা যা হচ্ছে তা আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সুবাদে আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই জানা। এখনকার শিশু-কিশোররা পর্যন্ত বকো হারাম ও আইএস-এর নাম জানে। তাই সেদিকটি স্মরণ করানোর বেশি প্রয়োজন নেই। তবে মাতৃভূমির কথা স্মরণ না করালেই নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ সুন্দর দেশে আমরা না চাইতেও গত কয়েক মাসে যেসব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে তা একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নিকটতম ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করতে হবে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একদল উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম-সেবক 'ইসলাম রক্ষার্থে' সারাদিনব্যাপী দোকানপাট ভাঙচুরসহ সরকারি সম্পদ লুটপাট ও ভাঙচুর এবং রেলওয়ের মূল্যবান যন্ত্রপাতি ধ্বংস ও রেললাইন উপড়ে ফেলে অগ্নি সংযোগের ঘটনা (১২ই জানুয়ারি, ২০১৬)।

এর একটু পিছনে গেলেই আমরা দেখব রাজশাহীর বাগমারায় আহমদীয়া মসজিদে আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং এর ফলে হামলাকারীর নিহত ও তিনজন আহত হবার ঘটনা (২৫ ডিসেম্বর, ২০১৫)। এর আরেকটু পিছনে গেলে দেখতে পাই কান্তজিউ মন্দির প্রাঙ্গণে রাসমেলায় আক্রমণ ও দশজনকে আহত করার বিষয়টি (ডিসেম্বর ৪, ২০১৫)। এর কদিন আগেই বগুড়ার শেরপুরের শিবগঞ্জের শিয়াদের জামাতখানায় আক্রমণ করে একজনকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করা হয় (২৬ নভেম্বর, ২০১৫)। তারও আগে শিয়াদের কেন্দ্রীয় ইমামবাড়া হোসাইনী দালানে বোমা হামলা করে একজন সুন্নি কিশোরের প্রাণ নাশ ও বেশ ক'জনকে আহতকরার ঘটনা। এছাড়া সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ও খ্রিস্টানদের প্রতি নিয়মিত অন্যায় অনাচারের ঘটনাগুলো ঘটেই চলছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা অতুলনীয়। ইসলাম এ উদ্দেশ্যে আমিলগুলোর চেয়ে মিল ও সদৃশ্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা

"সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী– দলগুলোকে অনেক স্বল্প সময়ে দমন করা সম্ভব যদি বিশ্বের সমস্ত দেশ এগুলোকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আন্তরিক হয়।"

ঘোষণা করেছেন: 'ওয়া লি কুল্লি কাওমিন হাদ' তথা 'প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক এসেছেন' (সূরা রা'দ: ৮)। আরও বলেছেন, 'ওয়া ইম্ মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাযীর' অর্থাৎ এমন কোন জাতি নেই যাদের মাঝে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সতর্ককারী আসেন নি (সূরা ফাতের: ২৫)। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এসব শিক্ষার আলোকেই তায়েফ সফরের এক পর্যায়ে চরম নিগৃহীত অবস্থায় আদ্দাস নামক এক ক্রিতদাসকে তবলীগ করার সময় হযরত ইউনুস (আ.)-কে 'ভাই' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) নবীজি (সা.)-এর মহান শিক্ষা তুরে ধরে বলেছেন: 'সেই মহামর্যাদাবান নবী (সা.)-ই আমাদেরকে শিখিয়েছেন, যেসব নবী-রসূলকে জগতের বিভিন্ন জাতি সত্য বলে মেনে এসেছে আর খোদা তা'লা নিজে তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মর্যাদা এবং গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত আর তাদের ঐশী গ্রন্থাবলিতে যদিও এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার কারণে কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন সৃষ্টি হয়ে গেছে অথবা এগুলোর অর্থ বুঝতে ভুল করা হয়েছে তথাপি প্রকৃতপক্ষে সেইসব গ্রন্থাবলি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ছিল এবং সেগুলো সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের যোগ্য' (চাশমায়ে মারেফাত, পৃ. ৩৮১/৩৮২)।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে একথাও বলেছেন, 'মিনহুম মান ক্বাসাসনা আলাইকা ওয়া মিনহুম মাল্‌লাম নাকসুম আলাইকা' (সূরা মু'মিন-৭৯) অর্থাৎ পৃথিবীতে যত নবী রসূল গত হয়েছেন কুরআন শরীফে তাদের একাংশের উল্লেখ করেছি আর একাংশের উল্লেখ করি নাই। একথার উদ্দেশ্য হল, মুসলমানরা যেন সুধারণা পোষণ করে আর পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে প্রেরিত যে-সব নবী গত হয়েছেন তাদেরকে যেন সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে" (চাশমায়ে মারেফাত, পৃ. ৩৮২)।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সূরা হাজ্ব এর আয়াত উল্লেখ করে বলেন-

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝

(সূরা হাজ্জ: আয়াত ৩৯-৪০)

অনুবাদ- আল্লাহ তা'লা চাচ্ছেন কাফিরদের অপকর্ম আর অনাচার তিনি যেন মুমিনদের মাধ্যমে প্রতিহত করেন অর্থাৎ মুমিনদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি দেন। নিশ্চয়ই খোদা বিশ্বাসঘাতক এবং অকৃতজ্ঞদের ভালোবাসেন না। খোদা তা'লা সে সব মুমিনকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিচ্ছেন যাদেরকে হত্যার করার জন্য কাফেররা বারবার আগ্রাসন চালাচ্ছে আর আল্লাহ্ আদেশ দিচ্ছেন। মু'মিনরাও যেন কাফেরদের প্রতিহত করে, কেননা এরা অত্যাচারিত আর আল্লাহ্ এদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান। যদিও এরা সংখ্যায় অল্প তবুও আল্লাহ্ এদের সাহায্য করতে সক্ষম।'

কুরআন শরীফে এ হল সেই প্রথম আয়াত যার মাঝে কাফেরদের প্রতিহত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন এই আয়াত দ্বারা কী সাব্যস্ত হয়? নিজেরা আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করা নাকি নির্যাতিত অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য অপারগতায় (শত্রুদের) প্রতিহত করা? আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও জানেন, আমাদের কাছে আজও সে একই কুরআন বিদ্যমান যা মহানবী (সা.) প্রচার করে গেছেন। অতএব এর এই স্পষ্ট বক্তব্যের বিপক্ষে যা-ই বর্ণনা করা হোক বা হয় সে সব কথা মিথ্যা ও স্পষ্ট অপবাদ। মুসলমানদের নিশ্চিত এবং অভ্রান্ত ইতিহাস যে গ্রন্থ থেকে সাব্যস্ত হয় সেটি হল কুরআন শরীফ।' (চাশমায়ে মারেফাত পৃ. ৩৯১-৩৯২)

জিহাদ প্রসঙ্গঃ

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর ক্ষেত্রে পবিত্র ইসলাম ধর্মের জিহাদ বিষয়ে অপব্যাখ্যা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। উগ্র-ধর্মান্ধরা কথায় কথায় মুসলিম অধ্যুষিত দেশে জিহাদের হুংকার দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরই নিধন করে থাকে। তাই প্রকৃত জিহাদের কথা বলে দেয়া প্রয়োজন।

ইসলাম ধর্মের একটি চমৎকার শিক্ষা হল জিহাদ। এই শব্দের শাব্দিক অনুবাদ হল, চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। কিন্তু এই পবিত্র শিক্ষার বিকৃত ব্যাখ্যা করে ধর্ম ব্যবসায়ীরা মুসলমানদের একাংশকে বিপথগামী করেছে এবং এখনও করছে। অথচ কুরআন, সুন্নত ও সহীহ হাদীসের দিকে তাকালে অতি সহজেই জিহাদের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

একবার এক আত্মরক্ষামূলক অভিযান শেষে মদিনায় শান্তিপূর্ণ জীবনে ফেরৎ আসার সময় মহানবী (সা.) তার সাহাবীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, "আমরা 'সবচেয়ে ছোট জিহাদ' থেকে এসে এখন 'সবচেয়ে বড় জিহাদের' দিকে প্রত্যাবর্তন

করছি।" (কাশফুল মাহজুব ও আল্লামা যামাখ্‌শারির তফসীরে কাশ্‌শাফ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ, সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ শেষে আমরা এখন আত্মশুদ্ধির জিহাদে ফিরে আসছি। এই উক্তিতে মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে আত্মশুদ্ধির জিহাদকে 'সবচেয়ে বড় জিহাদ' আর সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধকে 'সবচেয়ে ছোট জিহাদ' বলেছেন।

আরও একটি জিহাদের ধরন কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৫৩ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা নবীজী (সা.)-কে বলেছেন, 'সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও।' এই আয়াতে কুরআনের পবিত্র ও আকর্ষণীয় শিক্ষা উপস্থাপনের মাধ্যমে অস্বীকারকারীদেরকে প্রতিহত করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। লক্ষ্য করুন, এখানে কুরআনের সৌন্দর্য প্রচারের জিহাদকে 'বড় জিহাদ' তথা 'জিহাদে কবীর' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'সবচেয়ে বড় জিহাদ' হল, আত্মশুদ্ধির জিহাদ এরপর হল 'বড় জিহাদ' তথা কুরআনের শিক্ষা প্রচারের জিহাদ। এরপর আরেক ধরনের জিহাদ রয়েছে যাকে পরিভাষায় 'জিহাদে সাগীর' বা ছোট জিহাদ বলা হয়। সেটির উল্লেখ রয়েছে সূরা আস্ সাফের ১০ নম্বর আয়াতে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? সেটি হল, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে!' এই আয়াতদ্বয়ে ধন-সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করাকে উত্তম জিহাদ বলা হয়েছে। তাই অর্থ-সম্পদ ব্যায় করাটা জিহাদের একটি অন্যতম প্রকার। এখানে ধন সম্পদ ব্যায় করার পাশাপাশি জীবন ব্যায় করার উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করাটাও এক মহান জিহাদ। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় 'আস্‌হাবুস্ সুফ্‌ফা' নামে পরিচিত কয়েকজন সাহাবী দিন-রাত ধর্ম চর্চা করার এবং শেখার জন্য মসজিদে নববীতেই পড়ে থাকতেন। এরা জীবন উৎসর্গকারী খোদাপ্রেমিক মুসলমান ছিলেন। কুরআন, সুন্নত ও সহীহ হাদীসে কোথাও আত্মঘাতী বোমারু বা ঘাতক হবার শিক্ষা দেয়া হয় নি। বরং আত্মহননকে হারাম বলা হয়েছে। অতএব বর্তমানে উগ্র-ধর্মান্ধরা যা করছে তা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী।

সবচেয়ে ছোট জিহাদ তথা সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধের শিক্ষা রয়েছে সূরা হজ্জের ৩৯-৪০ নম্বর আয়াতে। একবার মনোযোগ দিয়ে এ দু'টি আয়াত পড়ে দেখুন। স্পষ্ট লেখা আছে, দীর্ঘদিন অত্যাচারিত থাকার পর মক্কার নির্যাতিত মুসলমানরা হিজরত করে স্বদেশ ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসার পরও যখন মক্কার কোরাইশরা নিরীহ শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য আগ্রাসন চালিয়েছে তখন আত্মরক্ষার্থে আরশের খোদা তাঁর নবী (সা.)-কে অস্ত্রধারণ করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এই অপারগতার যুদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নয় বরং সকল ধর্মের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। অতএব বর্তমান যুগের উগ্র ধর্মান্ধ এক শ্রেণীর হুজুরদের মনগড়া তাফসীরের সাথে ইসলামের মূল শিক্ষার কোন মিল নেই।

কুরআন শরীফে যে আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধের শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে সেগুলো আপারগতায় ও সাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং নির্দিষ্ট অত্যাচারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে। একথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে সূরা বাকারার ১৯১ নং আয়াতে। আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩١﴾

অর্থাৎ- 'তোমরা খোদার পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর যারা প্রথমে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং চড়াও হয়েছে। কিন্তু তাদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।' (সূরা বাকারা: আয়াত ১৯১)

পরিষ্কার দেখা গেল, কেবলমাত্র আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করার জন্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তা না হলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে ভালোবাসা রাখতে এবং হৃদ্যতা গড়তে ইসলামে কোন বাধা নেই। যেমন আল্লাহ তা'লা সূরা মুমতাহানার ৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

অর্থাৎ- 'যারা তোমাদের ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে হত্যা করতে আগ্রাসন চালায় নি আর তোমাদেরকে দেশছাড়া করে নি– খোদা তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে আর সদাচরণ করতে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।' (সূরা মুমতাহানা: আয়াত ৯)

মুশরিকদের সাথে যুদ্ধাবস্থাতেও সদাচরণ করার নির্দেশ কুরআনে স্পষ্টভাবে দেয়া আছে,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۝

অর্থাৎ- যুদ্ধরত মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায় সেক্ষেত্রে তুমি তাকে আশ্রয় দিবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনে না নেয়। এরপর তুমি তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবে। এর কারণ হল তারা এমন এক জাতি যারা প্রকৃত বিষয় জানে না। (সূরা তওবা: আয়াত ৬)

আরো বলা আছে,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝

(সূরা হামীম আসসাজদা: আয়াত ৩৫)

অর্থাৎ 'তুমি মন্দকে সর্বোৎকৃষ্ট আচরণ দ্বারা প্রতিহত কর। তাহলে দেখবে যার সাথে আজ তোমার শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।' আরও বলা আছে, 'সত্যিকার মু'মিন তারা যারা নিজেদের রাগ দমন করে আর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে' (সূরা আলে ইমরান-১৩৫)। আল্লাহ তা'লা বলেছেন: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহ প্রদর্শণের এবং আত্মীয়সুলভ আচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অশ্লীলতা অবলম্বন, কুকর্ম সাধন এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করছেন' (সূরা নাহল: ৯১)।

এ ধরনের আরো অনেক অনেক আয়াত ইসলামের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের দিকে আলোকপাত করছে। এ দিকে অর্থাৎ জেহাদে আকবরের দিকে মনোযোগ না দিয়ে এক শ্রেণির প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ধর্মীয় শিক্ষার অপব্যাখ্যা করে ইসলামের দুর্নাম ছড়াচ্ছে।

প্রতিকার:

১) নেতাদের প্রতি কড়া নজরদারি, ২) অর্থের উৎস বন্ধ করা, ৩) অস্ত্রের সরবরাহ বন্ধ করা। এবং ৪) আদর্শিক লড়াই যার এক ঝলক আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি।

ইসলামকে জগতের সামনে প্রকৃত ও খাঁটিরূপে পুনরায় তুলে ধরার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আগমন করেছেন। এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত ঐশী খেলাফত একই কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে।

২০১৪ সালের ৮ই নভেম্বর ইউ'কে'র জাতীয় শান্তি সম্মেলনে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যের শিক্ষা উপস্থাপন করার পর হযরত খলীফতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, 'প্রত্যেক আহমদী মুসলমান এবং নিশ্চয়ই প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় মুসলমান তাদের ধর্মের এরূপ বিকৃত অপব্যবহারে দারুণভাবে মর্মাহত। তথাপি এ পর্যায়ে আমি সে-সব মানুষ, প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিবিদকে প্রশ্ন করতে চাই যারা চরমপন্থীদের অত্যাচার অনাচারের ছুঁতো ধরে ইসলামকে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করি, এসব চরমপন্থীদল কীভাবে এত বড় অংকের অর্থ সম্পদ লাভ করল যার কারণে তারা এত দীর্ঘ সময় ধরে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে সক্ষম? তারা এসব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র পেল কোথায়? তাদের কাছে কী সমরাস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য শিল্পকারখানা বা ফ্যাক্টরি রয়েছে? বলা বাহুল্য, এরা কোন দেশ বা পরাশক্তির সাহায্য সমর্থন লাভ করছে। হতে পারে তা কোন তেল সমৃদ্ধ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অথবা কোন পরাশক্তি আড়াল থেকে এদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে। ....সব ধরনের উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ নিরসনে একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রয়াস কেন নেয়া হয় না? ....ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এ ধরনের সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদলগুলোকে অনেক স্বল্প সময়ে দমন করা সম্ভব যদি বিশ্বের সমস্ত দেশ এগুলোকে উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও আন্তরিক হয়।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) গত নভেম্বর মাসে প্যারিসের ন্যক্কারজনক হত্যাকাণ্ডের পর এর নিন্দা জানিয়ে বলেছেন,

'নিরীহ মানুষ হত্যা করা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না আর যারা নিজেদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নামে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে তারা কেবল সর্বনিকৃষ্ট পন্থায় ইসলামকে দুর্নাম করার কাজে রত। (২০১৫ সালের ১৪ই নভেম্বর প্রদত্ত প্রেস রিলিজ)

হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) মে, ১৯০০ সনে তৎকালীন সরকারকে যে ভাষায় বিষয়টির গভীরতা বুঝিয়েছিলেন সে ভাষায় বিষয়টিকে উপস্থাপন করছি।

"আর যদিও সীমান্ত প্রদেশে এবং বিভিন্ন আফগান অঞ্চলে এমন (বিকৃত)শিক্ষা প্রচারকারী অনেক মৌলভী রয়েছে কিন্তু আমার মনে হয়, পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানও এসব মৌলভীমুক্ত নয়। যদি সরকার মহোদয় এদেশের সকল মৌলভীকে এ ধরনের চিন্তাধারামুক্ত বলে বিশ্বাস করে থাকে তাহলে তাদের এই বিশ্বাস পুন:বিবেচনার যোগ্য। আমার মতে, মসজিদে গা ঢাকা দেয়া নির্বোধ অগ্নিশর্মা মোল্লা এসব নোংরা চিন্তা-চেতনা থেকে পবিত্র বা মুক্ত নয়। আমি সত্য সত্যই বলছি, তারা যেমন সরকারের বিভিন্ন অনুগ্রহসুলভ আচরণের প্রতি অবজ্ঞা করে একদিকে রাষ্ট্রের গোপন শত্রু তেমনিভাবে তারা খোদা তা'লার দৃষ্টিতেও অপরাধী এবং অবাধ্য। কেননা আমি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, খোদা তালার পবিত্র বাণী কখনই এভাবে নিরপরাধদের হত্যা করার শিক্ষা দেয় নি। আর যে এমন ধারণা রাখে সে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত।" (গভর্ণনমেন্ট আংগ্রেজী আওর জিহাদ, পৃষ্ঠা-২০ রূহানী খাযাইন ১৭শ খণ্ড)

পরিশেষে মহানবী (সা.)-এর বিদায় ভাষণে প্রদত্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করছি। তিনি বলেছিলেন, 'সাবধান, তোমরা ধর্মনিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা তেমাদের পূর্বের জাতিসমূহ ধর্ম বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক, বাব কাদরু হাসরির রামি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৮, নম্বর ৩০২৯) আল্লাহ তা'লা সবাইকে সুমতিদিন। আমীন।

[গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কর্তৃক আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে পঠিত বক্তব্য]

জামেয়া আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.)-এর প্রদত্ত ভাষণ (১৩ই ডিসেম্বর, ২০১৪)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় আজ আপনাদের মধ্য হতে ২২জন শিক্ষার্থী, যারা শেষবর্ষ অর্থাৎ 'শাহেদ' ক্লাশের ছিলেন তারা মুবাল্লিগ ও মুরব্বী হয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবদিক থেকে এই সম্মান আশিসপূর্ণ করুন কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আজ থেকে অথবা জামেয়া হতে পাশ করার পর আপনাদের জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়ে গেছে। আপনারা সেসব লোকদের দলভুক্ত হয়ে গেছেন যাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের পর বিশ্বকে সত্য ও প্রকৃত বিষয় দেখানো এবং জগদ্বাসীকে সত্য ও সঠিক বিষয়ের ওপর পরিচালিত করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

তাই সর্বপ্রথম আপনাকে সবসময় এবং প্রতিটি মুহূর্ত আত্মবিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, কেননা এই যে দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করা হয়েছে তা অনেক বড় গুরুদায়িত্ব। সত্য ও সঠিক বিষয় বর্ণনা করা, শেখানো এবং সে মোতাবেক বিশ্ববাসীকে পরিচালিত করা কোন সাধারণ কাজ নয়। এটি অনেক বড় দায়িত্ব। যেমনটি আমি বলেছি, একে সদা আপনার সামনে রাখতে হবে, দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, তাহলেই আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন। আত্মবিশ্লেষণ করলে পরেই আপনি সঠিকভাবে তবলীগও করতে পারবেন এবং তরবীয়তও করতে পারবেন। এই দু'টো কাজই এমন যা আদর্শের মুখাপেক্ষী। যদি আপনার মাঝে আদর্শ না থাকে তবে শুধুমাত্র জ্ঞানের ভিত্তিতে কখনোই এক্ষেত্রে সাফল্য আসবে না। কাজেই, এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমাদের প্রত্যেক মুরব্বী এবং মুবাল্লিগকে দৃষ্টিপটে রাখা চাই।

আমরা জামেয়া পাশ করেছি বা ভালো নাম্বার নিয়ে পাশ করেছি, উত্তম স্থান অর্জন করেছি, এতেই আনন্দিত হবেন না বা ক্ষ্যান্ত দিবেন না। আমি অনেক বড় বড় স্থান অর্জনকারীদের দেখেছি, তারা যখন কর্মক্ষেত্রে যায় তখন তাদের কর্মকান্ড হয় শূন্য অপরদিকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় সমৃদ্ধরা, নিজেদের ব্যবহারিক আদর্শের প্রতি মনোযোগিরা এমন যারা হয়তো জামেয়ায় অধ্যয়নকালীন সময় পড়াশুনায় ছিলেন দুর্বল কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অনেক সফল হন। তাই, আপনাদের সত্যিকার সাফল্যের মান এখন জানা যাবে। শুধুমাত্র ব্যাকারণ পড়া, ফেকাহ্ এবং (কুরআনের) অনুবাদ পড়া এবং এসব বিষয়ে কৃতীত্ব অর্জন করা। ভালোভাবে তফসীর মুখস্ত করে এর ওপর বড় বড় নোট লেখা, এটি

জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমলের ক্ষেত্রেও উন্নতি আবশ্যক। আর যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন এক্ষেত্র উম্মুক্ত আছে। সাত বছরের একটি সীমিত সময় শেষ হয়ে গেছে এবং গোটা জীবনরূপী দীর্ঘ একটি নতুন যুগ শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি নতুন দিন জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে উদিত হওয়া উচিত।

শুধুমাত্র ব্যাকরণ আর যুক্তিবিদ্যা পড়লেই তোমরা আকাশ ও পৃথিবী লাভ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ! তোমরা যদি দোয়া করো আর খোদার দরবারে সমর্পিত হও তাহলে পতামরা আকাশ ও পৃথিবী লাভ করবে।

সফলতার মাপকাঠি নয়। এখন সফলতা আরম্ভ হবে যখন আপনি স্বয়ং এতে অভিনিবেশ করবেন, এর ওপর অনুশীলন করবেন এবং এগুলো অনুধাবন করার পর বিশ্ববাসীকে তা বুঝাবেন। কাজেই, স্মরণ রাখবেন, যেমনটি আমি বলেছি, এখন আপনাদের নতুন যুগ শুরু হচ্ছে। জামেয়া পাশ করেছি এখন আমাদের কাজে নিয়োগ করা হবে, যা পড়ার ছিল তা পড়ে নিয়েছি এখন আমাদের কাজ শেষ, একথা ভেবে আপনারা আনন্দিত হবেন না।

যেমনটি আমি বলেছি, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমলের ক্ষেত্রেও উন্নতি আবশ্যক। আর যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন এক্ষেত্র উম্মুক্ত আছে। সাত বছরের একটি সীমিত সময় শেষ হয়ে গেছে এবং গোটা জীবনরূপী দীর্ঘ একটি নতুন যুগ শুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি নতুন দিন যেন জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে উদিত হওয়া উচিত। কর্মের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধের মাধ্যমে উদিত হওয়া উচিত। কর্মে উন্নতি লাভের মাধ্যমে উদিত হওয়া উচিত এবং দিবসের আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত ও কর্মের উন্নতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে আপনাদের প্রতিটি রাত অতিবাহিত করা উচিত। অতএব, এই বিশ্লেষণ আপনাদের দৃষ্টিপটে থাকলেই আপনারা নিজেদের মান দেখতে পাবেন, নিজেদের অগ্রগতি দেখবেন। যেখানে ঘাটতি দেখবেন তা পূর্ণ করার চেষ্টা করবেন। যদি এরূপ আত্মবিশ্লেষণ না করেন তাহলে সেই পার্থিব লোকদের মত হবেন যাদের কাজ হলো শুধুমাত্র সকালে উঠে নিজের কর্মক্ষেত্রে যাওয়া এবং সন্ধ্যায় কর্মক্ষেত্র হতে ফিরে আসা। আপনার চাকরী তো খোদা তা'লার চাকরী। আপনার চাকরী কোনো সাধারণ মানুষের চাকরী নয়।

অতএব, এটি সেই খোদার চাকরী, যিনি দিনেও দেখেন আর রাতেও দেখেন। এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে যখন নিজের আত্মবিশ্লেষণ করবেন তখনই আপনার আসল চিত্র এবং আপনার অবস্থান জানা যাবে। আপনাদের মধ্য হতে হয়তো অনেককে কর্মক্ষেত্রে বা মিশনে পাঠানো হবে না বরং বিভিন্ন অফিসে বা কাজে নিযুক্ত করা হবে। যারা বিভিন্ন দপ্তরে যোগ দিবেন বা বিভিন্ন কাজে অন্যস্থানে যাবেন তাদের একথা মনে করা উচিত নয় যে, আমাদের যে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে শুধু এতেই মনোযোগ দিতে হবে। নিঃসন্দেহে দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে কিন্তু এর পাশাপাশি জ্ঞান এবং আচার-আচরণগত উন্নতির প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। ক্রমশঃ নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। হতে পারে যে, আজ কাউকে দাপ্তরিক কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, দুই-তিন বা চার বছর দপ্তরে কাজ করার পর তাকে হয়তো মিশনারী হিসেবে প্রেরণ করা হতে পারে। তাই যদি আপনার প্রস্তুতি না থাকে, জ্ঞান বৃদ্ধি না করেন এবং আপনার দিবানিশি যদি শুধুমাত্র আপনার ওপর অর্পিত ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যয় হয় তাহলে কর্মক্ষেত্রে আপনাকে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে।

তাই সর্বদা মনে রাখবেন, যেখানেই আপনি থাকুন না কেন কুরআন শরীফের প্রতি অভিনিবেশ ও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পড়তে হবে আর এর প্রতি অভিনিবেশ এবং চিন্তা করতে হবে। কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক মূলতঃ পবিত্র কুরআনেরই বিভিন্ন তফসীর এবং হাদীসের ভাষ্য। যদি এগুলো আপনারা পাঠ করে তাহলে আপনাদের কাছে দু'টি বিষয়ই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনাদের কাজে আসবে।

কাজেই, আপনি যেখানেই থাকুন আর যে কাজেই আপনাকে নিযুক্ত করা হোক, কোন ব্যবস্থাপনার কাজেই নিযুক্ত করা হোক না কেন আপনাকে সদা-সর্বদা নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এরপর একথাও স্মরণ রাখবেন, যেখানে আপনি যাবেন, যদি কর্মক্ষেত্রে যান, কোনো মিশনে নিযুক্ত করা হয় তাহলে আপনার কাছে মানুষের প্রত্যাশা থাকবে যে, মুরব্বী সাহেব এসেছেন, আমাদের মাঝে মুবাল্লিগ এসেছেন। এসব প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ করার বিষয়ে যত্নবান হবেন। যদি প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারেন তাহলে আপনার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা আপনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারবেন না। আপনার বাহ্যিক ভূষণ, আপনার স্বভাব-চরিত্র এবং আপনার বাহ্যিক কর্মকান্ড অর্থাৎ, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গি, ওঠা-বসা, পানাহারের রীতি,

আপনি যেস্থানে বা যে জামাতেই থাকুন না কেন এসব আচার-আচরণ সেখানকার লোকেরা দেখতে থাকবে। যদি এক্ষেত্রে কোথায় ঘাটতি থাকে তাহলে সেসব ক্ষেত্রে জামাতের মধ্যেও দুর্বলতা আরম্ভ হয়ে যাবে। আর যদি এসব ক্ষেত্রে উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে সেই জামাতেও এসব ক্ষেত্রে উন্নত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা পেতে আরম্ভ করবে।

কাজেই, প্রত্যেক মুরব্বী ও মুবাল্লিগকে সদা নিজের প্রতিটি কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা চাই যাতে যেখানেই যান আপনার আদর্শ লোকদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় এবং আপনার মান সমুন্নতকারী হয় আর আপনি যে জামাতে কর্মরত থাকবেন সেই জামাতের আচরণগত ও আধ্যাত্মিক মান এবং নৈতিক মানও যেন সমুন্নতকারী হয়।

অতএব, এসব বিষয়ের প্রতি আপনাকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি। জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক উন্নতির সঙ্গে যদি আধ্যাত্মিক উন্নতিও যোগ হয় তাহলে তো এটি সোনায় সোহাগা। শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করা এবং বাহ্যিক বেশ-ভূষার প্রতি যত্নবান হওয়ায় সাময়ীক লাভ হলেও স্থায়ী কোন ছাপ অঙ্কন করে না। যখন আপনি আধ্যাত্মিকভাবেও উন্নতি করবেন তখনই চিরস্থায়ী কল্যাণ হবে। যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে আপনার সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এসব বিষয়ই অর্থাৎ আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সঙ্গেই সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে বরং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির চেতনাও আপনার মাঝে বৃদ্ধি পাবে।

আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে তাঁর সৃষ্টির প্রতিও ভালবাসা জন্মে কেননা, এটিও খোদা তা'লারই নির্দেশ, আর এই সহানুভূতিই তবলীগ ও তরবীয়তের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করে। এই সহানুভূতির চেতনায় তবলীগ করা যে, আমাদেরকে বিশ্ববাসীর কাছে খোদা তা'লার সত্যিকার বাণী পৌঁছিয়ে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে এতগুলো বয়আত করাতে হবে এই উদ্দেশ্যে তবলীগ নয় বরং বিশ্ববাসীকে ধ্বংস হতে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এবং নিয়্যতে তবলীগ করতে হবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একস্থানে লিখেছেন যে, মানুষ আমাকে বলে যে, আমরা আহমদীয়াত গ্রহণ না করলেও ইসলাম গ্রহণ করবো (অনেকে এমনও আছে)। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি সর্বদা তাদের একথাই বলে থাকি, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, এটিই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যখন তোমরা সত্যিকার ইসলাম গ্রহণ করবে তখন আহমদীয়াত গ্রহণ করা ছাড়া তোমাদের কাছে অন্য আর কোন উপায়ই থাকবে না।

কাজেই, মুসলমানদেরও সত্যিকার ইসলাম কী তা জানানো আমাদের কাজ এবং অমুসলমানদেরও প্রকৃত ইসলাম শেখানো আমাদের কাজ আর এর পরিণামে তারা এই সত্যিকার ইসলামের কাছে আসবে যা আহমদীয়াত উপস্থাপন করছে, যা এ যুগের ইমাম আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং খোদার প্রতিশ্রুতি অনুসারে এসেছেন। অতএব সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তাদেরকে আগুন থেকে রক্ষার জন্য এবং ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে। এরূপ সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে আমাদের তরবীয়ত করতে হবে যে, আমাদেরকে নিজের ভাইকে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা করতে হবে।

একজন আহমদী যদি নিজেকে আহমদী দাবী করার পরও সেসব বিষয়ের ওপর আমল না করে যা একজন সত্যিকার আহমদী মুসলমানের করা উচিত, যেসব বিষয়ের প্রতি অসংখ্যবার বিভিন্ন স্থানে নিজ রচনা, বক্তৃতা ও সন্দর্ভে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, আমরা যদি সেই মান অর্জন না করে থাকি অথবা চেষ্টা না করি

তাহলে আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করছি না। আর বয়আতের অঙ্গীকার যদি সঠিকভাবে পালন না করি তাহলে এটি নিশ্চয় সে বিষয়ের প্রতি নিয়ে যায় অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির কারণে পরিণত হয়ে যাই। অতএব, এরূপ সহানুভূতি নিয়ে আপনাকে তরবীয়তও করতে হবে। নিজেকে বড় প্রমাণের জন্য তরবীয়ত করবেন না। আমাকে সম্মান করবে অথবা আমি যাতে আমার রিপোর্টে লিখতে পারি যে, আল্লাহ্‌র কৃপায় এখন এতজন আমাদের মসজিদে নামাযে আসতে আরম্ভ করেছে। এই উদ্দেশ্যে নয় বরং হৃদয়ে একটি আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয়া চাই যে, আমার ভাইকে খোদার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে তরবীয়ত করবো। তাকে খোদার নিকটতর করার উদ্দেশ্যে নামাযে আনতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে নামাযে আনা উচিত নয় যে, আমাদের মসজিদে, আমাদের পিছনে নামাযীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। একইভাবে অন্যান্য তরবীয়তি বিষয় রয়েছে তাও আপনাকে এজন্যই করতে হবে। এজন্য তরবীয়তের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে যাতে আপনার হৃদয়ে তাদের জন্য এবং তাদের কল্যাণের জন্য একটি আন্তরিক সহানুভূতি বিদ্যমান থাকে। আর এজন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তবলীগ ও তরবীয়তের জন্য যে রীতি শিখিয়েছেন তাহল প্রজ্ঞা এবং সদুপদেশ। প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলুন, স্থান-কাল ভেদে কথা বলুন এবং উত্তম কথা বলুন। একই কথা যদি একভাবে বলা হয় তাহলে তা ভালো প্রভাব ফেলে আবার সেই একই কথা যদি অন্যস্থানে বলা হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। যদি কোন বিপথগামী লোককে আপনি তরবীয়তের উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে মনোযোগ আকর্ষণ করেন আর এতে কোনরূপ তাচ্ছিল্যের সুর থাকে তাহলে সে আরো বিপথে চলে যাবে। তাকেই যদি পৃথক কোনো স্থানে বসিয়ে সহানুভূতির চেতনা দেখিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন তাহলে ফলাফল একেবারেই ভিন্ন হবে।

অতএব, সর্বদা মনে রাখবেন; সম্প্রতি এক স্থান থেকে একজন সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া আমাকে রিপোর্ট দিয়েছেন যে, অনেক খোদ্দাম যারা অনেক পিছনে চলে গিয়েছিল, জামাতের পক্ষ হতে যখন তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৃথকভাবে যোগাযোগ করা হয়, তাদের বোঝানো হয়, জামাতের গুরুত্ব এবং খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বুঝানো হয়, তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন সেসব মানুষ যারা কঠোরমনা হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্য হতে অনেকেই কাঁদতে আরম্ভ করে এবং আত্মসংশোধনের প্রতিশ্রুতি দেয় আর এখন মসজিদে আসতে আরম্ভ করেছে। কাজেই, সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া যিনি এমন এক ব্যক্তি যে জামেয়াতে পড়াশুনা করেনি, যিনি ধর্মের এতটা জ্ঞান অর্জন করেনি তিনি যদি তরবীয়ত করে মানুষের হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারেন তাহলে আপনারা যারা দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং আগামী দিনে নিজেদের জ্ঞান আরো বাড়ানোর অঙ্গীকার করেছেন। আপনাদের ফলাফল তো অনেক ভাল হওয়া উচিত।

কাজেই, এ বিষয়টির প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখুন, আপনি যে কথাই বলবেন তা তবলীগি হোক বা তরবীয়তি এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা মৌলিক নীতি বলে দিয়েছেন যে, তা যেন প্রজ্ঞার সাথে এবং উত্তমরূপে বলা হয়। এমনভাবে বাক্য বিন্যাস করতে হবে যেন তা যেকোন মানুষের মনে রেখাপাত করে আর তা যেন সময়-কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তবলীগের জন্য একজন মুবাল্লিগকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো, দিবানিশি ব্যাকুলতা ও আহাজারির সঙ্গে দোয়ায় রত থাকা এবং ধৈর্য ও একাগ্রতায় সমৃদ্ধ থাকা, কোন অবস্থাতেই উত্তেজিত বা অধৈর্য হওয়া যাবে না। উত্তেজিত হয়ে মুখ দিয়ে এমন কোন কথা বলে বসবে না যাতে অন্যের ওপর ভালো বা পুণ্যের পরিবর্তে মন্দ প্রভাব পরে।

এজন্যই তিনি (আ.) বলেছেন, উত্তেজিত হওয়ার ফলে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যখন তোমরা উত্তেজিত হবে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলবে তখন অন্যের হৃদয়ে ঘৃণা জন্ম নিবে। সে তোমার থেকেও দূরে সরে যাবে আর জামাত থেকেও দূরে চলে যাবে। অতএব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের যা বলেছেন তা একটি মৌলিক বিষয়, এটি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। বরং তিনি একথাও বলেছেন, এজন মুবাল্লিগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো বিষতুল্য। উত্তেজিত হওয়া এবং অধৈর্য প্রদর্শন তার জন্য এক প্রকার বিষ বিশেষ। আকুতি-মিনতি এবং অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে কারো জন্য দোয়া না করে শুধু মনে করা যে, নিজ চেষ্টায় ঠিক করে ফেলবো এটি বিষ। এছাড়া কর্কশতার ফলে প্রজ্ঞাও চলে যায় আর মানুষ সুন্দরভাবে কথাও বলতে পারে না। অর্থাৎ, এক ভুলের পর অন্য ভুল হতে থাকে। তাছাড়া রূঢ়তা অহংকারেরও লক্ষণ বটে। এখানে জামেয়ায় অবস্থানকালে নিজস্ব পরিবেশে আপনারা পরস্পরের সঙ্গে যখন কথাবার্তা বলেন অনেক সময় পরিস্থিতির কারণে উচ্চবাচ্য হয়ে যায় অথবা কারো কথা শুনে বিরক্ত হন কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এরূপ বিষয় হতে নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত রাখতে হবে তবেই আপনি সফল মুবাল্লিগ ও মুরব্বী হতে পারবেন। রূঢ়তার ফলে অহংকার জন্মে আর অহংকার-ই তাক্বওয়া হতে দূরে নিয়ে যায় আর যার মাঝে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি নেই তার কাজে বরকতও থাকতে পারে না।

কাজেই, যেভাবে একটি পুণ্য অনেক পুণ্যের জন্ম দেয় তদ্রুপ একটি মন্দ থেকে অনেক মন্দও ছড়িয়ে পরতে থাকে। এজন্য গভীর মনোযোগ ও প্রজ্ঞার সাথে এবং বিচার-বিশ্লেষণ ও ইস্তেগফার করার মাধ্যমে একজন মুবাল্লিগকে নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত। যেমনটি আমি বলেছি, তাক্বওয়া হচ্ছে একটি মৌলিক বিষয়, যদি একজন মুবাল্লিগ ও মুরব্বীর ভেতর তাক্বওয়া না থাকে তাহলে সে একজন সাধারণ আহমদীর চেয়েও নিম্নস্তরের মানুষ, মুরব্বী-মুবাল্লিগ তো দূরের কথা। আল্লাহ্‌র কৃপায় আপনাদের পূর্বে এখান থেকে যারাই মুরব্বী ও মুবাল্লিগ হিসেবে বের হয়েছেন, এরপূর্বে দু'টি ব্যাচ বেড়িয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন জামাত ও বিভাগের পক্ষ হতে আমার কাছে ভালো রিপোর্ট আসছে। সম্ভবত কানাডা হতে তিনটি ব্যাচ বেড়িয়েছে, যেসব তরুন মুবাল্লিগ পাশ করেছেন সেই প্রতিষ্ঠান থেকে, সেখানকার রিপোর্টও খুব ভালো।

তাই স্মরণ রাখবেন, আপনাদের পূর্বসূরী মুরব্বী ও মুবাল্লিগগণ যেসব মান অর্জন করেছেন আপনাদেরতে তা আরো সমুন্নত করতে হবে। আর পুরনো মুরব্বীদেরও আমি বলবো, যেহেতু আমার এই কথা বিশ্বময় শোনা যাবে তাই তারা যেন একথা মনে না করে যে, এখন পর্যন্ত তারা ভালো কাজ করেছে বলেই এই মান অর্জিত হয়েছে আর তারা নিজেদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। তাদেরকেও নিজেদের মান ক্রমশঃ উঁচু করতে হবে এবং বর্তমানে যেমন মান অর্জিত হয়েছে একেও ছাড়িয়ে যেতে হবে। এরূপ প্রতিযোগিতার মনোভাব যতদিন থাকবে ততদিন আমাদের মুরব্বী ও মুবাল্লিগগণ সফল মুরব্বী ও মুবাল্লিগে পরিণত হতে থাকবে, ইনশা আল্লাহ্।

এসব মান কীভাবে সমুন্নত করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের একথা মনে রাখতে হবে, বিনয়ের ফলে এই উচ্চতা লাভ হয়। আপনাদের মাঝে যত বেশি বিনয় থাকবে ততবেশি নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি থাকবে আর ততটাই আপনাদের মানও সমুন্নত হতে থাকবে। বিনয়াবনত পন্থাই খোদা তা'লার পছন্দ আর এ কথাই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেলায় প্রকাশ এবং ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য যারা নিজেদের উপস্থাপন করে তাদেরও সেই রীতি অনুসরণ করতে হবে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পছন্দ করেছেন এবং অবলম্বন করেছেন। এছাড়া বরকত হতে পারে না। এর ফলেই সফলতা আসবে আর এর মাধ্যমেই খোদার ভালবাসা লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। এর ফলেই জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির সমৃদ্ধি ঘটবে।

আপনাদের এবং আপনাদের পূর্বে যারা কর্মক্ষেত্রে গিয়েছেন তাদেরও স্মরণ রাখতে হবে, কোন ধরনের প্রশংসার ফলে যেন আপনাদের মাঝে অহংকার না জন্মে। আপনারা ভালো কাজ করলে প্রশংসাও করা হবে তা যুগ খলীফার পক্ষ থেকেই করা হোক বা ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকেই করা হোক অথবা সাধারণ মানুষ আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করুক। সকল প্রশংসা অহংকারের পরিবর্তে আপনাকে আরো বিনয়ী বানানো উচিত, আর যত বেশি আপনি বিনয়ে সমৃদ্ধ হতে থাকবেন ততবেশি আপনি সেই ফলবান বৃক্ষের মতো হবেন যাতে ফল ধরতেই থাকে, কেননা যে সব কান্ড বা শাখা ফল ধরে তা নুয়ে যেতে থাকে। প্রশংসা ফল সদৃশ হওয়া উচিত যা আপনাকে বিনত করবে আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, দোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। দোয়া ছাড়া কেউই সফল মুরব্বী বা মুবাল্লিগ হতে পারে না। আমরা যা কিছু পাবো তা আল্লাহ্‌র কৃপায়ই পাবো আর পাই। তাই দোয়ার প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া উচিত। যত বেশি আপনি দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিবেন ততবেশি আপনি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করবেন, আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উন্নতি করবেন, নৈতিক দিকেও ততবেশি উন্নতি আর ততটাই জ্ঞানগত উন্নতিও করবেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একবার একটি নসীহত করেছিলেন, এর কিছু অংশ এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি কেননা, সকল যুগেই এর প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ওয়াকেফীনদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

সর্বপ্রথম আমি ওয়াকেফে যিন্দেগীদের এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আপনারা দোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। তারা আগামীতে জামাতের মুবাল্লিগ হবেন আর দোয়া ছাড়া কোন মুবাল্লিগ সফল হতে পারে না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু এ যুগে আমাকে তাদের পথ নির্দেশক বানিয়েছেন আর নির্দেশকের জন্য আবশ্যক হলো, সে (নির্দেশক) যেন সুস্থ থাকে, তাই তোমরা বিশেষভাবে আমার জন্যও দোয়া করো। এতে একটি লাভ যা হবে তাহলো, তোমাদের দোয়ার ফলে আমি সুস্থ্য থাকব এবং আমি তোমাদের কাজের পরিচর্যা যথাযথভাবে করতে পারবো। ওয়াকেফে যিন্দেগী ও মুরব্বীদের কাজের তত্ত্বাবধান বা নিগরানী করাও যুগ খলীফার দায়িত্ব।

তাই আপনাদের কাজ হবে খলীফায়ে ওয়াক্তের জন্যও দোয়া করা। এছাড়া দ্বিতীয় যে লাভটি হবে তাহলো, এতে আপনাদের নিজেদেরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। মোটকথা, এক তীর দিয়ে দু'টি শিকার হবে। একদিকে খোদা তা'লার সাথে তোমাদের সম্পর্ক উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হবে আর দ্বিতীয়ত তোমাদের দিয়ে কাজ করানোর দায়িত্ব যে ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা হয়েছে তার শক্তি, সামর্থ ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে আর তিনি যথাযথভাবে তোমাদের কাজের তত্ত্বাবধান করতে পারবে। মনে রেখ! যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করে সে-ই পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে বলেছেন, "আল্ আরযু ওয়াস্‌সামায়ু মায়াকা কামা হুয়া মায়ী" অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবী সেভাবেই তোমাদের সাথে আছে যেভাবে তা আমার সাথে আছে। অনুরূপভাবে যদি তোমরা দোয়া করো তাহলে তোমরা আকাশ ও পৃথিবী লাভ করবে। যে বই-পুস্তক তোমরা স্কুলে পাঠ করতে বা জামেয়াতে পড়তে এর ফলে আকাশ ও পৃথিবী পাওয়া যায় না। আপনারা জামেয়া থেকে যে, জ্ঞানার্জন করেছেন শুধুমাত্র এগুলো অধ্যয়নের ফলে আকাশ ও পৃথিবী পাওয়া যায় না।

শুধুমাত্র ব্যাকরণ আর যুক্তিবিদ্যা পড়লেই তোমরা আকাশ ও পৃথিবী লাভ করতে পারবে না। তবে হ্যাঁ! তোমরা যদি দোয়া করো আর খোদার দরবারে সমর্পিত হও তাহলে পতামরা আকাশ ও পৃথিবী লাভ করবে। আর এই দোয়াতে যদি তোমরা আমাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নাও অথাৎ, যুগ খলীফাকে যদি এতে শামিল করে নাও তাহলে খোদা তা'লা বলবেন, এখন এরা কাজ করতে চায়, কেননা কেউ যদি তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালকের জন্য দোয়া করে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় সে নিজে কাজ করতে চায়। দেখো! শ্রমিকদের কাজের তত্ত্বাবধান করেন তত্ত্বধায়ক বা দলনেতা। শ্রমিকরা চায় তাদের দলনেতা যেন কোথাও চলে যায় যাতে তারা বিশ্রাম নিতে পারে। শ্রমিকদের যে পরিচালক রয়েছে তার ব্যাপারে অকর্মন্য শ্রমিকরা চায় সে যাতে কোথাও চলে যায় আর তারা আরাম করে। কিন্তু শ্রমিক স্বয়ং যদি পরিচালককে ডাকে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় সে কাজের জন্য প্রস্তুত। কাজেই তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেককে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যে, সে কাজ করে। মনে রেখ! একজন মুবাল্লিগের মাধ্যমে শত শত এবং হাজার হাজার মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণ করা চাই।

তাই তোমরা অর্পিত দায়িত্ব পালনের পাশপাশি আমার জন্যও দোয়া করো আর নিজেদের জন্যও দোয়ায় রত হও। তোমরা দোয়া করো যাতে খোদা তা'লা মানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রভাব সৃষ্টি করেন। তাদের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেন। তোমাদেরকে পরম উদ্যম দান করুন, ধৈর্য দান করুন যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় আমি পূর্বে বলেছি। তোমাদের শক্তিশালী ও নির্ভিক বানান। তোমাদের সেই পদ্ধতি শেখান যার ফলে মানুষ তোমাদের কথা মানবে। তোমাদের কথায় প্রভাব সৃষ্টি হোক। দেখো! হযরত মূসা (আ.)-ও এই দোয়াই করেছিলেন, "ওয়াহলুল উকদাতাম মিল্লিসানি ইয়াফকাহু ক্বওলী" অর্থাৎ, হে খোদা! তুমি আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছো আমি তা পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো কিন্তু তুমি জানো যে, আমার চেষ্টায় কিছুই হবে না তাই তুমি আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে কেননা, যারা আমার কথা বুঝতে পারবে তারা ধীরে ধীরে আমার কথা মানতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাই তোমরা দোয়ার রত থাকো। তোমরা দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করো আর বাহ্যিত জ্ঞানার্জনেরও চেষ্টা করো। দোয়ায় রত হও আর জাগতিক জ্ঞান অর্জনেরও চেষ্টা করো কেননা, বাহ্যিক জ্ঞানও অনেক মূল্যবান জিনিস। কিন্তু এর সাথে তোমাদের রাত ও দিন দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত হওয়া উচিত। যাতে তোমাদের মুখ থেকে যে বাক্যই নির্গত হবে তা যেন নিজের মাঝে প্রভাব রাখে আর এর মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ তোমাদের অনুসরণ করে আর ধর্মের ঝর্ণাধারা তোমাদের মুখ থেকে বইতে আরম্ভ করে আর তোমরা আল্লাহ্‌র সুসংবাদ সমূহ স্বকর্ণে শুনতে পাও।

দেখো! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কী কী সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখনো একাই ছিলেন তখন খোদা তা'লা বলেন, "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো"। একইভাবে তিনি তাঁকে সুসংবাদ দেন, "আমি তোমাকে অনেক বরকত দান করবো, এমনকি বাদশাহ্‌রা তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে"। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন। এসবই তাঁর খোদার প্রতি ঝুঁকা আর আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের ফলে হয়েছে। তোমাদের মাঝেও যদি এধরনের বিশ্বাস জন্মে আর তোমরাও খোদার পানে সমর্পিত হও তাহলে এরূপ খোদার সাহায্য তোমাদের মধ্য হতেও প্রত্যেকে লাভ করবে আর ইহজগতও তোমরা পাবে আর ধর্মও তোমরা পাবে।

অতএব এ কথাগুলো আমাদের সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। যে খোদা কোন মাধ্যম ছাড়াই বিশ্বের ২০৬টি দেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুসারী সৃষ্টি করেছেন তিনি আজও (সব কাজ করতে) পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সুযোগ দিচ্ছেন, যারা কানাডা থেকে পাশ করেছেন বা ইউকে থেকে পাশ করেছেন অথবা আগামীতে জার্মানী থেকে যারা পাশ করবেন বা বিশ্বের অন্যান্য জামেয়া হতে পাশ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সুযোগ দিচ্ছেন যাতে এই জিহাদের অংশ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারেন।

তাই নিজেদের গুরুত্ব অনুধাবন করুন। এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিতে রাখুন যে, আপনারা খোদা তা'লার সাথে তবলীগ ও তরবীয়ত করার অঙ্গীকার করেছেন। আপনারা এই অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার বাণী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের পেশ করছি। আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে এই অঙ্গীকার করছি যে, বিশ্বের সকল মানুষকে সঠিকভাবে সেই শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করবো যাতে তাদের পরকালের চিন্তা হয়। অঙ্গীকার রক্ষা করা একজন মু'মিনের কাজ। এটি আপনাদের অঙ্গীকার। প্রত্যেক মুরব্বী ও মুবাল্লিগের অঙ্গীকার। আল্লাহ্ তা'লা একজন সাধারন মু'মিনের জন্যও অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যক করেছেন, এক্ষেত্রে আপনারা আরো এক পা এগিয়ে আছেন, তাদের ওপরে আছেন যারা মু'মিনের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক তরবীয়তের জন্যও চেষ্টা করবে। তাই একজন সাধারণ মু'মিনের জন্যও অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যক হলে আপনাদের জন্য এটি কতবেশি জরুরী হবে তা আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন।

অতএব কোন জাগতিক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে সর্বদা এই অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি রাখুন যা আপনি খোদার সাথে করেছেন, অর্থাৎ আমরা বিশ্বের সকল স্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পৌঁছাবো আর নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা দ্বারা নিজেদের তরবীয়তের কাজকেও চরম মার্গে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। যদি আপনারা এমনটি করেন তাহলে এ জগত আপনা-আপনি আপনাদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে। জাগতিকতার পিছনে আপনাদের ছুটতে হবে না। আপনার পকেটে সামান্য যে অর্থ থাকবে তাতেও আল্লাহ্ তা'লা বরকত দিবেন। আল্লাহ্ করুন যেন সর্বদা একথা আপনাদের হৃদয়ে গেঁথে থাকে যে, আপনারা সেসব মানুষ যারা আল্লাহ্‌র চাকরী আর আল্লাহ্ তা'লার যে কাজ রয়েছে তা পূর্ণ করার অঙ্গীকার করেছেন এবং যুগ ইমামের হাতে শুধু বয়আত-ই করেন নি বরং বয়আত করার পর সেসব লোকদের মত নিজেকে উৎসর্গ করেছেন যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করার পর বিশ্বকে খোদার দরবারে আনয়নকারী ও সমর্পণের দায়িত্ব পালন করবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সত্যিকার অর্থেই আমার যোগ্য সাহায্যকারী বানান। কানাডা থেকে যারা পাশ করেছে তারাও এখন আমার সামনে উপবিষ্ট আছে। আপনারাও স্মরণ রাখবেন, আমি পূর্বেও বলেছি, আপনারা সবাই আমার সম্বোধিত তাই সদা নিজেদের দায়িত্বকে উপলব্ধি করুন। আপনারা যেখানেই থাকুন আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন। তিনি স্বয়ং আপনাদের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করুন। আপনাদের সমস্যায় দেখলে তিনি স্বয়ং আপনাদের সাহায্যকারী হোন, আশ্রয় দিন। আপনারা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা অর্জনকারী হোন আর উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুন। আপনাদের পক্ষ হতে সর্বদা সাফল্য ও আনন্দের সংবাদ যেন আমি পেতে থাকি।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জন্য এই সম্মান সবদিক থেকে মোবারক করুন। আমি পুনরায় বলবো, নিজ নিজ দায়িত্বাবলী আপনাদের বোঝার তৌফিক দিন। আসুন আমরা দোয়া করি।

ভাষান্তর: **আহমদ তারেক মুবাশ্বের,**
লন্ডন।

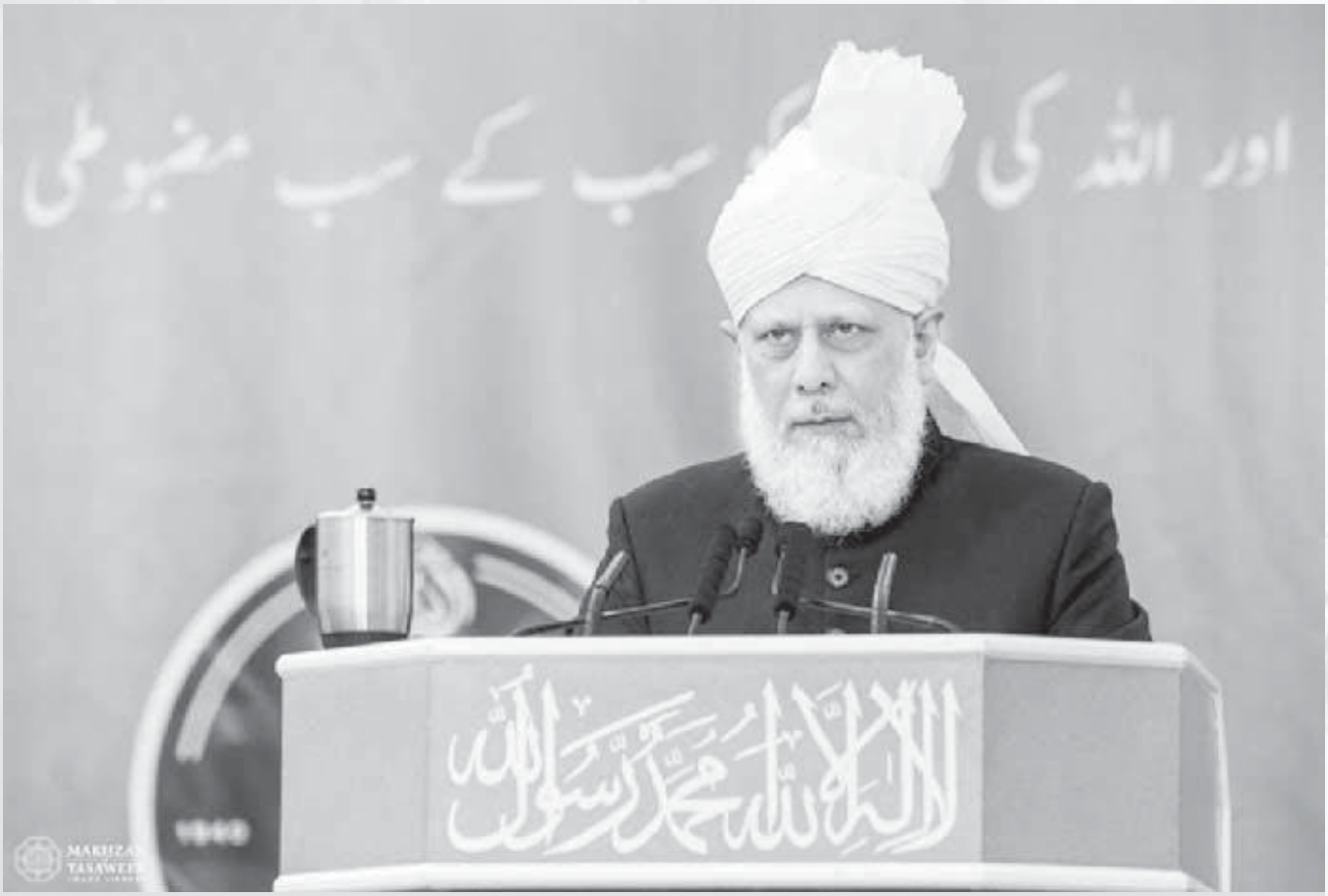

মজলিস আনসারুল্লাহর ৭৫ বছর পুর্তি উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

মজলিস আনসারুল্লাহ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ন্যাশনাল ইজতেমায় হুযূর (আই.) প্রদত্ত অমূল্য ভাষণ
স্থানঃ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন, তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনারা যেমনটি জানেন এবছর মজলিস আনসারুল্লাহ তাদের নিজেদের মজলিস প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে জুবিলী উদযাপন করছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের মজলিস আনসারুল্লাহ তাদের কর্মসূচী প্রতিপালন করছে। অধিকাংশ স্থানেই এই কর্মসূচী অনুযায়ী জুবিলী উদযাপিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের মজলিস আনসারুল্লাহও এ উপলক্ষ্যে এ বছরের ইজতেমা অনুষ্ঠানে বর্হিদেশের সদর আনসারুল্লাহ ও প্রতিনিধিদেরকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সুতরাং এবারে ইউরোপ ও বর্হিদেশের অন্যান্য দেশ থেকে আনসারুল্লাহর প্রতিনিধিগণ এখানে উপস্থিত আছেন।

জুবিলী উৎসব উদযাপন ভালো কথা। এটা অনেক বিষয়ের উপর মনোযোগ আকৃষ্ট করে। আর এটি উদযাপন করতে গিয়ে কতিপয় বিশেষ কর্মসূচী কার্যকর করার দিকে বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অঙ্গিকার গ্রহণ করা হয়, আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা আদায় করা হয়, আত্মবিশ্লেষণ করা হয়। অতএব, এসব বিষয় দৃষ্টিপটে রেখে ৭৫ বছর উদযাপন করাতো খুবই ভালো কথা। আর না হয় শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান ও হাসি-খুশির বিষয় হলে তা হবে

নিরর্থক। তবে আনসারুল্লাহর এমন অনেক সদস্য রয়েছে যারা কেবলমাত্র জুবিলীর আনন্দ উৎসবেই নিমজ্জিত। আর তারা ভাবে যে, জুবিলী উদযাপন করা হয়েছে, তাদের কাজ পুরা হয়ে গেছে। বরং বহু কর্মকর্তাও যেমন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ইজতেমার কর্মসূচীতে অংশ নেয় আর ইজতেমার কাজ-কর্মে সেবাদানের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। তাদের মধ্যেও কয়েকদিন পরে সেই সাধারণ দুর্বলতা আচ্ছাদিত করে ফেলবে। যদি আমাদের কেবল মাত্র এই আনুষ্ঠানিক হাসি-আনন্দ উৎসব করাই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এতে লাভ কী!

জাতীয় জীবনে ৭৫ বছর তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, যাকে বড়ই সফলতা মনে করা যায়। আর কেবল আনন্দ উৎসব উদযাপন করে আমরা যদি বসে যাই আর বলতে থাকি যে, দেখ! আমাদের সংগঠন ৭৫ বছর থেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পৃথিবীতে অনেক সংগঠনই আছে যারা ৭৫তম বর্ষ বরং শত বর্ষও উদযাপন করে থাকে। তবে ধীরে ধীরে সেই উদ্দেশ্য তারা বিস্মৃত হয়ে যায়, যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সেই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সংস্কার কিংবা সদস্যদের স্বার্থসিদ্ধির শিকারে পরিণত হয়ে সংগঠন তার মৌলিক উদ্দেশ্য থেকে দূরে চলে যায়। যদিও সেই সমস্ত সংগঠন জাগতিক মঙ্গল লাভের জন্য বানানো হয়ে থাকে তবুও কিছুকাল পর জগৎ তা থেকে উপকার লাভে বঞ্চিত হয়ে যায়। অবশ্য তাদের বাজেট বড় বড় অংকেরই হয়, অবশ্যই দৃশ্যত তারা শক্তিধরই মনে হয় তবে তাদের শিকড় শূণ্য হয় শুষ্ক হয়ে থাকে কেননা প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে তারা অনেক দূরে চলে যায়। যদিও বাজেট অনেক বড় অংকেরই হয় আর নিশ্চয় আয়ও তেমনি হয়ে থাকে তবুও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলই বাজেট থেকে লাভবান হয়ে থাকে। যদি রাষ্ট্র সমূহের সংগঠনের কথা বলা হয় তবে শক্তিধর রাষ্ট্রই তা থেকে স্বার্থসিদ্ধী করে নেয়। কিংবা শুধুমাত্র ততটুকু পর্যন্ত অন্যকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় যতটুকু পর্যন্ত দিলে শক্তিধর বড় রাষ্ট্র বা বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থে কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

অর্থাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য সেটা হয় না যে মৌলিক উদ্দেশ্যের ওপর সেই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছিল বরং নিজ স্বার্থসিদ্ধী উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সংগঠনের সূচনাকালে যে দাবি ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হয় তারা তা ভুলে যায়। বর্তমানকালে জাগতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলো জাতিসংঘ (UNO), যা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৭০ বছর পুরা হয়েছে আর তারা তা উদযাপনও করছে আর অনেক বিশ্লেষকেরা এই প্রসঙ্গে বিচার বিশ্লেষণও করেছেন, কলামও লিখা হয়েছে। তারা অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, যে মৌলিক উদ্দেশ্যের ওপর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা থেকে তারা পিছু হটেছেই বেশি, লাভ করেছে কম। জাগতিক সংগঠনের কাজ তো এমনই আর তাদের অবস্থাও এমন। তবে আধ্যাত্মিক জামাতের মাঝে যে সমস্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাদের ভিত্তি হয়ে থাকে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা। এজন্য তাদের সুখ-আনন্দ বাহ্যিকতাপূর্ণ জাগতিক হাসি-খুশি আর আনন্দে হয় না, হওয়া উচিতও নয়। অতএব, আমাদের সেই খুশি-আনন্দ অর্জন করতে হলে সেজন্য এক প্রজন্মের পর পরবর্তী প্রজন্মের আনসারকেও ধারাবাহিকতার সাথে সাধনারত থেকে নিজেদের উদ্দেশ্যকে সতেজ ও সজীব রাখতে হবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আনসারুল্লাহ সংগঠন প্রতিষ্ঠাকালে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়া দৃষ্টিপটে রেখে, যে দোয়ায় এমন এক নবীর আবির্ভাব হওয়ার জন্য যাচনা করেছিলেন যে প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন করীমে উল্লেখ পাওয়া যায়।

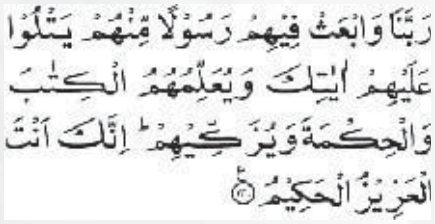
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

অর্থাৎ, "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! (আমাদের এ-ও নিবেদন) তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল আবির্ভূত কর, যে তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখাবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা, ২:১৩০)

'রাব্বানা ওয়াবআস ফিহিম রাসুলাম মিন হুম' অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল আবির্ভূত কর। ***'ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা'*** অর্থাৎ যে তাদের উদ্দেশ্যে তোমার আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করে আর তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেয় আর তাদেরকে হেকমতও শেখায় আর তাদেরকে পবিত্র করে। নিশ্চয় তিনি পরিপূর্ণ বিজয় লাভকারী আর প্রজ্ঞাবান। (খুতবাতে মাহমুদ, ২১তম খন্ড, পৃ: ২৬৫)

অতএব, এই হলো সেই উদ্দেশ্য, এই হলো সেই বাক্যাবলী, যা তিনি সামনে রেখেছেন– আল্লাহ তা'লার আয়াত পাঠ করে শুনানোকারী হও, শরীয়তের নির্দেশাবলী ও এর প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা বুঝানোকরী হও, যারা হয়ে উঠবে পবিত্রতা দানকারী। এখানে রসূল (সা.)-এর জন্য দোয়া যাচনা করা হয়েছে যে, যাকে মহানবী (সা.)-এর প্রতিবিম্ব রূপে আল্লাহ্ তা'লা আবির্ভূত করবেন আর পরবর্তীতে এ বিষয়ে সূরা জুমুআয় উল্লেখ কালে আখারীনদের মধ্যেও এমন নবী, যিনি মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক হবেন তাঁর সম্পর্কে আগমণবার্তা জানিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, আগমণকারী সেই সেবক মহানবী (সা.)-এর কাজকে অগ্রপানে চালনাকারী হবেন। আর সেই উদ্ধৃতিমূলে অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের ন্যায় আনসারুল্লাহর ওপরও এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে, তোমাদেরকেও দাওয়াতে ইলাল্লাহ-র কর্মসম্পাদন করতে হবে। কুরআন করীম পাঠ করাতে হবে, এর প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষাসমূহ বর্ণনা করতে হবে, উত্তম তরবীয়ত করতে হবে, জাতির মাঝে থেকে যাওয়া জাগতিক দূর্বলতাকে দূর করে তাদেরকে উন্নতি লাভের ক্ষেত্রে অগ্রগামী করতে হবে। অতএব, এই হলো সেই উদ্দেশ্য যেজন্য আনসারুল্লাহ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৭৫ বছর পার হওয়ার পর আমাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে, এ সব দায়িত্ব আমরা কতটা পালন করতে সক্ষম হয়েছি। এই উদ্দেশ্য আমরা কি পরিমাণ পুরো করতে পেরেছি। আমরা সত্য বিস্তারের জন্য আল্লাহর দিকে আহ্বানের শান্তিপূর্ণ এই বার্তাটিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছি কি? আমরা শিক্ষা অর্জন করার পর আমাদের বংশধরদের মাঝে সেই শিক্ষার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি কি? আমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে ও জগৎকেও

আল্লাহ তা'লার নির্দেশের মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার যে বিষয় তা জানানোর দায়িত্ব পালন করছি কি? না-কি আমরা কেবল নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার পিছনে লেগে রয়েছি। আমরা কি জামাতের অর্থ-সম্পদ আর অর্থনৈতিক অবস্থা সুষ্ঠু ও সঠিক করার জন্য স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে দায়িত্ব পালন করছি? আর বিশেষ করে এই সব (উন্নত) দেশে এসে আমরা শুধুমাত্র সাহায্যপ্রার্থী হয়ে হাত-পাতা ওয়ালাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে রয়েছি কি?

অতএব, ৭৫ বছর পুর্তিতে এখানকার আনসারুল্লাহও আর বিশ্বের অন্যত্র আনসারুল্লাহর সংগঠনগুলিরও এই হিসাব নিন যে, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা রেখেছি। এই মূহুর্তে আমেরিকাবাসীরাও এই বার্তা শুনছেন, সেখানে আনসারুল্লাহর ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর অন্যান্য স্থানেও হয়তো শুনছেন। কেবল মাত্র আনসারুল্লাহ সংগঠনের সদস্য হয়ে থাকাটাই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয় বরং সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে আমরা নিজেদের জীবন, অর্থ ও ধন-সম্পদ আর সময় কুরবানী করাই আসল উদ্দেশ্য। তবেই এক প্রজন্মের পর পরবর্তী প্রজন্ম এই মহান দায়ীত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসবে আর এ ধারা চলতে থাকবে। তবেই সাব্যস্ত হবে আমরা নিজেদের ভিত্তিমূলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম। তবেই আমরা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত হব। তবেই আমরা সত্য ধর্ম (দীনে হাক্ক)-এর পুনর্বিজয়ের এই যুগে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরীত হওয়া আনসারের মধ্যে পরিগণিত হতে পারব আর প্রকৃতই আমরা ***'নাহনু আনসারুল্লাহ'***র ধ্বনী উচ্চকিতকারী আখ্যায়িত হতে পারব।

কুরআন করীমে এই ধ্বনী আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের উদ্ধৃতি থেকে পেয়ে থাকি। একটি আয়াত তেলাওয়াতও করা হয়েছে। তবে সেই যুগে তাদের ওপর যখন দু:খ ও কষ্ট যাতনা নিপতিত রাখা হয়েছিল সেই সময়ে ঐসব লোকেরা যখন বিপদগ্রস্ত ছিল আর ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে, খ্রিষ্টীয় ধর্ম মতের ওপর, বিশেষ করে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ওপর এই কঠোরতা প্রায় তিনশত বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে আর বিভিন্ন ধরণে চালানো হতে থাকে। কঠোরতা সত্বেও তারা নিজেদের উদ্দেশ্যকে সুরক্ষা করতে থাকে আর পরবর্তীতে তিনশত বছর পর শাসকেরা খ্রিষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করলে খ্রিষ্টীয় ধর্মমত অতি গতিশীলতার সাথে বিস্তার লাভ করে, তবে সেই সাথে নিজ মৌলিক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূর চলে যায়। নিজের আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে বসে। নিজেদের সৃষ্টিকারী খোদাকে ভুলে যায়। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৌলিক শিক্ষা ও সুসংবাদ যা খোদা তা'লার একত্ব প্রতিষ্ঠিত করার শিক্ষা দিত তা ভুলে গিয়ে শির্ক (অংশীবাদিতা)-এর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। আজকাল বিশ্ব মনে করে, খ্রিষ্টধর্ম বড়ই উন্নতি সাধন করেছে। এমন উন্নতি দিয়ে কি হবে, যার উদ্দেশ্য জাগতিক চাকচিক্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া আর খোদা তা'লার স্মরণকে পর্দার অন্তরালে আচ্ছাদিত করে রাখা।

এটা সেই মৌলিক শিক্ষাকে ভুলিয়ে দেয়ার কারণে যা বর্তমানে উদাহরণ স্বরূপ পাশ্চাত্যের নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল বড় বড় চিন্তাবিদগণ এ প্রসঙ্গে বলে থাকেন যে, ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাদের স্ব-উদ্ভাবিত দর্শন তত্বের শিক্ষা গ্রহণ করায় অংশ নেয়া উচিৎ। ***'ইন্নালিল্লাহ'***! এইসব দুনিয়াদারদের ধর্মের ব্যাপারে এই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞান। যেহেতু খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ধর্ম অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর ঐরূপ আত্মগরিমাকারীদের ওপর অবতীর্ণ হয় না বরং জাগতিক সমিতি ও সংগঠন এবং নাম-সর্বস্ব ধর্মের ঠিকাদারেরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলিয়ে আল্লাহ তা'লার বিধান ও নির্দেশ বদলিয়ে ফেলতে পারে, এই ধরণের চিন্তাবিদেরা এবং দার্শনিকেরা আবার আল্লাহ তা'লার ধর্মের দাওয়াতও দেয়। এই অবস্থা বলে দিচ্ছে যে, এইসব লোকেরা পূতি দূর্গন্ধময় নোংরা পূঁজের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। কোথায় রইল সেই ঈসার অনুসারীরা যারা ***'নাহনু আনসারুল্লাহ'***র ধ্বনী উচ্চকীত করেছিল ও খোদা তা'লার নির্দেশাবলী পালন করার অঙ্গিকার করেছিল। যারা এই অঙ্গিকার করেছিল যে, আমরা তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করেছি, আর তা প্রতিষ্ঠায় সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। আর আজ কোথায় এইসব লোকেরা, যারা শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে। নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ডুবেও গেছে আর তলীয়েও যাচ্ছে অনবরত। তাদের লক্ষ্য শুধু আর কেবলমাত্র পার্থিব উপার্জন আর ধর্মকে স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছার সাঁচে সাজানো, ধর্মীয় অনুশাসনের অধিনে চলা নয়।

খ্রিষ্ট ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার এই অনুসারীদের প্রসঙ্গ আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে এভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

(সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৩-৫৪)

অর্থাৎ- "অতএব, যখন ঈসা (আ.) তাদের মাঝে, সাধারণ লোকদের মধ্যে অস্বীকারের প্রবণতা দেখলো, অনুধাবন করলো, সে বললো, আল্লাহ তা'লার দিকে আহ্বান করতে 'কে আমার 'আনসার' (সাহায্যকারী) হবে?' হাওয়ারীরা বললো, 'আমরা আল্লাহর আনসার'। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। আর সেই কথার সাক্ষি হয়ে যাও যে, আমরা আনুগত্যকারী বা মান্যকারী।

(এই আমাদের প্রার্থনা) হে আমাদের প্রভু! আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, তুমি যা অবতীর্ণ করেছ। আমরা রসূলকে মান্য করেছি, আনুগত্য করেছি। অতএব আমাদেরকে সত্যের সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে গন্য করে নাও।"

অতএব, এরা সেইসব লোক যারা হাওয়ারী হওয়ার মর্যাদা পুরা করেছে। যারা ***'আমান্না বিল্লাহ'***এর ঘোষণা দিয়েছে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, আমরা আনুগত্যকারীদের মধ্যে রয়েছি, আমরা আল্লাহ তা'লার আদেশের প্রতিপালন করতে থাকবো।

জাগতিক আকর্ষণ আর পার্থিব সমস্যা-সঙ্কট আমাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরাতে পারবে না। তারা শির্ক থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেয়ার সাথে ***'রাব্বানা আমান্না'***-এর ধ্বনী উচ্চকীত করে সেই সাথে বলে,

হে আমাদের রব! আমরা সেই সব কথার ওপর ঈমান এনেছি, সেই শিক্ষাগুলো মান্য করেছি, যা তুমি তোমার নিজের রসূলের মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছ। অতএব, এরা ছিল সেই সকল লোক, যাদের ইহলোক থেকে পরজগতের প্রতি অধিকতর চিন্তা-ভাবনা ছিল। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা ও আকাঙ্খা ছিল। তারা রসূলের আজ্ঞাবাহী হওয়ার ঘোষণা দেওয়াতে তাকে (ঈসা আ.) প্রেরণ করা হয়েছে, যখন তারা ***'নাহনু আনসারুল্লাহ'*** অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার সাহায্যকারী ঘোষণা দিয়েছে আর সেই কথাটিকে সংরক্ষণ করে আল্লাহ তা'লা আমাদের জন্য ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার রায়টি বিধানরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই কথাটি ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, কাদেরকে আল্লাহ তা'লার সাহায্যকারী বানানো যেতে পারে। এ কথাটি বুঝার জন্য যে, আনসারুল্লাহ কে? আয়াত (আলে ইমরান: ৫৩) টিতে অবতীর্ণ 'হাওয়ারী' শব্দটি বুঝে নেয়া উচিৎ, তা জানা আবশ্যকও বটে। এ শব্দটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। আনসারুল্লাহ হওয়ার তাৎপর্যগত বিশেষত্ব ঐ শব্দটি বুঝতে পারলে বৃদ্ধি লাভ করবে।

এই শব্দের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারলে আল্লাহ তা'লার সাহায্যকারী হওয়ার উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়। এই শব্দের মর্মার্থ সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারলে তবেই ***'নাহনু আনসারুল্লাহ'***র গভীর মর্মার্থ অনুধাবন করে মানুষ এই ধ্বনী উচ্চকীত করে ঘোষণা করতে পারে। অতএব, হাওয়ারী শব্দের অর্থ বুঝতে পরিধেয় পোশাকের অন্তরর্বস বুঝে নেবার আবশ্যকতা আমাদের রয়েছে। হাওয়ারীর কয়েকটি অর্থ রয়েছে, একটি অর্থ হলো যে, কাপড় ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে উজ্জলতা বাড়িয়ে দেয়া। এর আরেক অর্থ হলো, যাকে বিধৌত করা হবে তাকে সর্বপ্রকার মন্দ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন দেখানো। এর আরেক অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি, নিষ্ঠায় যে পরিপূর্ণ আর বিশ্বস্ত। এর আরেক অর্থ হলো, এমন ব্যক্তি, যে নিজ মহলে বিশ্বস্ততায় ও ঈমানদারীতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রূপে সাব্যস্ত। এর আরেক অর্থ এই যে, সত্যবাদীতা, সততা ও বিশ্বস্ততায় নিয়মনিষ্ঠ ও খ্যাতিমান। এর আরেক অর্থ হলো, নবীর বিশ্বস্ত ও বাছাইকৃত সঙ্গী, বিশেষ সম্পর্ক রক্ষাকারী সঙ্গী-সাথী। এর সপ্তম আরেকটি অর্থ হলো এই যে, দৃঢ় ও পাক্কা সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষাকারী যা কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। অতএব, এক ব্যক্তি যখন এই সব বৈশিষ্টের অধিকারী হবে তবেই সে প্রকৃত হাওয়ারী আখ্যায়ীত হবে আর তবেই সে 'নাহনু আনসারুল্লাহ'র হক আদায়কারী হবে।

অতএব, এইসব বিষয়াদী সামনে রেখে প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারে যে, ***'নাহনু আনসারুল্লাহ'***র ধ্বনী উচ্চকীত করায় সে কতটা সত্যবাদী। হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহায্যকারীরা হাওয়ারী আখ্যায়ীত হয়েছে, কেননা তারা ঐসব বৈশিষ্টের অধিকারী ছিল অথবা ঐসব বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়ার জন্য অঙ্গিকারকারী ছিল। এবং সেইসব বৈশিষ্ট লাভ করার জন্য প্রচেষ্টারত ছিল, যারা নিজেদের অভ্যন্তরস্থ ময়লাগুলোকেও ধুয়েছে, তাকওয়া সৃষ্টি করেছে আর অন্যদের অন্তরের ময়লাও বিধৌত করার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আর পরবর্তীতে আল্লাহ তা'লাও তাদের ঈমান বাড়াতে ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার কারণে তাদেরকে মন্দ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

কিন্তু এই বিশেষত্ব যখন লোপ পেয়ে গেল তাদের নিজেদের জাগতিক উন্নতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়তে লাগলো। নিজেদের বংশধরদের মধ্যে পূণ্যকর্ম সচল রাখায় দূর্বলতা দেখা দিতে লাগলো। তৌহিদের পরিবর্তে শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল, এতে আল্লাহ তা'লাও তাদেরকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিলেন।

সুতরাং, আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ, বছর পেরিয়ে যাওয়া কিংবা জুবিলী উদযাপন থেকে উপকৃত তখনই হবো যখন আমরা এর বৈশিষ্ট্যগুলোকে মরতে না দিই। নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থান কখনই নিচু হতে না দিই। নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধিকারী হোন, যেন আমরা নিজেদের শিক্ষা ভুলে না যাই, যেন আমরা এই ঘোষণা করতে পারি যে, আমরা নবীর সাথে বিশ্বস্ততার যে অঙ্গিকার করেছিলাম সেই আত্মত্যাগ আমরা করেছি। সর্বাবস্থায় সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে রত থাকব আর জগতের কোন লোভ-লালসা আমাদেরকে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে পিছু হটাতে পারবে না।

মুসায়ী মসীহ (আ.)-এর মান্যকারীদের সাথে আল্লাহ তা'লার তো এই ওয়াদা ছিল না যে, তারা যে শিক্ষার ওপর আমল করেছে তা কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্বরূপে স্ব-অবস্থানে টিকে থাকবে কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের সাথে খোদা তা'লার তো এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, যে শিক্ষা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন আর যাকে পুনরায় এক যুগ-কাল অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যাবতীয় সৌন্দর্য ও

বৈশিষ্ট্য সমেত জগৎ সমক্ষে তুলে ধরেছেন এই শিক্ষামালা এখন কেয়ামতকাল পর্যন্ত সচল এবং অব্যাহত শিক্ষারূপে নির্ধারিত রয়েছে।

অতএব, খ্রিষ্টানরা নিজেদের শিক্ষাকে ভুলে গেলেও আর হাওয়ারীদের পরম্পরা নি:শেষ হয়ে গেলেও আর এটাই ছিল তাদের পরিণাম, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারী আর তার (আ.) জামাতের কেয়ামতকাল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃতি লাভ করা ও বৃদ্ধি পাওয়া অবধারিত হয়ে আছে, ইনশাআল্লাহ তা'লা।

এ কারণে তার (আ.) জন্য 'নাহনু আনসারুল্লাহ'র ধ্বণী উচ্চকিতকারী হাওয়ারীদের সর্বদাই পাওয়া যেতে থাকবে। তবে প্রত্যেক যুগের আহমদী, যারা আনসারুল্লাহ সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত তাদেরও এই আত্মবিশ্লেষণের আবশ্যকতা রয়েছে, তারা কি সেই সুন্দর পরিনামের অংশে পরিনত হতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যা মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ ও প্রকৃত আনুগত্যকারীদের জন্য ও মু'মিনদের জন্য অবধারিত রয়েছে। আমরা কি আত্মশুদ্ধিতে রত আছি, আমরা কি নিজেদের অন্তরের কালিমা পরিস্কার করছি, আমরা কুরআন করীমের প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষামালা শিখে নিয়ে বিশ্বস্ততার সাথে আত্মস্থ করছি কি, নিষ্ঠাপূর্ণভাবে তা প্রতিপালন করছি, আমাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার স্তর ঊর্ধ্বপানে এগিয়ে চলছে কি, আমরা কি নিজেদের বংশধরের তরবিয়তের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছি, আমরা কি নিজেদের বয়আতের অঙ্গিকার অনুযায়ী মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে নিজেদের সম্পর্ক জাগতিক সকল সম্পর্কের চেয়ে বড় মনে করি, আমরা ধর্মীয় বিষয়াদিতে ও জাগতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে খোদা তা'লাকে হাজির-নাযির জেনে ঈমানদারী ও নিষ্ঠার সাথে নিজেদের পরামর্শ দেয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি কী!

অতএব, আমরা এই মাপকাঠিতে নিজেদের যখন যাচাই করব তখন আপনা থেকেই আমাদের সর্ব প্রকার মানগতঅবস্থান আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে যাবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর ৪০ বছর থেকে উর্ধ্ব বয়সী জামাতের সদস্যদের প্রতি এই অনুগ্রহ রয়েছে যে, তিনি আপনাদের সংগঠনের নাম 'আনসারুল্লাহ' রেখেছেন, কারণ, এই বয়সে পদার্পনকারী মানুষেরা সব দিক থেকে পরিপক্কতা লাভ করায় নিজেদের চিন্তা-চেতনায় আর বিশ্লেষণ ক্ষমতায় জামা'তের জন্য উত্তম সত্তায়- বা ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারে। নিজেদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে যুবা প্রজন্মদের জন্য তরবিয়তের মাধ্যম হতে পারেন। 'আনসারুল্লাহ' শব্দাবলী এই ধরাণা ও আস্থা দিয়ে থাকে আমাদেরকে আল্লাহ তা'লার সাহায্যকারী হতে হবে। আমাদেরকে খোদা তা'লার ভালোবাসায় ও তাঁর ধর্মের বিস্তারে ও প্রতিষ্ঠায় সর্ব প্রকার কুরবানী করতে হবে। আল্লাহ তা'লার নির্দেশ সমূহের ওপর আমলও করতে হবে এবং নিজেদের বংশধরদেরকেও এর তাৎপর্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার কথা জানিয়ে বুঝিয়ে আমল করার জন্য উপদেশ ও চেষ্টা চালাতে হবে। ধর্মের বাণী পৃথিবীর প্রান্ত সমূহে পৌঁছানোর জন্য মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ***'ম্যাঁয় তেরি তবলীগ কো জমিন কে কিনারোঁ তাক পৌঁহ্‌চাউঙ্গা'*** (তাজকেরা পৃ: ২৬০, ৪র্থ সংস্করণ, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)।

আর সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ তা'লা অবশ্যই পৌঁছাবে আর পৌঁছে যাচ্ছেও। তবে আপনারা যদি এতে অংশ গ্রহণ করতে নিজেরা সচেষ্ট হোন তাহলে খোদা তা'লার আশিসধারায় আপনারাও অভিসিক্ত হবেন। নিশ্চয় এটাও খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, দাওয়াতে ইলাল্লাহ যখন দুনিয়ার প্রান্তসমূহে পৌঁছাবে, তো এর ফলে এক সুপ্রভাবও সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ তা'লার বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিণামে আল্লাহ তা'লা ও তাঁর রসূলই বিজয়ী হবেন। কিন্তু আমরা কতই সৌভাগ্যবান হবো যে, আমরা সেই বিজয়ের ভাগিদার হব। স্মরণ রাখুন, আল্লাহ তা'লা যেমন বলেছেন,

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ

(সূরা মুজাদেলা, ৫৮:২২)। আল্লাহ তা'লা লিখে রেখেছেন যে, আমি এবং আমার রসূল বিজয় লাভ করব। তো আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে যেখানেই তাঁর কাজ সম্পাদনের জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন পড়বে সেখানে তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ও তার খলীফাগণের জন্য আনসারদের যোগান দিতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ তা'লা। তবে এটা আপনাদের জন্য শর্ত রয়েছে যে, হাওয়ারী সুলভ সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটিয়ে এর কতটা অংশীদার হতে পারেন। সামনে অগ্রসর হয়ে ***'নাহনু আনসারুল্লাহ'র*** মর্ম উপলব্ধি করতে পারলে তবেই আল্লাহ তা'লার আশিস ও অনুগ্রহ আকর্ষণকারী হতে সক্ষম হবেন।

যেভাবে আমি বলেছি, খ্রিষ্ট-ধর্ম বিস্তারের সাথে সাথে তাদের মাঝে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় বিভ্রান্তি শুরু হয়ে যায় কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে আমাদেরকে আহমদীয়াতের বিস্তার লাভের যে সুসংবাদ দিয়েছেন তা হলো তিন শত বছর পূর্ণ হবে না যখন আহমদীয়াত বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। (পরিশিষ্ট তাজকেরাতুশ শাহাদাতাইন, খন্ড ২০, পৃ: ৬৭)

তাই এ প্রসঙ্গে আশ্বস্তও করেছেন যে, খেলাফতের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কল্যাণে আল্লাহ তা'লা পুরস্কৃত করতে থাকবেন। আর ধর্মীয় বিভ্রান্তি বা অবক্ষয় ইনশাআল্লাহ তা'লা ঘটবে না বরং ধর্মের উন্নতি দৃশ্যমান হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের জাগতিক উন্নতি, ধর্ম, রাজত্ব বা রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে দূরে অবস্থান করায় বা ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য নয় বরং ধর্মকে জাগতিকতা বা পার্থিব বিষয়াদীর ওপর প্রাধান্য দেয়াতে হবে। বাদশাহদের নিজেদের রাজত্ব হারানোর ভয়-ভীতি বা শঙ্কা হবে না বরং তারা তাঁর (আ.) পরিধেয় বস্ত্র থেকে কল্যাণ লাভকারী হবে। তারা (বাদশাহরা) তাঁর (আ.) শিক্ষা প্রতিপালনকারী হবে। সেই যুগও ইনশাআল্লাহ তা'লা এসে যাবে, যখন বাদশাহ বা রাষ্ট্র নায়কেরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করতে বাধ্য হবে। এখন আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো একে উচ্চাকাঙ্খা ভাবতে পারেন কিংবা আমাদের বিরুদ্ধবাদী কিছু লোক একে আমাদের উচ্চাকাঙ্খা বুঝবেন বা এক উচ্চাভিলাষ মনে করবেন যে, ছোট্ট এই জামাত কী জয়োধ্বনী উচ্চকীত করে চলছে। তবে, আমরা আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস ও এর সূচনাকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বুঝতে পারি, আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ আশিস অবলোকন করে আমাদের ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে।

অতএব, এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নাই যে, এটা কেমনে হবে, এটা ইনশাআল্লাহ তা'লা হবে আর অবশ্যই ঘটবে। প্রতিটি দিন ছোট ছোট যে সফলতা দেখিয়ে চলছে তা আমাদেরকে সে প্রসঙ্গে গভীরভাবে আশ্বস্ত করছে যে, তোমাদের এই ছোট ছোট সফলতাগুলো, তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে অর্জিত হওয়ার ছিল না, যা জাগতিক দৃষ্টিতে ছোটই ভাবা হচ্ছে। আজকালকার এই ছোট সফলতাগুলোও আমাদের জন্য আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমরা যদি দেখি তবে এটা অনেক বড় সফলতাই। আর আমরা এতে আনন্দিত। কিন্তু জগৎ ভাবে, এ তো তুচ্ছ এক সফলতা। কিন্তু এটা যত তুচ্ছ সফলতাই হোক যেমনটা আমি বলেছি এটা আমাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টার কারণে লাভ হয় নাই এ কেবলই আর কেবল মাত্র আল্লাহ তা'লারই অনুগ্রহের মাধ্যমে লাভ হয়েছে। তিনি যাবতীয় শক্তির অধিকারী। তিনি যখন চাইবেন, জগৎ যে সফলতাকে বড় ভাবে সেই বড় সফলতাও তিনি আমাদের পদতলে এনে দিবেন, ইনশাআল্লাহ্ ।

কিন্তু আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে বিষয়, তা হলো অতিবাহিত প্রতিটি বছরের সেই হিসাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারী হওয়া যে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ধর্মে উন্নতি লাভ করা আর সেই উদ্দেশ্য আমরা কতটা অর্জন করেছি। আমাদের পা যদি সম্মুখপানে অগ্রসর না হয় আর আমরা একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকি তবে আমরা নামমাত্র আনসারুল্লাহ। আমাদের নিজেদের ইবাদতের মান পরখ করে দেখা উচিৎ। আমাদের নিজেদের কুরবানীর মান যাচাই করতে হবে, আমাদের নিজেদের কর্ম ও নৈতিক চরিত্রের মান পরখ করে দেখতে হবে। আমাদের নিজেদের নেয়া সেই পদক্ষেপ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো যাচাই করতে হবে যা ধর্ম বিস্তারের জন্য আমরা করে চলছি।

আমি এক খুতবায় জামাতে আগমণকারী নতুনদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলাম যে, এক ব্যক্তি মুশরেক থেকে আহমদী হয়েছে কিন্তু পুরো গ্রামই মুশরেক ছিল, যখন আহমদী হলো, আর আহমদী হওয়ার পর তার অন্তরে একত্ববাদের শিক্ষা এতই প্রভাব বিস্তার করলো, এত সহজ সাবলিলভাবে সে বলতে লাগলো আগে তো আমার খোদার প্রতি বিশ্বাসই ছিল না আর বর্তমানে অবস্থা এমনই যে, অন্তরে একত্ববাদ বা তৌহিদ এমনভাবে সরব হয়ে রয়েছে যে, প্রথমে ধারণা এই ছিল প্রতিমা ছাড়া আমি খোদা পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হবো না অথবা মুর্তিই সব কিছু আমার কার্য সম্পাদনকারী কিন্তু বর্তমানে আমার হৃদয়ে তৌহিদ এমনভাবে সরব হয়ে আছে যে, খোদা তা'লার ইবাদতের প্রতি এমনভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে যে, খোদা তা'লার জন্য আমার অন্তর নিষ্ঠায় এমন হয়ে আছে যে, সে বলছে আমি আমার বয়আতের ফরম পুরণ করছিলাম এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ায় আমার হৃদয় থেকে এক ধ্বনী নির্গত হয়ে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করে বলে উঠলো যে, কাজকর্ম ছাড় আর নামায আদায় কর, নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে। অতএব, এই হলো সেইসব লোকদের অবস্থা যাদেরকে আল্লাহ তা'লা 'আনসারুল্লাহ'-এর অবয়বে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে দান করে চলছেন।

এখন নিজেরা নিজেদের হিসাব-নিকাশ করে নিন যে, কতটা কী! একটি দেশের মজলিসের আমি হিসাব নিচ্ছিলাম, সদর সাহেব খুবই বড়াই করে জানাচ্ছিলেন যে, আমাদের সদস্যরা নামাযে দূর্বল ছিল মাত্র ১০ শতাংশ বা'জামাত নামায আদায় করতো। তিন মাস পর্যন্ত আমরা বিশেষ এক প্রচেষ্টা চালানোর পর তা ৭০ শতাংশ হয়ে গেছে। আমি পরিষ্কারভাবে শুনতে পাইনি তার বলার এই ঢং থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, খুবই আনন্দের সাথে জানাচ্ছেন, সম্ভবত ৭০ শাতাংশই বলেছেন, আনসারুল্লাহর মর্যাদার দিক থেকে তা-ই যদি হয় তবে তা অসাধারণ সফলতা নয় বরং ৭০ শতাংশ তো খুবই লজ্জার কথা তা-ও আবার এক বিশেষ প্রচেষ্টা চালানোর পর যদি নিজেদের গঠনকালের মৌলিক উদ্দেশ্যই স্মরণ রাখা না হয় বা স্মরণ না রাখেন যে জন্য আল্লাহ তা'লা বিশেষভাবে কুরআন শরীফে তাগিদ প্রদান করেছেন তাহলে আনসারুল্লাহর আরও দায়িত্বাবলী কী করে পালন করা হবে। নিজেই যদি আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ তা'লার কিতাবের ওপর আমল করা না হয় তবে অপরের তরবিয়ত কি করে করা যাবে। ৭৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বা'জামাত নামাজের উপস্থিতি ৮০/৯০ শতাংশ হলে নামাযের উপস্থিতিতে আমাদের ১৫/২০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটলে এটা উন্নতি নয় বরং ধ্বংস, অধঃপতন, বড়ই দু:শ্চিন্তার কথা, খুবই ভয়ের ব্যাপার। বাহ্যত জামাত বিস্তার লাভ করছে। এক স্থানের সদস্যরা যদি দূর্বলতা দেখায় খোদা তা'লা অন্য স্থানে সত্যিকারের নিবেদিত প্রাণ বান্দা সৃষ্টি করে দেন। যেমনটা আমি বলেছি, এটি একটি উদাহরণ যা আমি দিলাম। এমনই আরো উদাহরণ রয়েছে।

আল্লাহ তা'লা যখন বলেন, 'আমি এবং আমার রসূল বিজয়ী হব' তাহলে এর উপায় উপকরণও তিনিই সৃষ্টি করে থাকেন। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি তা করেও যাচ্ছেন। তাঁকে ইবাদতকারী দান করছেন ও তাঁকে তাঁর (আল্লাহর) বার্তা অগ্রে পৌঁছানোকারীও দান করেছেন। কেমন আর কি ধরণের মানুষ আল্লাহ তা'লা দান করে চলছেন, তাদের মাঝে কিভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করছেন, কিভাবে তারা নিজ সত্ত্বাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৌঁছানোর কাজে সমর্পণ করে চলছেন, কিভাবে আল্লাহ তা'লা পবিত্র স্বভাবের লোকজনকে ধরে ধরে আমাদের কাছে টেনে আনছেন আবার তাদের থেকে দাওয়াতে ইলাল্লাহর কাজও নিচ্ছেন, এর একটি ঘটনা এবারে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আইভোরিকোষ্ট-এর অধিবাসী 'ভাই মুহাম্মদ' নামী এক বন্ধু চাকুরীর কারণে সেখানকার এক শহরে আসেন, (মুমিন) বিশ্বাসী ছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি আহমদীয়া মসজিদে জুমুআর নামায পড়েন আর প্রথমবারের মত আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে ঐ শহরে অবস্থানকালে ভদ্রলোক নিয়মিতভাবে আমাদের মিশনে আসতেন আর জামাতের অনুষ্ঠানাদিতে উৎসাহের সাথে অংশ নিতেন, নিয়মিতভাবে চাঁদাও দিয়েছেন, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী বয়আত করেন নাই, পরবর্তীতে তার চাকুরীর চুক্তি শেষ হলে তিনি আবিদজান, সে দেশের রাজধানী, সেখানে ফিরে গেলেন। কিন্তু জামাতের সাথে তিনি নিয়মিতই যোগাযোগ রাখতেন। তিনি ২০১৪ সনের আইভোরিকোষ্ট-এর জলসার ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করেছেন কিন্তু তবুও বয়আত করেন নাই। ২০১৫ সনে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ভদ্রলোক ফ্রান্সে এলেন বা বলা যায় তাকে আল্লাহ তা'লাই ফ্রান্সে আসার সুযোগ দিয়েছেন। সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পুর্বে তিনি ফ্রান্স মিশন হাউসের ঠিকানা সংগ্রহ করে নেন। সেখানকার মিশন ও জামাতের সদস্যদের সাথে তিনি যোগাযোগ রাখেন। ফ্রান্সে

অবস্থানকালে জার্মানীর জলসা অনুষ্ঠানের বিষয় জানতে পেয়ে তিন দিনের ছুটি নিয়ে তিনি জার্মানীতে চলে যান। জলসায় যোগ দেন, তিন দিন ধরে তিনি জলসায় রইলেন এরপর বলতে লাগলেন যে, যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ আর ভ্রাতৃত্ব তিনি অবলোকন করেছেন তা থেকে তিনি যা বুঝেছেন তা বর্ণনাতীত এক বিষয়। এরপর আমার বক্তৃতার কথাও উল্লেখ করে বলে, তিনি আমার অন্তরে বড়ই প্রভাব বিস্তার করেছেন। বলেন, আমি আমার নিজের জীবনে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন উপলব্ধি করছি এবং জলসায় যোগদান করে সেখানেই সে বয়আত করে নিল। সে আরও বলে, আমি আপনার ইচ্ছানুসারে আইভোরিকোষ্টে আহমদীয়াতের বিস্তার ও উন্নতির জন্য কাজ করবো এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় এই সুসংবাদ পৌঁছাতে থাকবো। অতএব, এই হচ্ছে সেই পবিত্র হৃদয়, যে অন্তর 'আনসারুল্লাহ' ধারণ করে।

এরপর গ্যাম্বিয়ার এক ভদ্রলোক, যার বয়স ৭২, আনসারুল্লাহরও শেষ পর্যায়, তিনি বলেন, এ বছর তিনি রেডিও-তে প্রচারিত জামাতের অনুষ্ঠান শুনে জামাতের বিষয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বয়আত করার পর এই বৃদ্ধ উদ্দীপনাপূর্ণ দায়ীইলাল্লাহ্-য় পরিণত হোন। আর বয়সে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দাওয়াতে ইলাল্লাহর জন্য ১৮ থেকে ২০ কি:মি: পথ প্রতিদিন পায়ে হেটে প্রকাশ্যভাবে জোরে-শোরে দাওয়াতে ইলাল্লাহ করেন। এমনিতে তিনি পড়া-লেখা জানেন কিন্তু জামাতি লিফলেট তিনি সাথে নেন, প্রথমে তিনি নিজে (লিফলেটটি কাউকে দিয়ে পড়িয়ে) শুনেন, অতঃপর শোনা সেই কথা অন্তরে গেঁথে নেন, এরপর তিনি লিফলেটগুলো বিতরণও করেন। মুসলমান লোকদের তিনি বিশেষভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ও খতমে নবুওয়ত বিষয় বস্তু সম্বলিত প্যামফ্লেট পড়ার বিষয়ে জোর দেন আর সেই সাথে বলে থাকেন যে, দোয়াও কর যাতে তিনি তোমাকে পথ দেখান। যখন থেকে সে আহমদী হয়েছে সেই থেকে সে আড়াই হাজার প্যামফ্লেট বিতরণ করেছে, তবে আল্লাহ তা'লার দয়া যে, তার নিজের আগ্রহ, দোয়া আর লাগাতার পরিশ্রমের কারণে এ পর্যন্ত কেবলমাত্র সে একাই সাতশ'এরও বেশি সদস্যকে তার নিজস্ব দাওয়াতী ইলাল্লাহ-র প্রচেষ্টায় আহমদীয়াতে অন্তর্ভূক্ত করা সম্পন্ন করে ফেলেছে।

আরও এক ভদ্রলোক শেখ জাভেদ সাহেব, তিনি সবেমাত্র গত বছর বয়আত করেছেন। কুরআন করীম সরবরাহের ব্যবসায়ী মু'মিন ছিলেন। গ্যাম্বিয়ায় তাকে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় আর পার্টটাইম মোয়াল্লেম হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বলেন, এরপর আমি স্বপ্নে দেখি, খুবই সুন্দর আর আলোকোজ্জল এক সত্ত্বা যে তাকে বলছে যে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, নিজের ইবাদত ও কাজকর্ম আরো বাড়িয়ে দাও, নিজের ইবাদত ও কাজকর্ম আরো বাড়াও। অতএব সে খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্-য় লেগে থাকলো। দাওয়াতে ইলাল্লাহর উদ্দেশ্যে কয়েক কি:মি: পথ কয়েক ঘন্টা ধরে পায়ে হেটে সে সফর করত। তার মাধ্যমে নতুন নতুন জামাত গঠিত হচ্ছে। আর সেও প্রায় দুইশ'-এর বেশি ব্যক্তিকে আহমদীয়াতের সুসংবাদ পৌঁছিয়ে তাদেরকে জামাতে অন্তর্ভূক্ত করিয়েছে এবং এখন যারা সামিল হতে যাচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তা'লার কৃপায় আর্থিক কুরবানীর মধ্যেও অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে, আর এরই মাধ্যমে তারা জামাতের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

আর এমন লোকেরাই পরবর্তীতে আসছে, কিন্তু নিজেদের সময় নষ্ট হওয়ার বিষয় উপলব্ধি করে নিজেদের ইবাদতের মধ্যেও আর দাওয়াতে ইলাল্লাহর কাজেও নিবিষ্টচিত্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা তাদের ঈমান ও আখলাকে বৃদ্ধি দান করতে থাকুন আর আমাদের মধ্যে যারা দূর্বল যাদের গৃহে আহমদীয়াত কোন ঘটনাচক্রে এসে গেছে বরং বাপ-দাদা থেকে এসেছে তারা নিজেদের সত্তাগত অবস্থানে নিজেদেরকে সেই স্থানে আনতে চেষ্টা করুন, যেখানে আমাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দেখতে চান।

আমি নামায বা-জামাত আদায় প্রসঙ্গে এখনই কথা বলেছি, তবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের জন্য কী মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বা'জামাত নামায আদায় করাতো ফরয। সুস্থ্য একজন পুরুষের জন্য তা আদায় করা জরুরী। তিনি (আ.) এক স্থানে তাঁর নিজের জামাতের সদস্যদের প্রসঙ্গে বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে চেষ্টা করুন" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ: ১৩৪)। আর এখন আপনারা আনসারদের বয়স তো এমন যাদের বিশেষভাবে এদিকে মনোনিবেশ করার আবশ্যকতা আছে আর মনোযোগ দেয়া উচিত। এই কথার ওপর সন্তুষ্ট না থেকে যে আমরা ১৫ শতাংশ সদস্যদেরকে বা'জামাত নামায পড়িয়েছি। স্থানীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র আমেলা সদ্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বা'জামাত নামাজ আদায়ে মনোনিবেশ করা হলে তা ৩৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উপস্থিতি তো এ থেকেই বেড়ে যায়। আর আনসার এই ব্যাপারে নিজেদের আদর্শ দেখালে খোদ্দামতো নিজে থেকেই তাদের নমূনা দেখে আমল করতে শুরু করে দিবে। যদি নিজেই আমল না করে তবে অন্যকে কি উপদেশ দিবে!

তিনি (আ.) অন্য এক স্থানে জামাতকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "খোদা তা'লা অত্যন্ত দয়ালু, তাঁর কৃপার বিশাল এক সমুদ্র রয়েছে যা কখনও নি:শেষ হওয়ার নয়। এর অন্বেষণকারী আর এর মুখাপেক্ষি কখনই বঞ্চিত থাকে না, এ জন্য তোমাদের উচিত রাতের বেলায় জেগে উঠে দোয়া ভিক্ষা করা, তাঁর অনুগ্রহ ও আশিষ যাচনা করা" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৪)।

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ তা'লা কুরআন মজিদে বলেন,

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

(সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৬)। [অর্থাৎ, "(স্মরণ কর) আল্লাহ্ যখন বললেন, হে ঈসা নিশ্চয় আমি তোমাকে (স্বাভাবিক) মৃত্যু দিব এবং আমার দিকে তোমাকে উন্নীত করবো। আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের (দোষারোপ) থেকে তোমাকে পবিত্র সাব্যস্ত করবো এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত পর্যন্ত প্রাধান্য দান করবো। এরপর আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মাঝে সেসব বিষয়ে মীমাংসা করবো যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করে আসছিলে।"

তিনি বলেছেন, 'সাহায্যের সান্তনা দানকারী

এই প্রতিশ্রুতি জন্মগ্রহণকারী ইবনে মরিয়মের জন্য দেয়া হয়েছিল তবে আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে, ঈসা মসীহর নামে আবির্ভূত ইবনে মরিয়মকেও ঐ বাক্যাবলীর দ্বারাই সম্বোধন করে সুসংবাদ দান করেছেন।' অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কেও একই বাক্যাবলী দ্বারা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, "এখন আপনারা বুঝে নিন যে, যারা আমার সাথে সম্পর্ক রেখে সেই মহান প্রতিশ্রুতি ও শুভসংবাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে চান তারা কি তেমন লোক হতে পারেন যারা অবাধ্যতার স্তরে পতিত হয়ে রয়েছেন, নিরর্থক ও ছিদ্রান্বেষণের পথে নিয়োজিত রয়েছেন? নয়, অবশ্যই নয়" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)।

অতএব, আমাদের জন্য জরুরী যে, আমরা নিজেদের নৈতিকতায় ও আমলে উন্নতি সাধন করি আর তাকওয়ার পথ অবলম্বন করি যাতে খোদা তা'লার সাহায্য ও ভালোবাসার কল্যাণ আমাদের লাভ হয়। সুতরাং আজ আনসারুল্লাহর ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার প্রকৃত কল্যাণ থেকে লাভবান হতে চাইলে বা এই উৎসব উদযাপনে আমরা আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতাভাজন বান্দা হতে হলে 'আল্লাহ তা'লার প্রেরীত'-এর কথা মান্য করে এর ওপর আমল করি। নিজেদের অন্তরগুলো নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'লার জন্য বানিয়ে নেই, এরই মাঝে সফলতা যে, একে অপরের সাথে নেক কর্মে অগ্রগামী থাকতে চেষ্টা করি আর সেই সফলতার জন্য অংশে পরিণত হই যার সুসংবাদ আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন।

আমেরিকাতেও আজ আনসারুল্লাহ ইজতেমা হচ্ছে, যেমনটা আমি উল্লেখ করেছি, আরো কোন কোন দেশেও হচ্ছে। প্রত্যেক স্থানের আনসার নিজেদের দায়িত্বাবলী উপলব্ধি করুন, নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করুন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন, তারা এ কথা নোট করে নিন আর নিজেদের স্থানে ফেরত গিয়ে নিজেদের নাসেরদের জানিয়ে দিন, আর তাদের যেসব আনসার এখন শুনছেন তাদেরকেও জানিয়ে দিন, আর আমার ধারণা দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানেই এখনই শুনছে। নিজেদের আমলী অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিন, কুরআন করীমের শিক্ষা সমূহ যেভাবে নিজেদের ওপর কার্যকর করবেন তেমনি পরবর্তী বংশধরদের জন্যও চিন্তা-ভাবনা করে তাদেরকেও এই কল্যাণের সাথে সংবদ্ধ রাখুন যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুরস্কার রূপে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এই যুগে দান করেছেন আর সৎকর্মে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে অংশ নিতে সচেষ্ট হোন। জন্মগত আহমদী এই প্রচেষ্টায় থাকুন যে, আমাদেরকে নব আগমণকারীদের চেয়ে নেকিতে অগ্রগামী থাকতে হবে আর নব আগমণকারীরা এই চেষ্টায় থাকুন যে আমরা পুরনোদেরকে নেকিতে পিছনে ফেলবো।

আমেরিকার আনসার এই চেষ্টায় থাকুন যে, আমরা প্রকৃতই আনসারুল্লাহ হয়ে যুক্তরাজ্যের আনসারদেরকে পিছনে ফেলে দেই আর যুক্তরাজ্যের আনসার এই চেষ্টায় রেগে থাকুন যে, আমরা দুনিয়ায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাসেরকে প্রতিটি দিক থেকে পিছনে ফেলে দিব আর নেকিতে ক্রমেই এগিয়ে যাব আর একইভাবে জার্মানী, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, আইভোরিকোষ্ট আর অন্যান্য দেশ সমূহের আনসার এই প্রচেষ্টাকারী হোন যে আমাদেরকে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য আনসারুল্লাহর হক আদায় করতে হবে। ইবাদতে উন্নতি করতে হবে, নেকী বাড়াতে হবে, নিজেদের বংশধরদের তরবীয়তে উন্নতি করতে হবে, আর এই আত্ম-উপলব্ধি সৃষ্টি হলে তবেই আপনারা ডায়মণ্ড জুবিলী উদযাপনের হক আদায় করবেন, আল্লাহ তা'লা করুন এই ৭৫ বছর পরবর্তী আধ্যাত্মিক আর আমলী উন্নতীর জন্য নতুন মাইল ফলক সাব্যস্থ হোক আর আনসারুল্লাহ প্রকৃতই আল্লাহ তা'লার সাহায্যকারী হওয়ার হক আদায়কারীতে পরিণত হোক।

আল্লাহ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আসুন দোয়া করে নেই। আমীন!

(আল ফযল, ইন্টার ন্যাশনাল ১৬ অক্টোবর, ২০১৫, ৪২তম সংখ্যা)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ**

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"

—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর ৯২তম সালানা জলসা উপলক্ষ্যে 'পাক্ষিক আহমদী'র সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

-সম্পাদক

واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالنّاصــــر

Fazal Mosque, London
20 December 2015 - SK

Dear Ansar Brothers of Bangladesh,

Assalamo Alaikum wa Rahmatullahe wa Barakatohu

I am pleased to know that you have gathered at the occasion of annual National Ijtema where you will have the chance to meet new and old fellow members from all corners of Bangladesh and have the opportunity to learn and gain spiritual knowledge by listening to the prominent scholars of the Jamaat. Most importantly, you will have the opportunity to offer all obligatory prayers in congregation which will, InshaAllah, shower blessings of Allah manifold.

Majlis Ansarullah has an important role to play in the progress of the Jama'at and in the upbringing of our coming generations. Members of Majlis Ansarullah after spending forty years of Tarbiyyat have become a dedicated soldier of Allah who are expected to complete the mission of Promised Messiah of reviving Islam, a religion of peace and tranquility. The present state of Muslim countries does not portray the image of Islam as a religion of peace and tranquility. Fourteen hundred years ago the Holy Prophet Mohammad (peace and blessings of Allah be upon him) had foreseen the present plight of Muslims and had prophesied the advent of Promised Messiah and Mahdi who will not only restore and revive Islam to its glory but also spread Islam to all corners of the world. This task of revival of Islam is being carried out only by Jama'at Ahmadiyya through out the world although the members of the Jama'at are being persecuted in doing so. Otherwise, there is nobody in sight who are engaged in portraying Islam as a religion of peace and tranquility, instead, all kind of atrocities are committed in the name Allah.

Majlis Ansarullah, who have through the history of Islam, led the charge in making sacrifices for the growth of Islam, our role in this endeavor is paramount. By holding the rope of ALLAH strongly and by treading on the path of TAQWA (righteousness) with absolute obedience to the institution of KHILAFAT the recovery of Islam Ahmadiyyat, Insha-Allah, be assured.

At the end I pray that may Allah bless this Ijtema in all respect and reward the participants and organizers from the blessings of such spiritual gatherings.

Wassalam,

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul Masih V

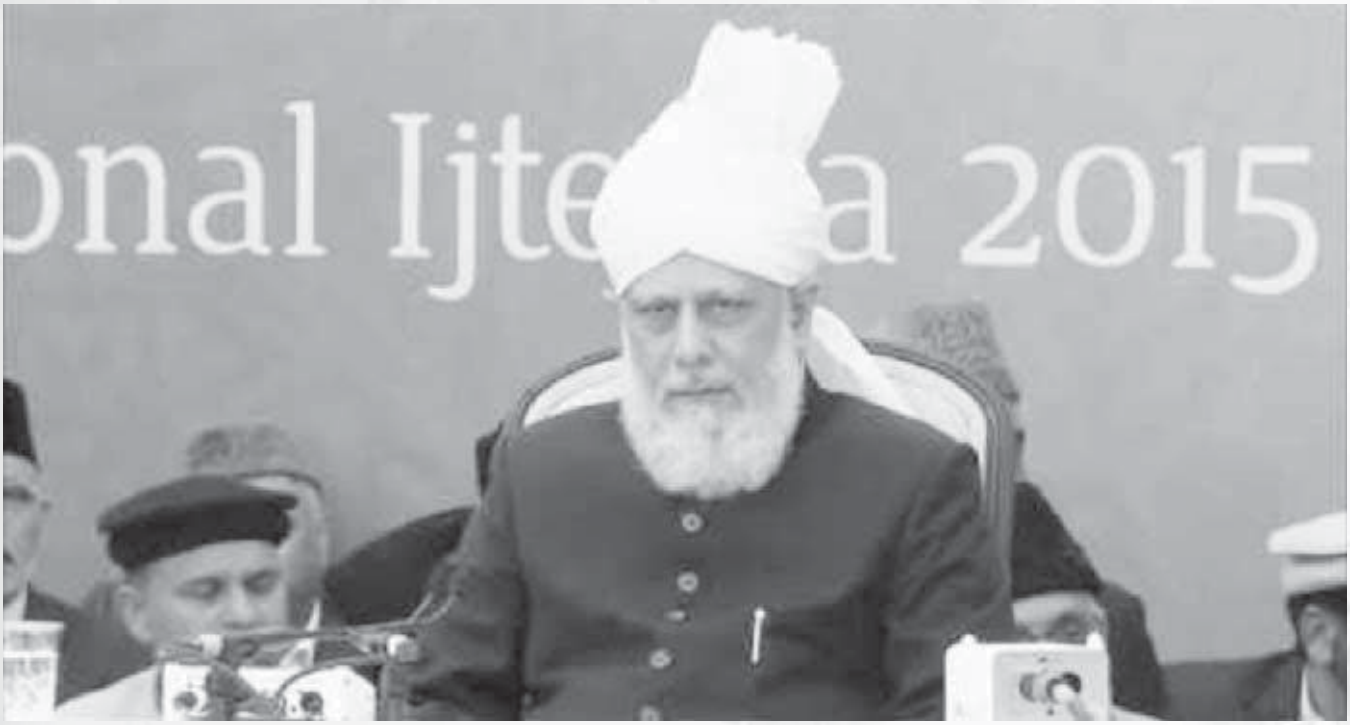

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর ৩৭তম বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর কল্যাণময় বাণী

বাংলাদেশের প্রিয় আনসার ভাইগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আমি জেনে খুশী হয়েছি যে, আপনারা আপনাদের জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছেন, যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সকল এলাকা থেকে আগত নতুন এবং পুরনো সঙ্গী-সাথী সদস্যদের সাথে আপনাদের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ লাভ হবে সেই সাথে জামাতের খ্যাতিমান প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞজনদের বক্তব্য শুনে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করারও সুযোগ আপনারা পাবেন। বিশেষত: এ উপলক্ষ্যে সেখানে সব ওয়াক্তের ফরয নামায বা-জামাত আদায় করার সৌভাগ্যও আপনাদের হবে আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অপার করুণাধারা আপনাদের ওপর বর্ষিত হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

জামাতের অগ্রগতি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতি সাধনে মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তরবিয়ত লাভের চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করার পর এ সংগঠনের সদস্যগণ এমন এক উৎসর্গীকৃত আল্লাহ্‌র সৈনিকে পরিণত হয়েছেন, যাদের কাছে প্রত্যাশিত যে, শান্তি ও স্বস্তির ধর্ম ইসলাম পুনরুজ্জীবিত করার যে মহান মিশন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিয়ে এসেছেন তা এরা পূর্ণ করবেন। মুসলিম দেশগুলোর সমকালীন অবস্থা ইসলামকে শান্তি ও স্বস্তির ধর্মরূপে চিত্রিত করে না। মুসলমানদের এই করুণ দশাটি চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আগাম জানাতে পেরে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দীর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যিনি ইসলামকে পুনরুত্থিত করে কেবল এর পূর্বের গৌরবময় অবস্থাতেই ফিরিয়ে আনবেন না বরং ইসলামকে বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দিবেন বলেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইসলামের পুনর্জাগরণের এ কাজটি করতে গিয়ে জামাতের সদস্যগণ যদিও নির্যাতিত হচ্ছেন তবুও কেবলমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত-ই সমগ্র-বিশ্বে এ কাজটি করে চলছে। দৃশ্যপটে কেউই আর এমন নেই, যারা ইসলামকে শান্তি ও স্বস্তির ধর্ম হিসেবে রূপদান করতে পারে বরং এর পরিবর্তে সর্বপ্রকারের নৃশংসতাই চালানো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নামে।

মজলিস আনসারুল্লাহ, ইসলামের ইতিহাস জুড়ে কুরবানী করার মাধ্যমে ইসলামকে বর্ধিষ্ণু করে গড়ে তুলেছে যারা, সেই মহান কাজে এই আমাদের ভূমিকা আকাশচুম্বী। আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আর তাকওয়ার সূক্ষ্ম সঠিক পথে চলে খেলাফতের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যে নিবেদিত থেকে (আমাদের দ্বারা) ইসলাম আহমদীয়াতের বিজয় নিশ্চিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে আমি দোয়া করি, এই ইজতেমা আল্লাহ্ তা'লা সবদিক দিয়ে সাফল্যমন্ডিত করুন আর এতে অংশগ্রহণকারী এবং এর সংগঠকগণকে সেই সব পুরস্কারে ভূষিত করুন, যেসব কল্যাণ রয়েছে আধ্যাত্মিক সমাবেশগুলোতে।

ওয়াসসালাম

মির্যা মাসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামেস

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী
বহিঃসম্পর্ক ও গণ-সংযোগ সম্পাদক
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আজকের এই শান্তি সম্মেলনের সন্মানিত সভাপতি ও ন্যাশন্যাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দ এবং উপস্থিত সূধী মন্ডলী, আসসালামুআলাইকু, আপনাদের সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

সম্প্রীতি ও শান্তি অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। যেখানে সম্প্রীতি সেখানেই শান্তি, আর যেখানেই সম্প্রীতির অভাব সেখানেই অশান্তি। আমাদের এবারের শান্তি সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় রাখা হয়েছে, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও চলমান পরিস্থিতি"।

আমাদের এই বাংলাদেশ আবহমান কাল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। শত শত বছর ধরে এদেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করে আসছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন উৎসব পার্বন আমরা একত্রে মিলে মিশে উদযাপন করে আসছি। আমাদের জাতীয় উৎসবগুলোরও রয়েছে একটি অসাম্প্রদায়িক রূপ ও চরিত্র। কিন্তু আজ উদ্বেগের সাথে বলতে হয় যে, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ও গোষ্ঠী আমাদের সেই সম্প্রীতি বিনষ্ট করার প্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে।

একদিকে নানা ছলচাতুরী আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক উস্কানী এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও নির্যাতন অন্যদিকে আচমকা জঙ্গী হামলা এবং বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তাদের মাঝে ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতার অবস্থা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বী বা হিন্দুদের মন্দির আক্রমণ ও প্রতিমা ভাংচুর, খ্রীষ্ট ধর্মীয় যাজকদের ওপর হামলা, মহররমে আশুরার সময় ঢাকার হোসাইনী দালানে বোমা হামলা এবং বগুড়ায় শিয়া মসজিদে গুলি বর্ষন আর সর্বশেষ রাজশাহীর বাগমারায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে বোমা হামলা তারই প্রতিফলন। শুধু তাই নয়, ভিন্ন মতাবলম্বী এবং সেকুলার গোষ্ঠী ও ব্যাক্তি বিশেষের উপর আক্রমণ ও হত্যা আমাদের দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও উগ্রতার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমাদের বিশ্বাস এধরণের আক্রমণ ও ঘটনার দ্বারা দেশ ও সমাজে একটি কৃত্তিম সংকট তৈরীর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ইসলাম তথা কোন ধর্মই এভাবে মানুষ হত্যা বা আক্রমণ কোন ভাবেই সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআন বলে, যদি কেউ কোন মানুষকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো। আর কেউ যদি কারো জীবন বাঁচায়, তাহলে সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন বাঁচালো। (সূরা মায়েদা)। অথচ, পরিতাপের বিষয় যে, ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে আজ উগ্র ও জঙ্গী গোষ্ঠী মানুষ হত্যার উৎসবে নেমেছে!

একদিকে দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা আর অন্য দিকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে জঙ্গীবাদের উত্থান মূলতঃ সারা বিশ্বকেই একটি অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে শান্তির ধর্ম ইসলামের নামে বিশ্বের নানা দেশে বিভিন্ন জঙ্গীগোষ্ঠীর উত্থান এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত হত্যা-লুণ্ঠন-অত্যাচার-ধ্বংসলীলাসহ অ-ইসলামী কর্মকাণ্ড কেবল পবিত্র ধর্ম ইসলামকেই দুর্নামী করছে না বরং মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এমনি পরিস্থিতে বিগত কয়েক বছর যাবত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সারা বিশ্বে শান্তি সম্মেলন ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করে আসছে। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলিফা তথা আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা এবং বিশ্বে ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দসহ মানবমন্ডলীকে আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

তিনি তাঁর বক্তব্য ও বাণীতে জনগণের অধিকার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে শক্তিশালী ও উন্নত দেশগুলো কর্তৃক দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলোর ওপর অযাচিত ও অন্যায় হস্তক্ষেপ, তাদের ন্যায্য অধিকার খর্ব করা, ছলে-বলে-কৌশলে তাদের সম্পদ গ্রাস করার অপকৌশল ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বলেন, "অন্যের সম্পদের প্রতি ঈর্ষা ও লোলুপ দৃষ্টি পৃথিবীতে অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।"

ইসলামের নামে জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, "মুসলমানদের কতিপয় গোষ্ঠি অবৈধ উপায় ও আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার করে, ধর্মের নামে সামরিক ও বেসামরিক অমুসলিমদের হত্যা ও ক্ষয়-ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি নিরীহ মুসলমান ও শিশুদের পর্যন্ত নৃশংস ভাবে হত্যা করছে। এধরণের নিষ্ঠুর আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে একান্ত অগ্রহণ যোগ্য।"

তিনি আরো বলেন, "কোন অবস্থাতেই ইসলাম এভাবে মানুষ হত্যাকে বৈধতা প্রদান করে না, অতএব যারা তাদের এই অবৈধ এবং নৃসংশ কর্মকাণ্ডকে ইসলামের নামে চালাতে চায়, তারা বস্তুতঃ পবিত্র ধর্ম ইসলামকেই দুর্নাম করছে" (প্যারিস আক্রমণের পর প্রদত্ত বক্তব্য, ১৪ নভেম্বর, ২০১৪)।

সুধীবৃন্দ,

২০১৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর এই অডিটোরিয়ামেই যখন আমরা আরেকটি শান্তি সম্মেলন করেছিলাম তখনো পরিস্থিতি এতোটা খারাপ ছিল না, বিশেষ করে আমাদের দেশে। তখন আমাদের বক্তাদের অনেকেই বলেছিলেন যে, তালেবান, বকোহারাম বা আইসিস আমাদের দেশ থেকে দূরে রয়েছে বিধায় আমরা নিরাপদ রয়েছি এমনটি ভাবা আমাদের জন্য হবে আত্মঘাতী। সে অনুষ্ঠানে প্রদত্ত মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর বক্তব্য থেকে কয়েকটি বাক্য আমি এখানে উদ্ধৃত করছি; "আমাদের অনেকের ধারণা হল, নাইজেরিয়াতে, মধ্যপ্রাচ্যে, আফগানিস্তানে অথবা পাকিস্তানে যা হচ্ছে আমাদের এখানে তা হবে না। কেননা আমাদের দেশ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা নিরাপদ থাকব। এটি আত্মপ্রসাদ বলে আখ্যায়িত হতে পারে ঠিকই কিন্তু একে আত্মঘাতী-আত্মপ্রসাদ বলতে হবে। বিপদ দেখে উটপাখির মত মাথাটা বালির মধ্যে লুকালে কিন্তু রক্ষা পাওয়া যাবে না। কেননা, 'তালেবানিত্ব' কোন জাতীয়তা বা কোন বিশেষ দেশের নাগরিকের নাম নয়। নির্দিষ্ট একটি সীমানায় আবদ্ধ কোন জীবেরও নাম নয়। এটি একটি বিকৃত মানসিকতার নাম। এটি যে কোন দেশে যে কোন সময় মাথাচাড়া দিতে পারে। তাই সময় থাকতেই পূর্ব-প্রস্তুতি আবশ্যক"।

তাই আর দেরী না করে সব ধর্ম ও মতের সকল শান্তিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরী। আমরা আশাকরি যে, আজকের এই শান্তি সম্মেলন এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে আর তাহলেই এধরণের আয়োজন স্বার্থক হবে।

আপনাদের সবাইকে আজকের এই শান্তি সম্মেলনে স্বাগতম। ধন্যবাদ।

[গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কর্তৃক আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে পঠিত সূচনা বক্তব্য]

কবিতা

আমাদের জলসা

সিবগাতুর রহমান

আমাদের জলসা নয় কোন তামাশা
দিবানিশি গাহি সবে মহিমা খোদার,
নাহি কোন সোরগোল ইবাদতে মশগুল
অপরের সুখে হাসে হৃদয় সবার।
মু'মিনের মনে প্রাণে জলসায় ক্ষণে ক্ষণে
ঝরে শুধু প্রিয়তম নবীজির (সা.) শান,
ধর্ম মানবতা ভালবাসা একতা
এই নিয়ে গাই সবে বিজয়ের গান।
কিবা দিন কিবা রাত নেই কোন অজুহাত
পরের লাগিয়া সবে ত্যাগি নিজ সুখ,
অপার সবিনয়ে সালামের বিনিময়ে
সব ব্যাথা ভুলে থাকি সদা হাসি মুখ।
নাহি মানি জাত-পাত অপরূপ ইতায়াত
প্রাণ ভরে শুনি সবে খলীফার বাণী,
রাত জেগে ইবাদত নবীজির (সা.) হেদায়াত
এই নিয়ে কেটে যায় দিন ক'খানি।
আহা! কিযে লাগে বেশ মনোরম পরিবেশ
হাজারো মু'মিনের এই মিলন মেলা,
আহমদী জনে জনে এ আশায় দিন গুনে
আসিবে কখন এই জলসার বেলা।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ ইলিয়াস মোল্লা, পিতা মৃত সিরাজ উদ্দিন মোল্লা, গত ১০/০১/২০১৬ তারিখে রোজ রবিবার ভোর ৪-৫৩ মিনিটে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুকালে মরহুম দুই মেয়ে এবং দুই নাতনী এবং নাতি সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। তিনি মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের ও খাকসারের সহযোগিতায় পুরো পরিবারসহ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন এই জন্য জামা'তের সকলের কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ সেলিম আহমদ মস্তান
দেওভোগ হালকা ,নারায়ণগঞ্জ

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলূল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৪৫)

যীশুর পুনরাগমন সংক্রান্ত বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতার সাক্ষ্য–প্রমাণঃ

যীশুর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উনিশ শতক এবং তৎপরবর্তী সময় থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রচারক এবং চিন্তাশীল লেখক–গবেষকগণ অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রকাশ করেছেন। এই ব্যাপারে খ্রিষ্টান পন্ডিতগণ যারা 'মিলেনিয়াম স্কলারস' (Millennium Scholars) বলে সমধিক পরিচিত তাদের গবেষণা–লব্ধ বক্তব্য এবং প্রচার–প্রচেষ্টা এই সময়–কালের ধর্মীয় ইতিহাসের পাতাগুলোকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে। এই বিষয়ে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটি সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় (দি আহমদীয়া গেজেট– মার্চ ২০০২) প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো। [৩৬]

শুরুতে সংশ্লিষ্ট বিষয়– 'The Messiah has come-Testimony of the Holy Bible' নামক প্রবন্ধের সূচনা বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধকার লিখেছেনঃ

"আজকে আমি হযরত প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)–এর (১৮৩৫–১৯০৮ খৃঃ) দাবীর মাধ্যমে কিভাবে বাইবেলে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হয়েছে– তা আলোচনা করবো। ...উল্লেখ্য যে, বাইবেল থেকে সংকলিত অধিকাংশ উদ্ধৃতিগুলোর ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণগুলো আমি সংকলন করি নাই অথবা আলোচনা করি নাই। এগুলো মূলতঃ 'মিলেনিয়াম গবেষকগণ' (Millennium Scholars) যারা উনিশ শতকে বাস করতেন তাঁদের রচনাবলী থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। শত শত মিলেনিয়াম গবেষকগণ উচ্চাশা ব্যক্ত করেছেন যে, যীশু অনতি–বিলম্বে আবির্ভূত হবেন এবং অনেকেই সুনির্দিষ্টভাবে যীশুর পুনরাগমনের দিন–তারিখ প্রকাশ করতেও কার্পণ্য করেন নাই।" [৩৬]

প্রবন্ধকার যে সকল 'মিলেনিয়াম স্কলারস' তথা খ্রিষ্টান গবেষক এবং আন্দোলনকারীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাদের মধ্যে কতিপয় নামের তালিকা নিম্নরূপঃ

১) Christopher Hoffman উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে আগমনকারী যীশুর অভ্যর্থনার জন্য জেরুজালেমের উপসনালয় পূণঃনির্মানের কাজ শুরু করেন এবং তখন থেকে যীশুর পুনরাগমনের বিষয়টি ক্রমান্বয়ে আলোচিত হতে থাকে।

২) Bengle নামক আন্দোলনকারী ঘোষণা করেন যে ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে যীশুর আগমন ঘটবে।

৩) Irvingites নামক আন্দোলনকারীগণ ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড থেকে যীশুর পুনরাগমনের ঘোষণা দেন ১৮৩৬, ১৮৩৮, ১৮৬৪ এবং ১৮৬৬ সালে।

৪) Mother Lee and her Shakers আন্দোলনকারীগণ এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, যীশু অচিরেই ধরা–ধামে আগমন করবেন এবং তাঁরা বলতেন যে পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত এসে গিয়েছে সেজন্য বিয়ে–শাদীরও কোন প্রয়োজন নাই।

৫) Cunningham-এর মতে যীশুর পুনরাগমনের সালটি হলো ১৮৩৯ এবং Elliot-এর মতে ১৮৬৬ এবং Brewer ও Decker -এর মতে ১৮৬৭ এবং ঝবরং নামক প্রচারকারীর মতে ১৮৭০ হলো সেই প্রতিশ্রুত সন।

৬) Joseph Wolfe নামক বিখ্যাত পন্ডিত (যিনি ইহুদী ধর্ম থেকে খ্রিষ্ট–ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন) ঘোষণা করেন যে ১৮৪৭ সনে যীশুর পুনরাগমন ঘটবে।

৭) Class Epp নামক একজন প্রচারক (যিনি রাশিয়ার Mennonite Brethren- এর ধর্মীয় নেতা ছিলেন) ঘোষণা করেন যে ১৮৮৯ সনের ৪ মার্চে যীশুর আগমন ঘটবে।

৮) কানাডার একটি গ্রাম থেকে Dukhabors নামক একজন খ্রিষ্টান প্রচারক প্রভু যীশুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা শুরু করেন ১৯০২ সনে।

৯) রেভারেন্ড Coming তাঁর লিখিত 'The End' (Written in 1879) নামক পুস্তকে ঘোষণা করেন যে যীশুর পুনরাগমনের জন্য সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতা এবং প্রকাশিত নিদর্শনাবলী বর্তমান সময়কেই চিহ্নিত করেছে। তিনি লিখেন যে 'Christ is at our door' অর্থাৎ যীশু আমাদের দরজায় এসে গিয়েছেন'।

১০) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের অধিবাসী Harriet Livingstone যীশুর দ্বিতীয় আগমনের বার্তা ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের সংসদ সদস্যের সম্মেলনে এবং বলেন যে

স্বল্পকালের মধ্যে যীশু এসে যাবেন।

১১) William Miller ছিলেন খ্রিষ্টানদের একটি সম্প্রদায়ের (সেভেন্থ অ্যাডভেনটিস্ট নামক ধর্মীয় গোত্রের) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাইবেলের প্রচুর গবেষনা করে ঘোষনা দেন যে যীশু-খ্রিষ্ট ১৮৪৩ সালের ২১শে মার্চ থেকে ১৮৪৪ সনের ২১শে মার্চের মধ্যবর্তী যেকোনো সময়ে আগমন করবেন। ঐ সময়ে তাঁর মতে যীশুর আবির্ভাব না হওয়ায় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ১৮৪৪ সনের ২২ অক্টোবর যীশুর পুনরাগমন হবেই। কিন্তু তাঁর মত অনুযায়ী ঐ দিনেও যীশুর আগমন হয় নাই।...

[নোট : এখানে উল্লেখ্য যে, যীশুখৃষ্টের পুনরাগমন ও পৃথিবীর স্থায়ীত্ব ফুরিয়ে আসার তত্ত্বে বিশ্বাসী খ্রিষ্টধর্মের প্রটেসট্যান্ট ধারার এই গোত্রের লোকজন 'অ্যাডভেনটিস্ট' বা 'সেভেন্থ অ্যাডভেনটিস্ট' নামে পরিচিত। আরো উল্লেখ্য যে 'Advent'-এর অর্থ আবির্ভাব এবং 'Seventh' দ্বারা সপ্তাহের সপ্তম দিন শনিবার প্রার্থনা দিবস হিসেবে তারা পালন করে থাকে। খ্রিষ্ট-ধর্মের পরিচিতি এবং আন্তধর্মীয় আলোচনার সুবিধার্থে আরো একটি বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ বর্তমান খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের বিভিন্ন দল এবং গোত্রগুলোর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। খ্রিষ্টানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল তথা ক্যাথলিক মতবাদের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন ক্যাথলিক পোপ। তিনি রোমের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ভাটিকান সিটির রাষ্ট্রনেতা। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের বিশ্ব-নেতা হলেন পোপ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রোমের পোপের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কালক্রমে খ্রিষ্টান-জগতে মতভেদের সৃষ্টি করে যার ফলে খ্রিষ্টানদের মধ্যে তিনটি মূল বা প্রধান ধারার জন্ম হয়ঃ (১) ক্যাথলিক মতবাদ (২) অর্থোডকস খ্রিস্টান মতবাদ এবং (৩) প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ। এ ছাড়া খ্রিষ্টানদের আরো অনেক দল বা বিভাজন রয়েছে- যেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলোঃ (৪) অ্যাংলিকান চার্চ, (৫) মেথোডিষ্ট চার্চ, (৬) পেন্টিকোটাল আন্দোলন এবং (৭) সেভেন্থ অ্যাডভেনটিস্ট। যীশুর পুনরাগমন সম্বন্ধে পশ্চিমা জগতে মাঝে মাঝে হৈ-চৈ শোনা যায়, লিফলেট ছড়ানো হয় এবং কিছুদিন পর সবকিছু থেমে যায়। উল্লেখ্য যে, এ সম্বন্ধে শেষোক্ত সেভেন্থ অ্যাডভেনটিস্ট নামক দলটি বিশেষভাবে আন্দোলন করে থাকে।]

যীশুর পুনরাগমনের বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের পূর্ণতার সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং পর্যালোচনা ঃ

বাইবেলের মথিঃ ২৪ অধ্যায় এবং লুকঃ ২১ অধ্যায় অবলম্বনে মিলিনিয়াম গবেষকগণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং জোরালো বক্তব্যসহ এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করেছেন যে ঊনিশ শতকে যীশুর পুনরাগমন অবশ্যাম্ভাবী। এই সকল রেফারেন্স ছাড়াও বাইবেলের আরো কিছু তথ্যের আলোকে বিষয়টি নিচে উল্লেখ করা হলো।

ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে নীতিগত দুইটি প্রধান বিষয়ঃ

এই আলোচনার পূর্বে দুটি নীতিগত বিষয়ে সর্বাগ্রে স্পষ্টীকরনের প্রয়োজন রয়েছেঃ

* পরিণত বয়সে যীশু-খ্রিষ্টের মৃত্যুর সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো অস্বীকার করার সমর্থনে এবং এগুলোর প্রেক্ষিতে পাল্টা যুক্তি-প্রমাণ অথবা অদ্যাবধি যীশুর সশরীরে আকাশে জীবিত থাকার সমর্থনে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তবতা-পূর্ণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার সৎ সাহস কেউই দেখাতে পারে নাই।

* সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বানীগুলোর মধ্যে অধিকাংশ বর্ণনাগুলোতে রূপক বা আলঙ্কারিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, শুধু ধর্ম-গ্রন্থাবলীতে নয়, বরং প্রত্যেক ভাষাতেই প্রধানতঃ দু' রকম বর্ণনা-রীতি রয়েছে-(ক) সরাসরি এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা-রীতি ('মুহকাম') এবং (খ) কোন কোন শব্দ এবং বাক্য বা বাক্যাংশ রূপক এবং আলঙ্কারিক অর্থে (মুতাশাবিহ) ব্যবহৃত হয় যেগুলোর ব্যাখ্যা সাপেক্ষে প্রকৃত তাৎপর্য জ্ঞানী-গুণীজন বুঝতে পারেন।

রূপক বর্ণনার একটি দৃষ্টান্তঃ

এই ধরনের বিষয়ে বাহ্যদর্শী, স্বল্প-জ্ঞানী এবং আধ্যাত্মিকতা-শূণ্য পণ্ডিত-নামধারীগণ প্রায়শই রূপকের পরিবর্তে শুধু শাব্দিক অর্থে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার উপরই গুরুত্বারোপ করে থাকে। যার ফলে বাস্তবতা-বিবর্জিত কাল্পনিক কেচ্ছা-কাহিনী-মূলক ধ্যান-ধারণা-পূর্ণ বিশ্বাস এই ধরনের পন্ডিত-নামধারীদের দ্বারা প্রচারিত হয়ে থাকে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য ঐশী-প্রতিশ্রুত সতর্ককারী যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন যথোপযুক্ত মোকাম-মর্যাদা এবং উপাধী দ্বারা আখ্যায়িত হয়ে। বর্তমান যুগের জন্য সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ অবশ্যই আবির্ভূত হয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ রূপক-বর্ণনা বনাম শাব্দিক অর্থে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দাবী সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্তের কথা যীশু-খ্রিষ্ট নিজেই উল্লেখ করেছেন। ইহুদী পন্ডিতগণের পক্ষে যীশুর দাবী না মানার অন্যতম প্রধান কারণ এই ছিল যে, যীশুর আগমনের পূর্ব-সূরী হিসেবে আকাশ থেকে সশরীরে 'এলিজা' বা 'এলীয়' নবীর (ইলিয়াস আ.) জন্য তারা অপেক্ষা করছিল। এমনকি অদ্যাবধি একই কারণে তারা যেরুজালেমের ওডধরষরহম ডধষস্থ বা ক্রন্দন-প্রাচীরে কান্নাকাটি করেই চলেছে এই আশায় যে আকাশ থেকে সশরীরে এলিজা নবী অবতরণ করবেন এবং রাজ-মুকুট পরিহিত 'মসীহ' বা যীশুর শুভাগমনের সুসংবাদ দিবেন। ইহুদীদের এই দাবির প্রেক্ষিতে যথা সময়ে আগমনকারী যীশু-খ্রিষ্ট বলেছেন যে, এলীয় নবীর পুনরাগমনের বিষয়টি রূপকার্থে প্রযোজ্য অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে আকাশ থেকে এলীজার আবির্ভাব সংঘটিত হয় নাই। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি রূপকভাবে এলিজার স্থলে যোহন অর্থাৎ John the Baptist (আরবীতে ইয়াহিয়া আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। (মালাকী ৪ঃ৫, যোহন ১ঃ২১-২৬, লুক ১ঃ১৭, মথি ১৬ঃ১৪ এবং ১৭ঃ১০-১৩ এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ের দাবিঃ

উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের সহজ-সরল সমাধান হলো (১) এলিজার পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে যোহনের আগমনের মাধ্যমে এবং (২) অন্যদিকে পরিণত বয়সে যীশুর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং রূপকার্থে যীশুর সদৃশ ('মসিলে মসীহ') হিসেবে এই ধরা-পৃষ্ঠ থেকেই 'প্রতিশ্রুত মসীহ'-এর আবির্ভাব হওয়া এবং তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও বাইবেল সহ অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পূর্ণতার সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করত: প্রকৃত সত্য অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। কারণ এই সত্য অনুধাবনের উপর ভিত্তি করেই আন্তধর্মীয় শান্তি-সম্প্রীতি এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। নীতিগতভাবে এটাই ঐশী পরিকল্পিত বিশ্ব-ব্যবস্থার পূর্ব শর্ত। কলমের জিহাদ বা যুক্তি-জ্ঞান ও শান্তিবাদী চেষ্টা-প্রচেষ্টা সমূহ দ্বারা ধর্মের মূল শিক্ষাসহ এই বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী প্রচার করা বর্তমান

সময়ের দাবী এবং সেটাই অধিকতর চিত্তাকর্ষক এবং গ্রহণযোগ্য বটে।

এতদ্ব্যতিত অন্যান্য খন্ডিত ব্যবস্থাপত্র অথবা জোর-যবরদস্তিমূলক যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ এবং হঠকারিতামূলক সন্ত্রাসবাদ/জঙ্গিবাদ দ্বারা সেই কাংঙ্খিত বিশ্ব-শান্তি বাস্তবায়িত হতে পারে না এবং হবেও না। অনাগত ভবিষ্যৎ একথার সাক্ষ্য বহন করবে। তাই আবারও স্মর্তব্য যে, নিম্নোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সর্ব–প্রথম বর্তমান যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আগমন সম্পর্কিত ভ্রান্ত–ধারণাগুলো দূর করা অত্যাবশ্যক। সেজন্য আবার উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর সকল ভাষায় রূপক এবং আলঙ্কারিক বর্ণনা দ্বারা যেভাবে খুবই অল্প কথায় সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে তার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনেও এরূপ বর্ণনা-রীতি 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট এবং শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত বিষয়াদি) এবং 'মুতাশাবিহ' (ব্যাখ্যা-সাপেক্ষে রূপকার্থে শব্দ বা বাক্যাংশের অন্তর্নিহিত গ্রহণযোগ্য বিষয়াদি) –এই দুই রকম বর্ণনা–পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (আলে ইমরান, ৩:৮)। তাই পবিত্র কুরআন, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও রূপকাবৃত বর্ণনা অবশ্যই রয়েছে এবং সেগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সঠিক তাৎপর্য শুধুমাত্র স্বচ্ছ-হৃদয়-বিশিষ্ট বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্বল্প জ্ঞান-বিশিষ্ট কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং তথাকথিত নামধারী পন্ডিতদের পক্ষে বাহ্যিক অর্থ ছাড়া অন্য কোন গূঢ়ার্থ সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই কারণেই ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং অধিকাংশ মুসলিম পন্ডিতগণ আক্ষরিক অর্থে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষগণের আকাশে গমন এবং আকাশ থেকে পুনরাগমন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েই চলেছে। যতদিন তাদের সু-বুদ্ধি এবং সু-চিন্তা-চেতনার উন্মেষ হবে না, ততদিন তারা নিষ্ফলভাবে আকাশের দিকে তাকাতেই থাকবে পুরাতন কোন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের ('মামুর মিনাল্লাহ্'-এর) স্বশরীরে পুনরাগমনের জন্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইহুদীদের এলিয় নবীর পুনরাগমন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ না হয়ে রূপকভাবে ইয়াহিয়া বা যোহনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। তেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ.) বা যীশুর পুনরাগমন অথবা ঈশ্বরপুত্র হওয়ার বিষয়গুলি আক্ষরিক অর্থে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না। তবে এই ধরনের রূপকাবৃত কথাগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করত: প্রকৃত তাৎপর্য এবং মর্ম্মার্থ অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বলা বাহুল্য যে ধর্মীয় বিষয়ে রূপক–বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির কারণে বড়ো বড়ো সমস্যার সৃষ্টি যেমন অতীতে হয়েছে, আজও সেটা অব্যাহত রয়েছে।

এই রূপক-বর্ণনা সংক্রান্ত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর না হওয়া পর্যন্ত আলোচ্য অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বানীগুলোর পূর্ণতার প্রমানগুলোর সত্যতা সহজে মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারই বটে। যুগে যুগে স্বচ্ছ-হৃদয়-বিশিষ্ট বিশিষ্টজনেরা যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী সাহায্যের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বানী সমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। অনুরূপভাবে এখনও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করত: দিকে দিকে সত্যান্বেষীদের হৃদয়গুলো প্রতিশ্রুত যুগের প্রতিশ্রুত ঊনবিংশ শতকে মসীহ রূপে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবির সত্যতা উপলব্ধি করছেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অনুসারীদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত সত্য, প্রকৃত শান্তি-শৃংখলা এবং মানবতার জন্য কল্যাণময় বিশ্ব-সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে। এই কারণে সেই প্রতিশ্রুত যুগ এবং সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা অত্যাবশ্যক।

[চলবে]

কবিতা

যুগের মাহ্‌দী কোথায়?

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ

দ্বীন ইসলাম আজ ভয়ংকর পরীক্ষায় নিমজ্জিত
ইয়াজুজ-মাজুয ও দাজ্জালিয়াত এখন সু-সজ্জিত।
মুসলমানের মাঝে হয়েছে অনৈক্য আর দলাদলি,
তিহাত্তর দলে হয়েছে বিভক্ত একে অন্যকে দিচ্ছে গালি।
দলের নেতা হয়েছে ফাসেক মিথ্যা দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব
ঘরে ঘরে হয়েছে উপাসনালয় রয়েছে মুত্তাকির অভাব।
চলছে ত্রিত্ববাদী খ্রিষ্টান আর দাজ্জালের শাসন
দুনিয়া ডুবে গেছে মারনাস্ত্রে সর্বগ্রাসী ইয়াজুজ-মাজুজের আগ্রাসন।
সর্বপরি সুদ-মদ-জুয়া আর ব্যভিচারে ছাড়াছড়ি
আকাশের আবরণ করেছে উন্মোচন চলছে বিজ্ঞানের বড়াবাড়ি।
মরুর জাহাজ উষ্ঠ হয়েছে বেকার মরুতে চলছে রেলগাড়ী
বন জঙ্গল এনেছে মঙ্গল জীবজন্তুর ঠাঁই মনুষ্য বাড়ি।
প্রকাশনার হয়েছে বিকাশনা নগ্নতার বইয়ের ছড়াছড়ি
গায়ক-গায়িকাদের হয়েছে কদবা ব্যভিচার আর নর্তকীর দখলদারী।
পাহাড় কেঁটে করছে নীচু বানাচ্ছে অট্টালিকা উঁচু
সমুদ্রকে করেছে দ্বি-খন্ডিত সাটানিক চলছে পিছু।
খুঁজে দেখ ভাই!
যুগের মাহ্‌দী এসেছে তবে
চোখ বুঝে থাকলে পোস্তাতে হবে
মৃত্যু হবে যে জাহিলিয়াতের ॥

বড় হবো

মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

একদিন বড় হবো করিব জয়
থাকিব সবার পাশে নাহি করি ভয়
আমি হবো সেই জন
যাকে, সবাই বলে ভালো।
আপন ঘরের প্রদীপ নেব
দেব, সবার ঘরে আলো।
ভলো হয়ে রব আমি করিলাম পণ,
মিছে কথা নাহি কব থাকিতে জীবন।
আঁধারের মাঝেও যেন প্রদীপ হয়ে থাকি,
মাতাপিতার সম্মান যেন বজায় রাখি।
বড়দের দেখিলে করিব সালাম,
লাভ-লস দেখিব না কোথা কি পেলাম
আমায় দেখিলে যেন সবাই ভালোবাসে,
ভেদাভেদ ভুলে যেন সবাই কাছে আসে।
সারাদিন যেন করি খোদাকে স্মরণ
একদিন বড় হবো করিলাম পণ।

কোন্‌টা ঠিক?

মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ

"দেখিলেন ব্যাকুল
ডাকিছে মানবকূল,
সিন্ধুর তীরে বসি
ডাকিছে সকাতরে
কে আছে দেবে আমায়?
সিন্ধু পার করে
ছুটিয়া তীর গতি
আসিলেন জননী
মাথায় পরিয়া তাজ
ডাকিলেন দ্বীনের লাগি"

ইসলাম অর্থ শান্তি। আর মুসলমান অর্থ আত্মসমর্পণকারী। এই শান্তি এবং সমর্পণের শিক্ষার ফলেই ইসলাম বিশ্বে দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। আর ইসলামের যে গ্রন্থ কুরআন মজীদ এর শিক্ষাও সুন্দর। পবিত্র কুরআনে ইসলামের প্রকৃত রূপ, কে মুসলমান! আবার ইসলামের অনুসারীদের কী মান বজায় রাখা উচিত, তা বলে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের শিক্ষা, আদর্শ এবং ইনসাফের কারণে এই ভারত উপমহাদেশে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে। প্রবেশ করে একটু শান্তি ও সস্তি পাবার আশায়। আমাদের এই উপমহাদেশ হিন্দু প্রধান ছিল। ইতিহাসে আছে, হিন্দুদের মাঝে ৪টি গোত্র ছিল। যেমন ১। ব্রাহ্মণ (২) ক্ষত্রীয় (৩) বৈশ্য ও (৪) শুদ্র। ব্রাহ্মণ ধর্ম চর্চা করতো আর ক্ষত্রীয় যুদ্ধ করতো, দেশ পরিচালনা করতো। বাকী ২টি গোত্রের কাজ ছিল এদের সেবা করা। বংশ পরম্পরায় এভাবে চলে আসে। অবহেলিত বৈশ্য এবং শুদ্ররা দেখলো যে, আমাদের হিন্দু ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা কত সুন্দর। যেখানে ধনী গরীব উঁচু নিচুতে ভেদাভেদ নেই। ইসলামে আছে শান্তি এবং ইনসাফ। এইটিই তো আমাদের তথা মানব জাতির জন্য উপাদেয়। তারা তখন ভালো শিক্ষা এবং আদর্শ লাভ করার আশায় মুসলমানদের ভারতে আমন্ত্রণ জানায়। মুসলমানেরা পাক ভারত জয় করে।

এই ঘটনাটি কেবল পাক ভারত উপমহাদেশেই নয় বরং প্যালেষ্টাইনের শাসন ভার দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.) এর সময় মুসলমানদের হাতে ছিল, খ্রিষ্টান প্রজারা মুসলমানদের কর দিত। যখন তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন উমর (রা.) তাঁর সৈন্য বাহিনী ফেরত নেন আর খ্রিষ্টান প্রজাদের কর ফেরত দিয়ে আসতে বলেন। তখন খ্রিষ্টান প্রজারা কাঁদতে থাকে আর বলে তোমরা যেও না। তোমরা আমাদের জন্য আশির্বাদ। আমাদের খ্রিষ্টান রাজারাও এভাবে আমাদের ইনসাফ দিতে পারে নাই।

ইউরোপের কোন কোন দেশে সমস্যা দেখা দিলে তুরস্কের মুসলমান সুলতানের কাছে বিচার দিত। তুরস্কের সুলতান তা মিমাংসা করতো। আজ যেভাবে কোন মুসলমান দেশে সমস্যা দেখা দিলে মুসলমান বাদশাহ আমেরিকার সাহায্য কামনা করে থাকে। কোথায় গেল সেই ঐশ্বর্য, কোথায় বা ন্যায় বিচার। জাগতিক ভাবেও যেমন মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আধ্যাত্মিক ভাবেও তাদের ভিতর পূর্ব মান পাওয়া ভার। মারামারী, কাটাকাটি কোন না কোন দেশে লেগেই আছে। কোথায় গেল তাদের ধর্মীয় শিক্ষা, কোথায় গেল তাদের প্রতিপত্তি।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন– "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা ঃ ২০৯)

"অতঃপর, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে জানিও যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাকারা ঃ ২১০)

সুতরাং ইসলামের অনিন্দ্য সৌন্দর্য লাভ করার পরও যদি তাদের পদস্খলন ঘটে তাহলে তো তাদের অশান্তি ভোগ করতে হবেই। শান্তি কি এমনিতে আসে। শান্তির কাজ করলে পরেই শান্তিলাভ করা সম্ভব হবে।" সাতক্ষীরা জেলার কেরালকাতা নামক এক জায়গা যেখানে আহমদীয়া জামাতের মসজিদে এক তবলিগী সেমিনার হচ্ছিল। এক কুরআনের হাফেজ বয়স বেশী নয়, বড়জোর ২০ কি ২২ হবে। বলল– আচ্ছা বলেন তো ইমাম মাহদী আসলে তো দুনিয়াতে শান্তি বিরাজ করার কথা। তা কই আমি তো দেখছি সর্বত্র অশান্তি আর অশান্তি। আমি তাকে বললাম দেখ, তুমি কাঠ ফাঁটা রোদে দাঁড়িয়ে যদি চিৎকার কর আর বল, আমার গরম লাগছে, রোদে পুড়ে যাচ্ছি, তাহলে কি লাভ তোমার হয়, তোমাকে কোন গাছের ছায়ায় যেতে হবে নয়তো কোন ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। তবেই তুমি রোদ্রের তীব্রতা থেকে রক্ষা পেতে পার। তো ইমাম মাহদী আসলেই যে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এমনটি নয়। তাঁকে মানতে হবে, তাঁর জামাতে সামীল হতে হবে, তবেই আমরা শান্তি পেতে পারব।

সম্ভবত ২০০৮ সাল কী ২০০৯ সালের কথা, মংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আব্দুল হাই বাচ্চু (জাহাজের মাষ্টার) সাহেবকে নিয়ে যাই। ইমাম মাহ্দীর দাওয়াত নিয়ে। এক দোকানদার এর কাছে যাই। বলি–আমরা আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। লোকটি ২ জনকে চেয়ার দিলেন বসতে। বসলাম– বললাম– আমরা ইমাম মাহ্দীর সংবাদ নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন- কবে এসেছেন ইমাম মাহ্দী। বললাম ১০০ বছর পার হয়ে গেছে। তিনি বললেন কী করে মানবো আমরা তো তাঁকে দেখিনি। সেই এলাকাতে অনেক হিন্দু লোক বাস করতো। বললাম, এই যে আপনার আশে পাশে এতগুলো হিন্দু বাস করে তাদেরকে যদি বলেন মুহাম্মদ (সা.) এসেছেন তাঁকে মান। মুসলমান হও। তারাওতো আপনাকে প্রশ্ন করবে কবে এসেছেন? আপনি বলবেন ১৪শ বছর পূর্বে। তারা কী বলবে? কোথায় আমরা তো দেখিনি। কি করে মানব। আপনি তাদের

কি বলবেন। কথা সেটি নয়। আমার জন্ম তখন হয়নি যখন তিনি এসেছেন। এখন শুনেছি মানতে হবে। এটিই আল্লাহ্‌র আদেশ।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন– "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলে) আহ্বান করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আন; সুতরাং আমরা ঈমান আনলাম। (আলে ইমরান, ১৯৪)

অতএব একজন মু'মিন মুসলমানের কাজই হলো সর্বদা আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেওয়া। মহান আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ.)কে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। ইহুদীরা তাঁকে মানলো না। তাই বলে কী তিনি সত্য নবী নন? হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আজ সারা বিশ্বে সাড়ে ৭শ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র দেড়শ কোটি মুসলমান বাকী ৬শ কোটি লোকই মুহাম্মদ (সা.)কে নবী হিসাবে মানে না। স্বীকার করে না। তাই বলে কি হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য নবী নন। আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহ্‌দী হিসাবে পাঠিয়েছেন। মুসলমানদের অধিকাংশই মানে নাই। তাই বলে কী তিনি সত্য মাহদী নন? হে মুসলমানরা! আপনাদের বিবেক গেল কোথায়? একি আপনাদের বিচার বুদ্ধি?

মুসলমানের কাজ কী? সর্বদা আত্মসমর্পণকারী থাকা। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ কী "সামে'না ওয়া আতা'না" অর্থাৎ আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। বিদ্রোহ করা তো মুসলমানের শিক্ষার মধ্যে পড়ে না। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, "যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের ওপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল মাহদী।" (সুনানে ইবনে মাজা-বাবু খুরুজুল মাহদী)

আরেক জায়গায় হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন– "তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইমাম মাহদীকে পাবে, তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে।" (কানযুল উম্মাল)

রসূলুল্লাহ্ যাকে সম্মান দেখিয়ে সালাম দিতে বলেছেন, আর সেখানে মুসলমানেরা তাঁর পরওয়াই করছে না। একজন মুসলমানের কাজ কী। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ মান্য করা। অবশ্য এই আদেশ শুধু মুসলমানদের জন্য নয় সমগ্র মানব জাতির জন্য; কিন্তু মুসলমানদের আদেশ পালনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা উচিত। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বলেছেন– " তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। যাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হয়েছে, তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়ে থাক এবং অসঙ্গত কাজ হতে বারন কর এবং আল্লাহ্‌তে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান, ১১১)

তাই আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। এই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যে ইমাম মাহদী দাবী করেছেন তাঁকে আমি মেনে নিই। আমার কাজ হলো আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ পালন করে তাঁর বয়আত করা। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যদি সত্য না হন তাহলে তো আল্লাহ্‌ই তাকে ধরে ফেলবেন। আমি তো গিয়ে বলতে পারবো হে আল্লাহ্! আমি তোমার, তোমার রসূলের আদেশ পালন করেছি। আমার কাজ আমি করেছি এখন তোমার কাজ তুমি কর।

হে মুসলমান ভাই! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ মনোনীত না করে থাকেন আর সে ব্যক্তি বলে বেড়ায় যে, আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন তাহলে আপনার কিছু বলা লাগবে না। আল্লাহই তাকে ধরবেন এবং শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন– "এবং সে যদি কোন কথা মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করতো। তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধৃত করতাম, অতঃপর আমরা তার জীবন শিরা কেটে দিতাম, তখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ তাঁর (আযাব) হতে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতে না। (আল হাক্কা ঃ ৪৪-৪৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। আরবের লোকেরা যখন হযরত রসূল করীম (সা.) এর নবুওয়তের দাবী নিয়ে সন্দেহ করছিল, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের বোঝানোর জন্যই এই আয়াত নাযিল করেন। মহান আল্লাহ্ তা'লা এখানে এই বোঝাতে চেয়েছেন যে, হে লোক সকল! যদি আমি মুহাম্মদ (সা.)কে নবী বানিয়ে না পাঠাতাম আর সে যদি নিজ থেকে দাবী করতো তা হলে তোমাদের কিছু বলতে হতো না আমিই তাকে শাস্তি দিতাম। আর তখন তোমরা যদি তাকে ভালোবেসে বাঁচাতে চাইতে তবুও আমার আযাব থেকে তাকে বাঁচাতে পারতে না।

কত শক্ত কথা। কত কঠিন কথা। সৃষ্টি জগতের শিরোমনি। মানবতার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক। রাহমাতুল্লিল আলামীনকেও আল্লাহ্ ছাড় দিতেন না। তাহলে হে পাঠকগণ! আপনারাই বিবেচনা করুন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যদি সত্য সত্যই এই যুগের জন্য আল্লাহ্ মনোনীত ইমাম মাহ্‌দী না হতেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কী তাঁর শাস্তির জন্য যথেষ্ট নন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর এই আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। তখন শুধু ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে এই গ্রামের গুটি কয়েকজন আহমদী সদস্য ছিল। ১৮৮৯ সালে মাত্র ৪০ জন লোক তাঁর হাতে বয়আত করে তাঁর অনুসারী হয়। আজ ২০১৬ সালে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ২০৭ টি দেশে এই জামাত সুপ্রতিষ্ঠিত। এই যে দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া এটি কী তাঁর সত্য মাহ্‌দী হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আর তাঁর পর যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় তারও ১ শত বছর পার হয়ে গেছে। বর্তমানে তাঁর ৫ম খেলাফতকাল চলছে।

সম্প্রতি আহলে হাদীসের একজন অনুসারীকে তবলীগ করছিলাম। বললাম শেষ যুগের ইমাম মাহ্‌দী এসে গেছেন। তাঁর ৫ম খেলাফত চলছে। আমরা মেনেছি, আপনি দূরে কেন তাঁকে মানেন। তাঁর হাতে বয়আত করেন, তাঁর জামাতে শামিল হন। আহলে হাদীসের লোকটি বলছে–আমি আমাদের মৌলানা সাহেবকে বলেছি যে, কাদিয়ানীরা যে বলে ইমাম মাহ্‌দী এসে গেছে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই নাকি ইমাম মাহ্‌দী তাঁকে না মানলে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন। তখন মৌলানা সাহেব বলেন– মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যদি ইমাম মাহ্‌দী হয়, তাহলে তোমার সমস্ত পাপ আমি ঘাড়ে নিব। ও নিয়ে তুমি চিন্তা করোনা। আমি লোকটিকে বললাম আচ্ছা কুরআনে আল্লাহ্ বলেন– "একের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না" তাহলে মৌলানা সাহেব কেমন করে আপনার বোঝা বহন করবেন। মৌলানা সাহেব যদি পাপের বোঝা বহন করেন তাহলে অনেকে নামায পড়া ছেড়ে দিবে। মৌলানা সাহেবকে কিছু টাকা দিয়ে দিবে। এটি কী বুদ্ধিমানের কথা হলো?

আজকে খ্রিষ্টানদের দিকে লক্ষ্য করুন।

তাদের বিশ্বাস, হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া আল্লাহ্‌র কথা অমান্য করে যে পাপ করছে বংশ পরম্পরায় সেই পাপ আমাদের তথা সমগ্র মানুষের মধ্যে এসে গেছে। পাপ এ তো বেড়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ঈসাকে পাঠালেন আর হযরত ঈসা ক্রুশে তাঁর রক্ত দিয়ে সমগ্র মানুষকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। এখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। আর পাপ হবে না।

কালো মেঘের মুখ দেখিলে নদী
নাচের বাহার পায়,
ওরে হতভাগা! মুর্খে দিলি
সোনার ফসলের গাঁ।

কথা প্রসঙ্গে একজন জেরে তবলীগকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বর্ণিত হাদীসটি বললাম যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন–বনী ইসরাঈল ৭২ দলে ভাগ হয়েছিল আর আমার উম্মত অর্থাৎ মুসলমানরা হবে ৭৩ দলে ভাগ। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র এক ফিরকাহ (দল) ব্যতীত। (তিরমিযী কিতাবুল ঈমান)

লোকটি বলল– ৭৩ ফিরকার মধ্যে কোনটি ঠিক? বলছি– প্রথমে আপনাকে জানতে হবে আপনি যেই ফিরকায় আছেন সেটি ঠিক কিনা। সঠিক ফিরকাটি যাচাই করা খুবই জরুরী। একটু মনোযোগ দেন। আপনি যে ফিরকায় আছেন সেটা যদি ঠিক হয় তাহলে আপনার নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ সবই কাজে লাগবে। আর যদি আপনার ফিরকা নাজাত প্রাপ্ত ১টি না হয়ে আগুনের পথিক ৭২ দলের অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ আপনার কোন কাজে লাগবে না। কেননা রসূলে করীম (সা.) বলেছেন ৭২টি দলই যাবে আগুনের পথে। এই ৭২ দলেও কিন্তু হাফেজ, মুফতীরা থাকবে। লোকটিকে বললাম–আচ্ছা বলুন তো– এক ছাত্র সারা বছর পড়াশুনা করে পরীক্ষায় ফেল করেছে। আর একজন পড়াশুনা না করে ফেল করেছে কার কষ্ট বেশি হবে? লোকটি বললো, যে ছাত্র সারা বছর পড়াশুনা করে ফেল করেছে তার কষ্ট বেশী হবে। এখন বলুন মুসলমানের বাইরে যারা আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রসূলকে মানে না তারাও যদি জাহান্নামে যায় আর আপনি যদি নাজাত প্রাপ্ত দলটি না হয়ে আল্লাহ্‌কে না মানা লোকের সাথে জাহান্নামে থাকেন তাহলে আপনার কি কষ্ট হবে না। আর সেই লোকটিওতো হাসবে আর বলবে–দেখ, আমি দুনিয়াতে আনন্দ ফূর্তি করেও জাহান্নামে আর তুমি নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ দিয়েও জাহান্নামে। কেমন লাগবে বলুন তো। যদি আপনি নাজাত প্রাপ্ত দলটিতে থেকে নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ নিষ্ঠার সাথে করেন তাহলে কাজে লাগবে। লোকটি বলল আমি জানবো কি করে ৭৩ ফিরকার মধ্যে কোনটি ঠিক?

কুরআন করীমে আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন কোন ফিরকাটি ঠিক– "তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন যে, নিশ্চয় তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে (আন নূর ঃ ৫৬)।

সূরা নূরের ৫৬নং আয়াতের এই যে অংশ বিশেষ আমি আপনার সামনে তুলে ধরলাম এটির দিকে একটু খেয়াল করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্ তাদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাও আবার "লামে তাকীদ দিয়ে বলেছেন, অবশ্যই খলীফা দিবেন। তাহলে দেখা গেল মুসলমানদের মধ্যে যে ৭৩ টি ফিরকা হবে, এই ৭৩টি ফিরকার মধ্যে যে ফিরকায় ঈমান এবং সৎকর্ম থাকবে, তাদেরকে আল্লাহ্ খলীফা দিবেন।

এখন যাচাইয়ের পদ্ধতি হলো, যে ৭৩ টি ফিরকা আছে তাদের সবাই কিন্তু বলবে আমাদেরটা ঠিক। ধরুন এই ৭৩ টি ফিরকার মধ্যে আপনি শিয়া ফিরকার লোক। আপনি যান আপনার ইমামের কাছে। গিয়ে বলুন– আচ্ছা ইমাম সাহেব রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টি দল হবে এটা ঠিক। ইমাম সাহেব বলবে সেটি ঠিক। (ঠিক না বললে তো আমি ওপরে তিরমিযী কিতাবুল ঈমান হাদীসটি উল্লেখ করেছি। বলবেন) এই ৭৩ টি ফিরকার মধ্যে ৭২টি যাবে জাহান্নামে আর একটি যাবে জান্নাতের পথে। বলবে, ঠিক তাহলে বলেন, সেই নাজাতের পথে কোনটা। শিয়া ইমাম বলবে কেন আমাদের শিয়া ফিরকা তখন বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তো কুরআন করীমের সূরা নূরের আয়াতে বলেছেন– ঈমান এবং সৎকর্ম করলে আল্লাহ্ খলীফা দিবেন। তাহলে আমাদের খলীফা কই। আমাদের শিয়া ফিরকায় কী ঈমান এবং সৎকর্ম নেই। ইমাম সাহেব বলবেন, আছে। তখন ধরেন, আচ্ছা আপনি বলেছেন– শিয়া ফিরকার ঈমান ও সৎকর্ম আছে। আর আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন, ঈমান এবং সৎকর্ম করলে অবশ্যই খলীফা দিবেন। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় ইমাম সাহেব, হয় আপনি সত্যকথা বলছেন নতুবা (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ অসত্য কথা বলছেন। কোনটা ঠিক?

আপনি বুঝে গেলেন। শিয়া ফিরকা নাজাত প্রাপ্ত ফিরকা নয়। গেল ১টি বাদ। এখন যান আহলে হাদীসের ইমামের কাছে। বলেন, ইমাম সাহেব। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে ৭৩টি দল হবে তার মধ্যে ৭২টি আগুনের পথে আর একটি নাজাতের? এটা কী ঠিক। বলবে, হ্যাঁ। আমি কোনটাতে যাব। কোনটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বলবে, আহলে হাদীস ঠিক। এটাতে আস। বলেন, এ দলে ঈমান এবং সৎকর্ম আছে? বলবে আছে বৈকী। আপনি বলেন, তাহলে খলীফা কোথায়? সূরা নূরের আয়াতটি তুলে ধরুন। এভাবে যান সুন্নী ইমামের কাছে। একই ভাবে প্রশ্ন করেন। যান আটরশির কাছে। যান জামায়াতে ইসলামীর কাছে। যান শর্ষিনার কাছে। যান দেওবন্দের কাছে। যান তবলীগ জামাতের কাছে। যান চরমোনাইর কাছে। যান দেওয়ান বাগীর কাছে। যান কাদেরীয়ার কাছে। যান নক্সবন্দীর কাছে। যান মুতাজিলার কাছে। যান জিলবুন্যার কাছে। যান আহমদীদের কাছে। যান খেলাফত মজলিসের কাছে। একই সূত্র প্রয়োগ করুন। যেটিতে খেলাফত পাবেন সেটিই মনে করবেন সঠিক। কেননা, ঈমান এবং সৎকর্মের সাথে খেলাফতের সম্পর্ক।

সুতরাং, কুরআন এবং হাদীস মোতাবেক যেটি ঠিক সেখানে যান। আমলটি যেন কাজে লাগে। প্রত্যেকেরই আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। এটিকে কাজে লাগাতে হবে। তবেই সফলতার দ্বারে পৌঁছতে পারেন। আহমদী জামাতের কথাও শুনেন অন্যদের কথাও শুনেন। এটিই শেষ যুগ। ইমাম মাহ্‌দীর যুগ। ইমাম মাহ্‌দীকে মেনে আমলগুলো করলে জীবন সার্থক। ইমাম মাহ্‌দীকে মানলেই অতীতের সকল নবীকে মানা হবে। মুসলমান হিসাবে সকলেই যেন আত্মসমর্পণকারী হই। তবেই এই ইসলাম ধর্ম শান্তিতে পরিণত হবে।

এদিকে সেদিকে দেখিবে না চেয়ে
কোথায় গড়াইলি জল
পাবিনা, পাবিনাকো ফিরে
হারাইলে সেই মনোবল।

দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণে পুণ্য অর্জিত হয়

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন অনেক সময় তার মু'মিন মুত্তাকি বান্দাদের পরীক্ষায় ফেলেন। তিনি এটা পরীক্ষা করেন যে, তার প্রিয় বান্দারা দু:খ-কষ্টের দিনে কিভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। তাই আল্লাহ্ তা'লা একেক জনকে একেক ভাবে পরীক্ষা করেন। কাউকে অভাব-অনটন দিয়ে, কাউকে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আবার কাউকে বিপদ-আপদের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'লা চান তার বান্দারা যেন বিপদ-আপদে আর দু:খ কষ্টে আরো বেশি করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে আর নিজের সব কিছু আল্লাহর মনে করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 'এমন মানুষও আছে, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেয় আর আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল' (সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৮)।

আমরা যারা নিজেকে আহমদী বলে দাবি করি, আমরা কিন্তু বয়আত গ্রহণের সময় ১০টি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি তা আমাদের সবার জানা। এই অঙ্গীকারগুলো প্রতিনিয়ত খলীফাতুল মসীহ্‌গণ আমাদের স্মরণ করিয়ে থাকেন এ কারণে যে, আমরা যেন এর ওপর আমল করে নিজেদের জীবন পরিচালনা করি। অথচ আমরা নিজেকে আহমদী হিসেবে ঠিকই দাবি করি কিন্তু আমল-আখলাকে আমার মাঝে কতটুকু আহমদীয়াত রয়েছে তা আমি এবং আমার আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই বলতে পারেন সে কেবল মৌখিক দাবির আহমদী না প্রকৃত পক্ষেই আহমদী। আমরা বয়আতের সময় এই অঙ্গীকার করি যে, 'সুখে-দুঃখে কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবো। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের ওপরে সন্তুষ্ট থাকবো। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবো না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবো'। এখন আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমরা কি এর ওপর পরিপূর্ণ আমল করছি?

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বয়আতের এই পঞ্চম শর্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, "একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য পঞ্চম শর্তে বর্ণনা করা হয়েছে, অবস্থা যা-ই হোক কঠিন ও দুঃসময় কাল যত দীর্ঘায়িতই হোক জাগতিক লোভ লালসা সামনে দেখা যাক আর এই কথা মনে হোক যে, আমি যদি অমুক কাজটি করি কিংবা সেই দিকে ঝুঁকে যাই তাহলে অনেক বড় কার্য উদ্ধার হতে পারে, জাগতিক ক্ষমতাধরেরাও লোভ দেখাচ্ছে যে, কোন ব্যাপার নয় আহমদী হয়ে জামা'তের সাথে সম্পর্কিত থেকেও তুমি এই কাজ করে ফেলো, এই ব্যবসা বাণিজ্য করে নাও, এর দ্বারা তুমি নিজের অবস্থার উন্নতিও কর আবার জামা'তের সেবাও কর, চাঁদাও দিয়ো, এই কাজটি করে ফেল, আর এটাই হলো সেই দাজ্জালি ফেৎনা, জামা'ত থেকে দূরে নেয়া আর খোদা থেকে বিমুখ করা। এজন্যই হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তোমরা যদি বয়আতই করে নিলে তবে ঐ চক্করে আর পরো না, ঐ ধোঁকা থেকে দূরে থাক। খোদার সাথে বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেখাও। তাঁর প্রতি বিনয়াবনত হও, তোমরা আমার হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের সব কিছুই লাভ হবে।"

এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বড়ই আকর্ষণীয় উপদেশ রয়েছে– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার যখন আমি মহানবী (সা.)-এর পিছনে (উটের পিঠে) ছোয়ারী হয়ে বসে ছিলাম তিনি (সা.) বললেন, "হে স্নেহাস্পদ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলছি। প্রথম কথা হলো, আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ রেখ, তিনি তোমাকে নিরাপদ রাখবেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখলে তুমি তাঁকে নিকটেই পাবে, কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহ্ তা'লার কাছেই চাও, তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা কর। জেনে রাখ, সমস্ত লোক একত্রিত হয়ে তোমার ভাল করতে চাইলেও তারা তোমার কোনই মঙ্গল সাধন করতে পারবে না যদি আল্লাহ্ তা'লা তা না চান আর তোমার কপালে তা না লিখেন। আর যদি তারা তোমার ক্ষতি করতে একাত্ম হয়ে যায় তবুও তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না যদি না আল্লাহ্ তা'লা তোমার কপালে সেই ক্ষতি লিখে রাখেন, কলম তুলে নেন, আর কালিও যায় ফুরিয়ে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ তুমি তাঁকে সামনে পাবে, স্বাচ্ছন্দকালেও তুমি তাঁকে স্মরণ করো, দুঃসময়ে তিনিও তোমাকে মনে রাখবেন। আর জেনে রাখ, তুমি যা হারিয়েছ বা যা তুমি লাভ করতে পার নাই তা তোমার জন্য ছিল না আর যা তুমি পেয়ে গিয়েছ তা তোমারই, প্রাপ্তির বাইরে তা থাকতে পারে না, কেননা, অবধারিত নিয়তির লিখন এটাই ছিল। বুঝে

নাও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ধৈর্য্যধারণকারীদের সাথে থাকে। সুখ-আনন্দ উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সাথে, হাসি-আনন্দ দুঃখ-বেদনার সাথে একীভূত হয়ে থাকে আর প্রত্যেক অভাব-অনটনের পর রয়েছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য"। (সুনান তিরমিযী, আবু ওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ)

আসলে আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা তারাই যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাদের মন প্রাণসহ নিজেদের সর্বশক্তি আল্লাহর জন্যই নিয়োগ করে। যারা এধরণের গুণের অধিকারী তাদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ্‌পাক সুসংবাদ দিয়েছেন পবিত্র কুরআনে। তিনি ইরশাদ করেন, 'হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়ে ফিরে আস। অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' (সূরা আল ফাজর, আয়াত: ২৮-৩১)।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায় হচ্ছে, সে তার প্রভুর ওপর পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট এবং তার প্রভুও তার ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট। আর এ অবস্থা একটি বেহেশতী অবস্থা, যে অবস্থায় সে সকল মানবীয় দুর্বলতা ও দোষের উর্ধ্বে উঠে যায় এবং এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। যার ফলে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর এ দুনিয়াতেই শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারী হয়ে যা। অনেকেই আছে সামান্য দু:খ-কষ্টেই ভেঙ্গে পড়েন, চিৎকার- চেঁচামেচি করেন আর অধৈর্য হয়ে যান, যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করেন তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূল এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কোন মুসলমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোন বিপদাপদ, কোন দুঃখ বেদনা, কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, এমনকি কাঁটার সামান্য এক খোঁচা লাগার কষ্টও ভোগ করে না বরং আল্লাহ্ তা'লা তার এই কষ্টকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্তে পরিণত করে দেন' (সহি মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, বাব সাওয়াবিল মুমিন ফিমা ইউসিবুহু মিন মারাযিন আওহুযনিন)।

অপর এক হাদীসে হযরত সুহাইব বিন সিনান (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'মু'মিনের রয়েছে বিস্ময়কর এক সম্পর্ক, তার প্রতিটি কাজই কল্যাণমণ্ডিত হয়ে থাকে। এই অনুগ্রহ কেবল মাত্র মু'মিনের জন্যই নির্ধারিত। যদি সে কোন আরাম-আয়েশ, সুখ স্বাচ্ছ্যন্দ লাভ করে তা হলে সে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তার কৃতজ্ঞতার এই প্রকাশ তার জন্য আরও অধিক কল্যাণ লাভের কারণ হয়। আবার যদি তার কোনো দুঃখ-কষ্ট, অভাব বা ক্ষতি হয়ে যায় তবুও সে ধৈর্য ধারণ করে, তার এই কর্মপদ্ধতিও তার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের নিমিত্তে পরিণত হয়। কেননা, ধৈর্যধারণে তার এই দৃঢ়তায় পূণ্যই অর্জিত হয়' (সহি মুসলিম, কিতাবুল যিহাদ, বাবুল মুমিনি, আমরুহু কুল্লুহু খায়ের)। আরেকটি হদীসে বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী (সা.) মহিলাদের বয়আতের সময় এর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নিতেন যা হাদীসে এভাবে উল্লেখ রয়েছে, হযরত উমাইয়া (রা.) বয়আত গ্রহণকারী এক সাহাবিয়ার বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, মহানবী (সা.) বয়আত নেয়া কালে যে অঙ্গীকার তাদের থেকে নিয়েছেন তাতে এই কথাও রয়েছে যে, আমরা হুযূর (সা.) কে অমান্য করবো না, শোকার্ত কালে উচ্চস্বরে চিৎকার চেঁচামেচি করবো না, নিজ মুখ-মন্ডলে আঁচড় কাটবো না, নিজের কাপড় চোপর ছিড়ে ফেলবো না, মাথার চুল টেনে ছিড়বো না (অর্থাৎ এমন কান্নাকাটি করবো না যা দ্বারা অকৃতজ্ঞতা ও অধৈর্য এবং অসহায়ত্ব মারাত্মক ভাবে প্রকাশ পায়)' (আবু দাউদ, কিতাবুল জানায়েজ, বাবুল ফিন নূহ)।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে বিপদ-আপদ ও দু:খ কষ্টে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

কৃতি ছাত্র/ ছাত্রী

* বানিয়াজান জামা'তের জনাব এস এম মোফাজ্জল হোসেন-এর একমাত্র ছেলে এস এম মাহদী এ বছর জে এস সি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, (আলহামদুলিল্লাহ্)। সে সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী ভবিষ্যতে যেন আরো ভাল ফলাফল করতে পারে এবং সে যেন জামা'তের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হতে পারে।

প্রেসিডেন্ট, বানিয়াজান

* আমাদের একমাত্র মেয়ে নাসিরা সিকদার গত ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য পি,এস,সি, পরীক্ষায় "কারা প্রাথমিক বিদ্যালয়" থেকে Golden Gpa-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাটাই জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ সহিদ উল্লাহ্ সিকদার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামা'তের জনাব আহমদ মিয়া সাহেবের নাতনী। তার সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ুসহ আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

শিকদার মোহাম্মদ নাহিদ ও
মোছাম্মাৎ বিউটি বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কুমিল্লা

* আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমাদের একমাত্র মেয়ে তাহেরা বিনতে রহমান জে,এস,সি, পরীক্ষায় জি,পি,এ-৫ পেয়ে চিড়িয়াখানা বোটানিক্যাল হাইস্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে ৫ম শ্রেণীতেও জি,পি,এ-৫ পেয়েছিল। তার ভবিষ্যৎ শিক্ষা লাভ যেন দ্বীন ও দুনিয়াবী কল্যাণে কাজে আসে তার জন্য জামা'তের সকল ভাই বোনের নিকট খাস দোয়া কামনা করছি।

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ও
আফরোজা রহমান
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফতুল্লা

* আমাদের দ্বিতীয় পুত্র 'আবিদুর রহমান আবিদ' গত নভেম্বর ২০১৫ অনুষ্ঠিতব্য জে,এস,সি, পরীক্ষায় 'আহমদনগর উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে জি,পি,এ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদনগর জামা'তের ডা. ইসমাইল বোখারী সাহেবের ছেলের ঘরের এবং জনাব সহিদ আহমদ সাহেবের বড় মেয়ের ঘরের নাতী। তার সুস্বাস্থ, পরবর্তী পড়ালেখায় সফলতা এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতির জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

ডা. আতিকুর রহমান ও
মোছাম্মাৎ পারুল আক্তার
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগর

বর্তমান বাইবেলের সংকলন ও এর ঐশী অবস্থান

মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ

বর্তমানে আমাদের সামনে যে বাইবেল বিদ্যমান তা দুই ভাগে বিভক্ত। (i) The old testament বা 'পুরাতন নিয়ম' (ii) The new testament বা 'নতুন নিয়ম'। নতুন নিয়মকে 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচার বলা হয়। ইঞ্জিল শব্দটি গ্রীক Evangel শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যাকে বাংলায় সুসমাচার বলা হয়। ইংরেজীতে বলা হয় গস্‌পেল (Gospel) যীশু বা ঈসা মসীহ্ (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ, অনুশাসন ও সুসংবাদসমূহের সমষ্টিকে তথা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে এবং অনাগত বিষয়ে যীশু খ্রিষ্ট যেসব সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেইসব ভবিষ্যদ্বাণীর সমষ্টিকে ইঞ্জিল বলে।

ইঞ্জিল নামে প্রত্যাদিষ্ট অনুশাসন বা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ কখনও পুস্তকাকারে এক সাথে প্রকাশিত হয়নি। বর্তমানে খ্রিষ্টানগণ ইঞ্জিল নামে পরিচিত নতুন নিয়মে মথি, মার্ক, লূক ও যোহন লিখিত চারটি সুসমাচারকে ঈশ্বর প্রদত্ত বাণী হিসেবেই মনে করে। অথচ তারা এটা জানে না বা জানতেও চায় না যে যীশু খ্রিষ্টের গত হবার পর তাদের মাঝে কোন ঐশীগ্রন্থ ছিল না। তবে তখনও পুরাতন নিয়ম বিদ্যমান ছিল। যীশু দুটি ভাষায় কথা বলতেন। একটি আরামেয়িক যা তার মাতৃভাষা ছিল, অন্যটি হিব্রু যা তার ধর্মীয় ভাষা। বর্তমান বাইবেলের যে পঠন আমরা পাই, তা আরামেয়িক বা হিব্রু ভাষা নয় বরং বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ। আরামেয়িক বা হিব্রু বাইবেলের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। তাই গ্রীক ভাষায় অনুদিত বাইবেল থেকে অন্যান্য ভাষায় বাইবেল অনুদিত হয়েছে। যীশু যে ভাষায় কথা বলতেন বা তার স্বজাতিদের যে ভাষায় উপদেশ দিতেন তা ছিল সিরিয়া-প্যালেস্টাইন অঞ্চলে প্রচলিত একটি কথ্য ভাষা, সেমেটিক গোষ্ঠির আরামেয়িক ভাষা। আর সুসমাচার রচয়িতারা যে ভাষায় তাদের সুসমাচারগুলো লিখেছিলেন তা ছিল অপভ্রংশ গ্রীক ভাষা।

সাধু মার্ক এর সুসমাচার ঃ পন্ডিতদের মতে সর্বপ্রথম সুসমাচার রচনা করেছিলেন সাধু মার্ক। তার রচনাকাল ৭০-৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তিনি যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্য পিতরের কাছ থেকে যীশু সম্বন্ধে যা শুনে ছিলেন, সেসব তিনি তার নিজের মত করে প্রকাশ করেন। তার রচনায় পদে পদে আশ্চর্য রকমের সংযম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বহু অবান্তর কথা ছেঁটে ফেলে দিয়ে সংক্ষেপে সামান্য দু'চারটি কথায় এমন একটি জলজ্যান্ত ছবি আঁকতে পারতেন যে, চরিত সাহিত্যে তার জোড়া পাওয়া ভার। সংযমের ফলেই নাকি তার রচনা স্থানে স্থানে যেমন বেশ ভাল করেই ফুঁটে উঠেছে, ঠিক তেমনি জায়গায় জায়গায় আবার হঠাৎ থেমে গিয়ে বেশ খানিক কাটাকাটি রসহীন একটি স্থূল বিবরণও হয়ে পড়েছে। পন্ডিতগণ বলেন, সংক্ষিপ্ত হওয়ার দরুণই লোকেরা মার্কের সুসমাচারে বোধ হয় তেমন তৃপ্তি পাচ্ছিল না। তাই জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারের সহায়ক হিসেবে আর একটু বৃহৎ সংস্করণের একটি সুসমাচার লেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই রকম একটি সুসমাচার লিখেন সাধু মথি।

সাধু মথির সুসমাচার ঃ পন্ডিতগণ ধারণা করেন যে, ৮০-৯০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় সাধু মথি তার সুসমাচার রচনা করেন। তারা বলেন মথি তার সুসমাচারে বেশির ভাগ মাল মসলা মার্কের সুসমাচার থেকে ধার করেছেন এবং তাতে কিছু কিছু নতুন প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়ে তাকে বেশ মনোরম করে তোলার চেষ্টা করেছেন। জনপ্রিয় করার চেষ্টার দরুণই তাকে জায়গায় জায়গায় কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। ফলে মার্কের চেয়ে তার সুসমাচারের সমাদর অনেক বেশি। সুসমাচার রচয়িতা মথিকে অনেকে যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্য করগ্রাহী (Tax collector) †লভির সাথে (যার নামও পরে মথি হয়েছিল) গুলিয়ে ফেলে দুজনকে নির্বিচারে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন, কিন্তু বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির হয়েছে যে, দুজন একদম আলাদা ব্যক্তি।

মথির পরিচয় এবং মথি লিখিত সুসমাচার সম্পর্কে বাইবেলের অনুবাদক ও প্রকাশক স্বীকার করেছেন যে, মথির ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মথি কোন্ ভাষায় সর্ব প্রথম এই সুসমাচার রচনা করেছিলেন, সে সম্বন্ধেও মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে এই সুসমাচারখানি মথি কর্তৃক লিখিত হয়েছিল ইবরানী ভাষায়। পরবর্তীতে এক একখানা অনুবাদ খ্রিষ্টানদের হাতে এসেছিল।

সাধু লূক এর সুসমাচার ঃ তৃতীয় সুসমাচার রচয়িতা লূক সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন অ-ইহুদী (none Jews) এই তথ্যটি ছাড়া তার সম্বন্ধে আর সব কথাই অনুমান নির্ভর এবং বিতর্কমূলক। একথা অবশ্য সব সুসমাচার রচয়িতার বেলায়ই প্রযোজ্য। তবু অধিকাংশ পন্ডিতের মতে লূক একজন ডাক্তার ছিলেন। সাধু পৌল সম্ভবত তাকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তবে, লূক যে পৌলের বন্ধু এবং তার প্রচারকার্যের সময় তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিলেন একথা এখন প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন। সাধু লূক তার সুসমাচারের ভূমিকাতে বলেছেন বটে যে, যীশুর সম্বন্ধে প্রচলিত বিবরণগুলো যত্নের সাথে অনুসন্ধান করে সেগুলোকে পরস্পর তুলনা করে তিনি যথাক্রমে তা লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আসলে তিনি মথির মতোই মার্কের সুসমাচারকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু উপকরণ অবশ্য তার নিজেরই সংগ্রহ করা, যা মার্ক ও মথির সুসমাচারে খুঁজে পাওয়া যায় না। লূকের সুসমাচার ৯৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে লেখা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

লূক রীতিমত লিখিয়ে লোক ছিলেন, ফলে উপকরণ বাছাই আর তা সাজানোর ব্যাপারে তিনি প্রতি পদেই এক দক্ষ শিল্পীর রচনা চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আর তার লেখার ঢংয়ে খানিকটা কাব্যরসের আস্বাদ থাকায় অন্য দুই সুসমাচার রচয়িতা মার্ক ও মথির রচনা থেকে তার রচনা একটু বেশি মনোগ্রাহী। লূক লেখাপড়া জানা লোক বলে তার বিবৃত ঘটনাগুলোকে তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তবে কিংবদন্তীর আকর্ষণ এমনই প্রবল যে, সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়ে উঠতে পারেননি। মথি, মার্ক ও লূক এ তিনজন সুসমাচার রচয়িতার রচনা ভঙ্গী ভিন্ন ধরনের হলেও বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রায় একই ধরনের।

সাধু যোহনের সুসমাচার ঃ সুসমাচার রচয়িতা যোহনের রচনা মার্ক, মথি ও লূকের রচনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এটিকে একটি ব্যাখ্যা পুস্তক বলে বর্ণনা করলে এমন কিছু অসংগত হয় না। যোহন তার সুসমাচারে যীশুর জীবনের ঘটনা আর তার দেয়া উপদেশগুলোকে এক একটি সূত্রের মতবিরোধ নিয়ে সে সবের একটি বিকৃত ভাষ্য লিখে গেছেন। যোহন যে সময় তার সুসমাচার রচনা করেছিলেন তখন খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচার প্যালেষ্টাইনের বাইরের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে হয়। আর লেখাপড়া জানা লোকেরাও যীশুর সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। সে কারণেই এমন একটি ব্যাখ্যা পুস্তকের দরকার পড়েছিল যা তখনকার প্রচলিত দার্শনিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যোহন তার ভাষ্যে সেই ভাবকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। তবে ব্যাখ্যা পুস্তকের মত যোহনের সুসমাচারও খানিকটা বিজ্ঞপ্তি গোছের। তার আদির সঙ্গে মধ্যের তেমন যোগ নেই। আবার মধ্যের সঙ্গে অন্তেরও সংযোগ কম। তবে তারই মধ্যে মাঝে মাঝে আশ্চর্য রকমের মন গলানো অনেক সদুক্তি এলোমেলোভাবে ছড়ানো আছে।

যোহন কে ছিলেন সে সম্বন্ধেও অনেক তর্ক বিতর্ক আছে। সে যাই হোক, তার সুসমাচার পড়ে একথাই মনে হয় যে, তিনি যীশুর ভাই কিংবা তার সাক্ষাৎ শিষ্য এ দুয়ের কেউই ছিলেন না। তিনি এমন এক ব্যক্তি, যিনি আগাগোড়া গ্রীক দর্শনের চর্চাকার। তার সুসমাচারখানি ১০০-১১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলে ধারণা করা হয়।

পন্ডিতদের ধারণা মথি, মার্ক, লূক ও যোহন লিখিত সুসমাচারগুলো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে লেখা হয়েছে। (১) মথিরটি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় (২) মার্কের ইতালীর রোমে (৩) লূকেরটি গ্রীসের ফিলিপাইয়ে এবং (৪) যোহনেরটি এশিয়া মাইনরের এফেসাস শহরে। তাদের সকলের সিদ্ধান্ত সব সময় একই রকমের না হলেও তার থেকে মোটামুটি এই ধারণা হয়, যে চারজন সাধু সুসমাচার লিখতে অগ্রসর হয়েছিলেন তারা কেউই যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন না। সুতরাং লেখার কাজ করতে তাদের প্রধানত শোনা কথার ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। কিন্তু শোনা কথার মস্ত এক অসুবিধা এই যে, সেটা পরস্পরের মুখে ফিরতে ফিরতে বিকৃতের ওপর বিকৃত হয়ে নানা রকমের অদ্ভুত আকার ধারণ করতে থাকে। সে কারণে ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে কোনো কথাকে কোনো কিছুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয় না। যীশুর জীবন বৃত্তান্ত ও উপদেশাবলী লেখা হওয়ার আগে তার শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে মুখে মুখেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রচার কার্যের সুবিধার্থে যে সুসমাচার লেখা হয় শুরুতে তা ভক্তদের সভায় গলা ছেড়ে পড়া হত। সে কারণে সুসমাচার লেখকদের এমনভাবে উপকরণ সাজিয়ে তুলতে হয়েছিল, যাতে শ্রোতার মন অনায়াসেই সে দিকে আকৃষ্ট হয়। যীশুর চরিত্রকেও এঁকে সবার সামনে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যাতে লোকে সহজেই তাকে 'যেসায়া ক্রাইষ্ট' বা 'মুক্তিদাতা মসীহ্' বলে চিনে নিয়ে বিনা দ্বিধায় খ্রিষ্টান ধর্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম বলে গ্রহণ করে নিতে পারে। এসব কারণে সুসমাচারের প্রতিটি কথাকে অক্ষরে অক্ষরে অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নিতে গেলে সত্য লাভের চেয়ে সত্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

ওয়াকফে জাদীদের বাজেট প্রেরণ প্রসঙ্গে

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) ০৮ই জানুয়ারী ২০১৬ জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের ৫৯তম বৎসরের ঘোষণা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমান যুগের আহমদীগণের চাঁদা আদায় ও মালী কুরবানীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন এবং যারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করেছেন ও যারা বেশি আদায় করেছেন তাদের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে এবং তাদের রিয্‌ককে যেন আল্লাহ্ অনেক অনেক বরকত দান করেন তার জন্য দোয়াও করেছেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় বিগত তিন বৎসর যাবৎ আমরা আমাদের প্রিয় হুযূর (আই.)-এর টার্গেট পূর্ণ করতে সক্ষম হতে পারি নি। এই বৎসর আমাদের প্রত্যেকের সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, যেন আমরা আমাদের যুগ খলীফার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনে সক্ষম হই ও হুযূরের দোয়ার বরকতের অংশীদার হতে পারি।

হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বৎসরের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং জামা'তের কেউই যাতে এই চাঁদার ওয়াদার বাইরে না থাকেন।

হুযূর (আই.) এর দপ্তর থেকে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও তাগিদ করেছেন, চাঁদার ওয়াদা যাতে পূর্বের চেয়ে বেশি করা হয় এবং প্রত্যেক জামা'তের অংশগ্রহণকারীর সদস্য সংখ্যা নওমোবাঈন সহ ১০০% যেন পূর্ণ হয়। সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ২০১৬ সালের ওয়াকফে জাদীদের বাজেট তৈরী করে (নাম, টাকার পরিমাণসহ) মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে পাঠাবেন। উল্লেখ্য যে, মার্চের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বাজেট সম্বলিত রিপোর্ট হুযূর (আই.) এর নিকট পাঠাতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণের এবং অঙ্গসংগঠনসমূহের সহযোগিতা কামনা করছি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ
মোবাইল : ০১৭১৪-০৮৫০৭০

ইসলাম প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও শান্তি নিশ্চিত করে

মৌলবী মোজাফফর আহমদ রাজু

নবী-রসূলগণকে তাঁদের আগমনকাল থেকেই জিহাদ করতে হয়েছে। জিহাদ হচ্ছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাপত্র। শান্তি রক্ষার জন্য, অন্যের অধিকার প্রদান ও রক্ষার জন্য জিহাদ করা। জগতের জন্য মনোনীত নবী-রসূলদেরকে যে শরীয়ত বা শিক্ষা দিয়ে অবতীর্ণ করা হয়, সেই শিক্ষাকে মানব সমাজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ হচ্ছে এক অকৃত্রিম সংগ্রাম। জিহাদ ধর্মীয়-শব্দ। জিহাদ করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলের মধ্যে যদি শান্তিই কায়েম না হয়, তো কিসের জিহাদ? আর তার সাথে আল্লাহ্, রসূল, বা ধর্মেরই বা কি সম্পর্ক? মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রিয় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) যতগুলো জিহাদ করেছেন, সবগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সকলের মধ্যে শান্তি কায়েম করা। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে–"আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না"।

উক্ত আয়াত বলে দিচ্ছে, যুদ্ধ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র পথে সৃষ্ট বাঁধা-বিঘ্ন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হতে হবে। মুসলমানদেরকে যদি জিহাদ বা যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে ঐশী-নেতৃত্বে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান যামানা হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগ। তিনি আগমন করে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে পুনরায় পৃথিবীতে কায়েম করার এক মহান জিহাদে নিয়োজিত হন। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় সেই জিহাদ বা সংগ্রাম ঐশী নেতা আল্লাহ্‌র খলীফার মোবারক নেতৃত্বে জারী আছে। হযরত নবী করীম (সা.) এর বাণীতে বলা হয়েছে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ বা জিহাদ করব, যতক্ষণ পর্যন্ত না শত্রু সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যখন তারা তা পালন করবে, তখন তাদের জীবন ও সম্পদ আমার হতে নিরাপদ, তবে শর্ত এই যে, তারা ইসলামের নির্দেশাবলী মেনে চলবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম)। মহানবী (সা.) এর দাবীর পরে তেইশ বছর জীবিত ছিলেন এবং তের বছর মক্কা দশ বছর মদীনার জীবনই মহান জিহাদের বা সংগ্রামের জীবন। নবী করীম (সা.) তাঁর জীবনে কখনও অন্যের কষ্টের কারণ হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ দেখাতে পারেন না। জিহাদ করলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র সাথে কারো সম্পর্ক হলে, তার দ্বারা কি কখনও সংঘাত, বা ফিৎনা বা অশান্তি কিংবা অপরের অধিকার বিনষ্ট বা ধর্মীয় স্বাধীনতা নষ্ট হতে পারে? কখনও না। বরং আল্লাহ্ প্রাপ্ত মানুষ সকলের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠাও শান্তির জন্য কাজ করবে বা শান্তি যাতে কায়েম হয় তাই ব্যবস্থা নিবে।

এ যুগের ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবীর পূর্বে দীর্ঘ সময় ইসলাম ধর্মের সেবায় লেখালেখি করে কুরআন, হাদীস, ইতিহাসের আলোকে ইসলামের নবী (সা.) এবং কুরআন সম্পর্কে ইসলাম ধর্মের শত্রু ও ইসলাম ধর্মের অবমাননাকারীদের অনেক ভ্রান্ত-চিন্তাধারার উত্তর প্রদান করে ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত আলেমদের এবং অনেক লেখকের প্রশংসা লাভ করেছেন। তিনি (আ.) ইসলামী

জিহাদ বা সংগ্রাম সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাও প্রশংসাকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর এক বিখ্যাত পুস্তক "সিতারায়ে কায়সারিয়াতে" লিখেন–"কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রয়েছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না এবং ধর্মের সাক্ষাৎগুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পেশ কর এবং নেক-নমুনা ও উত্তম-আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এ ধারণা পোষণ করো না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালানোর আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা, সে তলোয়ার দ্বীনকে (ধর্মকে) বিস্তার লাভের উদ্দেশ্যে হয়নি বরং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার কিংবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়েছিল, ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" আমাদেরকে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তরবারী বা বল প্রয়োগ বা কোন ফতোয়া দ্বারা যদি মানবের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভয়ভীতি তৈরী করা যেত, কিংবা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা-শরীয়ত কায়েম করা যেত, তাহলে সকল নবী-রসূলের জন্যই তার অনুমতি থাকতো। তের বছর ধরে মক্কাতে হযরত নবী করীম (সা.) কষ্ট না করে, (নাউযুবিল্লাহ্) উক্ত পথ অবলম্বন করতে আল্লাহ্ কর্তৃক আদেশ পেয়ে তা করতেন।

কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়? তের বছর হযরত নবী করীম (সা.) ধৈর্যের এ পাহাড় অবলম্বন করলেন, দৃষ্টান্তের এক মহান বৃক্ষ তৈরী করলেন, বিনয়-নম্রতা, ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, আদর্শ-নমুনা, দয়া-মায়া অসহায়দের পাশে সাহায্যের হাজারো দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। নিজে কষ্ট করেছেন, তিনি (সা.) কাউকে কষ্ট দেননি। নিজে (সা.) গালি শুনেছেন, তিনি (সা.) কাউকে শক্ত কথা বলেন নি। হাদীস হতে জানা যায়, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের আলেমগণ আমার ওয়ারিশ বা নায়েবে রসূল। ওয়ারিশ কাকে বলে? বাপ সম্পত্তি রেখে গেল, পাঁচটি সন্তানও রেখে গেল, বাবার রেখে যাওয়া সম্পদের ওয়ারিশ হবে সেই পাঁচ সন্তান। বিশ্বনবী, শ্রেষ্ঠ নবী, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় মা হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে তাঁর (সা.) সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুও মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন তখন তিনি (সা.) কতটুকু ধন-সম্পদ, টাকা, বা স্বর্ণ রেখে গেছেন? কে সেই রেখে যাওয়া ধন-সম্পদের ওয়ারিশ হবেন তাঁর (সা.) উম্মতের আলেমরা(!) আমরা বিশ্বাস করি প্রিয় মহানবী (সা.) বলেছেন, ওয়ারিশ হবে, অবশ্যই তা হবে তাঁর (সা.) রেখে যাওয়া সম্পদের ওয়ারিশ।

মহানবী (সা.) এর মক্কার তের বছরের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পদের এক পাহাড় যা, তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র তৌহিদ দুনিয়াতে কায়েমের জন্য অতিবাহিত করেছেন। প্রতিদিনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, মক্কার প্রতি ওলিগলিতে তৌহিদের প্রচার, দ্বীনের সেই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতেন। রাতে দীর্ঘ সময় খোদার দরবারে আহাজারী করে দুনিয়ার মানুষের হেদায়াতের জন্য তাঁর (সা.) প্রেমিকের দরবারে ফরিয়াদ করতেন। হযরত নবী করীম (সা.)এর সমস্ত সম্পদ ঐশী বাণী কুরআন, নবী করীম (সা.) এর অতি উৎকৃষ্ট সংগ্রামী জীবন বা হাজারো ধরনের আদর্শ। মা আয়েশা (রা.) এর খেদমতে জনৈক সাহাবী আরয করে জানতে চাইলেন, নবী করীম (সা.) এর সুমহান চরিত্র। মা আয়েশা (রা.) সাফ জানিয়ে দিলেন, 'হে বৎস! তুমি কি কুরআন পড়নি? সমস্ত কুরআনই হল মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর জীবন বা চরিত্র। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর উম্মতের আলেমগণ ওয়ারিশ বলতে কুরআন প্রচার করতে তিনি (সা.) যে ধরনের জিহাদ করেছেন, তেমনি জিহাদ বা সংগ্রাম যদি কোন আলেম করে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চিত ভাবেই হযরত নবী করীম (সা.) ওয়ারিশ। আলেম ওলামাদেরকে মনে রাখতে হবে, পবিত্র কুরআন প্রচার করতে গিয়ে কোন জাতিতে যেন নৈরাজ্য সৃষ্টি না হয়। মনে রাখতে হবে, ইসলাম কায়েম করতে গিয়ে বা ইসলামের নামে জিহাদ করতে গিয়ে কোন জাতির ধর্মীয় বা যে কোন মতবাদের স্বাধীনতা হরণ না হয়।

যেমন যদি কেউ অভিনয় করে কাঁদে তবুও তার ইন্দ্রিয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে তেমনি জিহাদ শব্দ ব্যবহার করতে যদি মহানবী (সা.) এর ধর্মের এক বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে সমাজ, ধর্ম, জাতিও আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ বিফলে যাবে এবং জাতিতে-জাতিতে সংঘাত তৈরী হবে, এর জন্য আল্লাহ্‌র বিচারের কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে হবে, যার পরিণাম ভয়াবহ। সূরা বাকারার এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা পরিষ্কার বলেছেন–'আর যতক্ষণ নৈরাজ্য দূর না হয়। এবং যতক্ষণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করা না যায়।' ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে (জিহাদ) যুদ্ধ কর। এর পর তারা যদি বিরত হয় তবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।"

অশান্তি সৃষ্টি হয়, এমন কোন ধরনের অবকাশ রাখা হয়নি। প্রত্যেকের জন্যই শান্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। কেউ কলেমা পাঠকারী দাবী করলে তার সম্বন্ধে একথা বলার কোন অধিকার ইসলাম ধর্মে রাখা হয়নি যে, 'তুমি মুসলিম নও'। বর্তমানে ইসলাম ধর্মের মধ্যে মানুষ শতধা বিভক্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন ফের্কার আলেমগণ কোথা থেকে পেল যে মুসলিম পরিচয় দিয়ে বা মুসলমান দাবী করে অন্যের জন্য অশান্তির কারণ হওয়া যায়। মহানবী (সা.) এর জীবনী থেকে বা পবিত্র কুরআন থেকে কোথাও এমন একটি শব্দ অথবা আয়াত পাওয়া যাবে না, যে কোন মানুষের আমার বা আমার মতাদর্শের না হলে তার জন্যে আমাকে অত্যাচারের পথ অবলম্বন করতে হবে? পাঠকগণ! জেনে আনন্দিত হবেন, এমন আদর্শ বা বাণী কমপক্ষে হযরত নবী করীম (সা.) এর ধর্মে নেই। ইসলাম ধর্ম পালনকারীগণ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করে যাবে। সে ধর্ম কখনও আল্লাহ্ প্রেরিত ধর্ম নয়, যে ধর্ম পালন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেউ অস্বস্থি বোধ করে। ধর্ম ও ধর্মীয় অনুসারীগণ যখন মূল ধর্ম-শিক্ষা ও মূল আদর্শগত শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করেন, কিন্তু দাবী ও বেশ-ভূষায় ধর্মের কথা বলা হয়, তখন তথাকথিত আলেম ওলামাগণ ধর্মের বহু বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা, ভুল নীতি, ভুল ধারণা অবলম্বন করে অসহায় অবুঝদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করতে থাকে।

সাহাবাগণ (রা.) ধর্মের জন্য যে জিহাদ বা সংগ্রাম করেছেন, তা ছিল সরাসরি আল্লাহ্ কর্তৃক আসমানী বাণী, যা মহানবী (সা.) এর ওপর অবতীর্ণ হচ্ছিল। ঐশী নেতৃত্বে জিহাদ বা সংগ্রাম হওয়ায় সেই সমস্ত জিহাদ বা সংগ্রামকে নেহায়েত ইসলাম ও ইসলাম ধর্মের নবীর (সা.) প্রতি শত্রুতা ছাড়া কোন ধরনের যুক্তিযুক্ত অজুহাত দেখাতে আজ অব্দি কেউ পারে নি বা পারবেও না। হে মুসলমান ভাইগণ! কেন ইসলামকে ও ইসলামের নবীর (সা.) এর শিক্ষাকে ভুল পথে পরিচালিত করছ? আসো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একজন সতর্ককারী শিক্ষক আগমন করেছেন, তাঁকে মান্য কর, তাঁর কাছে ঐশী জ্ঞান-ভান্ডার আছে, কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা আছে, ইসলাম ও ইসলামের মহান নবী (সা.) এর প্রকৃত ভালবাসা ও মাহাত্ম-মর্যাদার নমুনা

প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবজাতির সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আজ কিছু দুনিয়াদার নামধারী আলেম কথায় কথায় ফতোয়া দিয়ে থাকেন, কাফের, মুরতাদ ও মুনাফেক আখ্যা দেন। শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত হননা, তাদের শাস্তির ধরণ বর্ণনা করে শাস্তি দিতে উঠে পড়ে লেগে রাষ্ট্রের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করে তাদের শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায়। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি মানুষের জান, মাল ও সম্পদ পবিত্র করে দিয়েছেন। কারো জানের ওপরে হামলা করা তেমনি অবৈধ, যেমন অবৈধ এই মাসের এই এলাকার এই দিনের অমর্যাদা করা। এই হুকুম শুধু আজকের জন্যই নয়, শুধু কালকের জন্যও নয় বরং সেইদিন পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য যেদিন তোমরা খোদার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।" মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লার পরিবার, আল্লাহ্ তা'লা কোনক্রমেই সইবেন না যে, মানব হয়ে মানবের ক্ষতি সাধন করুক।

ইসলামী জিহাদের নামে সমাজ বা যে কোন জাতিতে অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করা কুরআন হাদীস কখনও সমর্থন করে না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা ইসলাম ধর্ম পালন করবে বা এর প্রচার করবে, তাদের দ্বারা তাদের ধর্মীয় শত্রুদের ক্ষতি সাধন বা ভয়-ভীতি কিংবা তাদের জান-মালের ক্ষতির চেষ্টা করা কুরআন ও আল্লাহ্-রসূলের সুন্নতের পরিপন্থী কাজ, যার প্রমাণ কুরআন হাদীসে অসংখ্য জায়গাতে বিদ্যমান। কোন ক্ষেত্রেই প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিকার, শাস্তির দাবী, বা শাস্তির জন্য হস্তক্ষেপ, জ্বালাও, পোড়াও, হত্যা, অশান্তির মতো কোন পদক্ষেপ অবলম্বনের বিন্দুমাত্র সুযোগ রাখা হয়নি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পক্ষ থেকে মানবের মধ্যে যখন কাউকে হেদায়াতের জন্য মনোনীত করেন, তখন উদ্দেশ্য হল, মানব যে আল্লাহ্‌র রং কে গ্রহণ করে সমস্ত মানব সমাজে তথা সমস্ত জমীনে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। নিম্নের আয়াত থেকে বুঝতে হবে, আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে (উপাস্যরূপে) ডাকে, তোমরা তাদের গালমন্দ করো না। নতুবা তারা শত্রুতাবশত না জেনে আল্লাহ্‌কেই গালমন্দ করবে। এভাবেই আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কার্যকলাপ সুন্দর করে দেখিয়েছি। এরপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই তাদের ফিরে যেতে হবে এবং তারা যা করতো, সে সম্বন্ধে তিনি (তখন) তাদের অবহিত করবেন"। কেউ মূর্তি পূজারী হোক বা কেউ অগ্নিকে খোদা মানুক, অথবা কেউ মানুষকে খোদা বলুক, কোন অধিকার রাখা হয়নি তাদের নিন্দা করার বা গালমন্দ করার। কেনই বা খোদা তা'লার রং ধারণ করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করা, সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বন্ধুত্ব এবং সৌহার্দ্য স্থাপন হোক। নবী করীম (সা.) জিহাদ করতে গিয়ে কোথাও উগ্রতা প্রদর্শন করার কথা ভাবাও যায় না বা অপরের কষ্টের কারণ হওয়া কিংবা অপরের মাল-সম্পদ লুট করা, জ্বালাও-পোড়াও, মারো কাটো এ নির্দেশ পাওয়া যাবে না। বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন, যিনি জগতের সকল মানবের জন্য রহমত কামনাকারী রসূল, তিনি (সা.)কোন ভাবেই শত্রু হলেও তার জন্য অশান্তির নীড় রচনা করতে পারেন না। মহানবী (সা.) এর জীবনে পঞ্চাশোর্ধ্ব যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। সেই ইতিহাস পাঠ করলে আমরা জানতে পারি, কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বাধীন মুসলমান ও মদীনার অন্যান্য মানবকে শান্তিতে রাখার জন্য আত্মরক্ষামূলক জিহাদের ব্যবস্থা ছিল।

আজ কিছু সংগঠন বা দল ইসলাম ধর্মের নামে, ইসলামের নবী (সা.) এর সেই সমস্ত পবিত্র জিহাদগুলোও আল্লাহ্‌র শরীয়ত পূর্ণতার জন্য যে জিহাদ সংগঠিত হয়েছিল তার দোহাই দিয়ে আজ মহানবী (সা.)কে তারা নাউযুবিল্লাহ্, বিতর্কিত করছে এবং হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জিহাদগুলোর পবিত্রতাকে কথিত আলেমরা ভুল পথে পরিচালিত করায় ইসলাম ধর্মের শত্রুর কাছে প্রশ্ন বিদ্ধ করছে। ইসলামী জিহাদের কথা যখনই আসবে, তখন মুরতাদ বা মুরতাদের শাস্তির বিষয়টি আলোচনায় আসে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক জানা যায়, ঐশী নেতৃত্বের ছায়াতলে যখন মানবজাতি আশ্রয় নেয়, তখন তারা বিনয়ী হয়ে অন্যের সকল অধিকার রক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, নিজে ধৈর্যধারন করে এবং অন্যকে সহিষ্ণু হতে বলে। ধর্ম কখনও মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করার নাম নয়। ঐশী নেতৃত্ব কখনও আল্লাহ্ ও রসূলগণের সুন্নতের বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

মহানবী (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আগমন করেছেন। তাঁর জামাত কায়েম হয়েছে। সারা দুনিয়ায় হাজার হাজার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচারকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে। বুখারী শরীফে হযরত মহানবী (সা.) বলেছেন, "ইয়াযাউল হারবা" ধর্মযুদ্ধ রহিত হবে। মহানবী (সা.) স্পষ্ট করে বলেছেন, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর যুগে ধর্মের নামে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধকে হারাম ঘোষণা করা হবে। কুরআন শরীফ দেখলে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, মাহ্‌দীর যুগের সাথে পৃথিবীর বড় বড় জাতিগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতোই উন্নত হবে যে, উন্নত হবার কারণে তাদের হাতে অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকবে। মাহ্‌দীর যুগে আল্লাহ্ তা'লা কলমের দ্বারা লিখনির মাধ্যমে যুদ্ধ করাবেন। কুরআন শরীফের সূরা আম্বিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি মাহদীর যুগে দাজ্জালি এক বড় ফেতনা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে। দাজ্জালি মোকাবেলা করবেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)।

আহমদীয়া জামাতের প্রাণ প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) তিনি আমাদের কান্ডারী ঐশী খলীফা। তিনি (আই.) সমস্ত বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর প্রধানদের কাছে পত্র প্রেরণ করে এবং আমেরিকা ও ইউরোপের নেতাদেরকে একত্রিত করে বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্বশান্তির কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে তাঁর ঐশী নেতৃত্বের দায়িত্বেও মহানবী (সা.) ও যুগ মসীহর (আ.)-এর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। হে পবিত্র হৃদয়বান মুসলমান ও বিশ্ববাসী! ধর্মের নামে নৈরাজ্য করার সুযোগ কোন ধর্মই অনুমোদন করে না। আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত বিশ্ববাসীকে বুঝার জন্য জ্ঞান দান করুন, আমিন।

সন্তান লাভ

গত ৩০-০৯-২০১৫ইং রোজ বুধবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত সন্তানের নাম রাখা হয় নাশিথা জাহান (সিনথিয়া)। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে সুস্থ্য ও ভাল রাখেন এবং তাকে যেন আমরা সঠিকভাবে তালিম তরবিয়ত দিয়ে লালন-পালন করার তৌফিক দান করেন সেজন্য সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

আতাউর রহমান সিরাজ ও
নুসরাত জাহান সিরাজ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

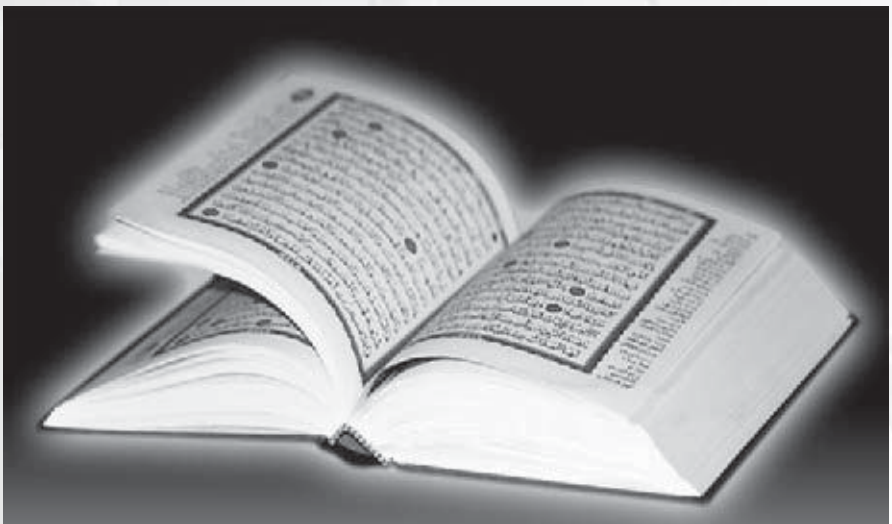

পবিত্র কুরআন ও দোয়া

মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(২য় কিস্তি)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লার শেখানো কয়েকটি দোয়াঃ

(ক)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অর্থাৎ- তুমি বল, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্! তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান কর ও যার কাছ থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও এবং যাকে চাও সম্মান দান কর ও যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সব কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আলে ইমরান, ২৭)

নিজের আশা-আকাঙ্খা ও কামনা-বাসনাকে মিলিয়ে জীবন পথে যে জাতি অগ্রসর হয় সে জাতি উন্নতি করে এবং যে জাতি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে জাতির পতন ঘটে। কেননা ক্ষমতা ও মহিমার একমাত্র উৎস আল্লাহ্ তা'লা। সুতরাং তাই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্বদা সচেতনতা অবলম্বন করা উচিত।

(খ) **"রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা"** অর্থাৎ- হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালন-পালন করেছিল; (সূরা বনী ইসরাঈল, ২৫) প্রত্যেক সন্তানের এই দোয়া হতে শিক্ষা নেয়া উচিত এবং নিয়মিত ভাবে উক্ত দোয়া পাঠ করা আবশ্যক। সুন্দর উপমার পুনরাবৃত্তি দিয়ে এ আয়াত পিতা-মাতার প্রতি মায়ামমতা জানাচ্ছে। যেহেতু পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসার পর্যাপ্ত প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়, সেহেতু এ বিষয়ে অপ্রতুলতা এবং ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য দোয়া করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ দোয়া প্রমাণ করেছে, পিতা-মাতা বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের প্রতি স্নেহ মমতার ব্যবহার করা জরুরী যেরূপ বাবা-মা শৈশবে তাঁদের সন্তানের লালন-পালনের জন্য করে থাকেন। দোয়াটি পিতা-মাতার জন্য পড়া হয়।

(গ)

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

অর্থাৎ- 'হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক তুমি আমাকে উত্তম ভাবে প্রবেশ করাও এবং আমাকে উত্তম ভাবে বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য এক শক্তিশালী সাহায্যকারী দান কর'। (সূরা বনী ইসরাঈল, ৮১) উল্লেখিত আয়াতে নবী করীম (সা.) এর মিনতীপূর্ণ দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেন এবং এই সূরার ২নং আয়াতে বর্ণিত 'ইসরা' সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তী মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, বাক্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই সুসংবাদ দেন, তাঁকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া এরূপ আশা নিয়ে দোয়া করেন যে তাঁর মদীনায় প্রবেশ যেন দ্বিগুণ আশিসপূর্ণ হয় এবং বর্তমান বাসস্থান মক্কা থেকে তাঁর হিজরত ও যেন নিরাপদ হয়।

(ঘ) **"রাব্বি যিদনী ইল্‌মান"** অর্থাৎ- 'হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও'। (সূরা তাহা, ১১৫)। উক্ত আয়াতের সম্পূর্ণ অর্থ হলো ঃ অতএব প্রকৃত অধিপতি আল্লাহ্ অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর (কুরআনের) ওহী তোমার কাছে সম্পূর্ণ করে দেয়ার পূর্বে তুমি কুরআন (পাঠের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না এবং একথা বলতে থাক, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান অন্বেষণ কর যদি সুদূর চীন দেশেও যেতে হয়, (সগীর: ১ম খণ্ড)। কুরআন মজীদের অন্যত্র বলা হয়েছে, জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার মহান অনুগ্রহ (২ঃ২৭০ এবং ৪ঃ১১৪)। জ্ঞান দু প্রকার: ক) যে জ্ঞান ওহী ইলহাম দ্বারা বিশেষ অনুগ্রহ করে মানবকে প্রদান করা হয়েছে (খ) যে জ্ঞান মানুষ নিজ প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করে।

(ঙ) "রাব্বি আউযুবিকা মিন হামাযাতিশ্ শায়াতিন" অর্থাৎ- হে আমার প্রভু-

প্রতিপালক! আমি শয়তানের সব কুপ্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই'। (সূরা আল্ মু'মিনুন ঃ ৯৮) এ আয়াতে 'শয়তানদের' শব্দ নবী করীম (সা.) এর শত্রুদের সর্দারদেরকে বুঝায় এবং 'কুপ্ররোচনা' দ্বারা মিথ্যা রটনা ও মানহানি এবং জঘণ্য কারসাজি ও প্রচারকার্যকে বুঝায়, যার মাধ্যমে তারা আঁ হযরত (সা.) এর বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতো। নবী করীম (সা.) কোন এক প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। তথাপি তিনি (সা.) সর্বদা শয়তান হতে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করে দোয়া করতেন। তাই উক্ত দোয়া আমাদেরকে বেশি বেশি পাঠ করা উচিত।

(চ) **"রাব্বিগফির ওয়ার হাম ওয়া আন্‌তা খাইরুর রাহিমিন"** অর্থাৎ- 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর এবং তুমি দয়ালুদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম। (সূরা আল্ মুমেনুন, ১১৯), এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) বলেছেন– অর্থাৎ- 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর এবং গোনাহ মাফ চাও আমি একদিনে একশত বার তওবা করি (মুসলিম)। নবী করীম (সা.) এর কোন পাপ না থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করতেন। সুতরাং সে অনুপাতে আমাদের কত বেশি প্রার্থনা করা উচিত একটু ভাবা দরকার। পাপীর ক্ষমা প্রার্থনাকে আল্লাহ্ তা'লা বেশি ভালবাসেন।

(ছ) **গোনাহগারদের জন্য ক্ষমার দোয়াঃ**

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٩﴾

অর্থাৎ- 'তুমি তাদের আযাব দিলে তারাতো তোমারই বান্দা। আর তুমি তাদের ক্ষমা করে দিলে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল্ মায়েদা, ১১৯)। নবী করীম (সা.) নিজের জন্য তো ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। যাতে উম্মতের কোন কষ্ট না হয়। প্রত্যেক জাতির নবীরাই উম্মতের মুক্তির জন্য চিন্তিত থাকতেন এবং পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। পবিত্র কুরআন মজীদ হতে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদেরকে ও আল্লাহ্ তা'লার নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক।

(জ) 'কাফির' তথা অবিশ্বাসীদের দোয়া বৃথা যায় ঃ 'আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরতেই থাকে। (সূরা আর্ রাদ, ১৫), যুগে যুগে অস্বীকারকারীরা ব্যর্থতাই অবলোকন করেছে। এমন কোন নবী নেই যাদের অস্বীকারকারীদের আল্লাহ্ তা'লা পাকড়াও করেননি! পবিত্র কুরআন শরীফে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ উল্লিখিত হয়েছে তাই নবী করীম (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়ে দিয়েছেন যে, অস্বীকারকারীদের দোয়া বৃথা যায়।

অতি পরিপূর্ণ ও সর্বব্যাপী দোয়া হচ্ছে সূরা ফাতিহা। এ সূরার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা হলো, 'ফাতেহাতুল কিতাব' বা (ঐশী) কিতাবের উদ্বোধনী সূরা। এ শিরোনামেই এটা সবচেয়ে বেশী পরিচিত এবং এ নামকরণের ভিত্তি বিশ্বস্ত হাদীস বিশারদদের বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান (তিরমিযি এবং মুসলিম)। শিরোনামটি পরে 'সূরা ফাতেহা' বা শুধু 'ফাতেহা' সংক্ষিপ্তরূপ লাভ করছে। এ সূরার আরো অনেক নাম আছে। তার মধ্যে ১০টি অধিক প্রমানসিদ্ধ যেমন, আল ফাতেহা, আসসালাত, আল্ হামদ, উম্মুল কুরআন, আল্ কুরআনুল আযীম, আস্ সাব্‌উল মাসানী, উম্মুল কিতাব, আশ্ শিফা, আর রুকাইয়া এবং আল্ কান্য। এসব প্রতিটি নাম সূরার অন্তর্নিহিত বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য প্রকাশ করে। 'সূরা ফাতেহা নামেই এ সূরা সবচেয়ে বেশি পরিচিত। যা প্রতি নামাযে তেলাওয়াত করা হয়ে থাকে।

দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভের দোয়াঃ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾

(১) অর্থাৎ- 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর ও আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।' (সূরা আল্ বাকারা, ২০২) এ আয়াতে এমন লোকদের কথা বলা হয়েছে, যারা কেবলমাত্র ইহলৌকিক কল্যাণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ধন-দৌলতে নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও সাধনা প্রার্থনাকে নিয়োজিত রাখেন, বরং ইহলৌকিক কল্যাণের সাথে সাথে পারলৌকিক মঙ্গলকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণপনে নিবেদন করতে থাকে। 'হাসানা'র অর্থ কৃতকার্যতা (তাজ) এ দোয়াটি অতি ব্যাপক। সকল মঙ্গলই এ দোয়ার আওতায় এসে যায়। রসূল করীম (সা.) এ দোয়াটি প্রায়ই পাঠ করতেন (মুসলিম)। অতএব উল্লিখিত দোয়াটি পাঠ করতে যেন আমরা অবহেলা প্রদর্শন না করি। অধিক হারে এ দোয়াটি পাঠ করা উচিত। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ কর। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে (তওবা করে) এসে গেছি। তিনি বললেন, 'আমি যাকে চাই আমার আযাবে জর্জরিত করি। কিন্তু আমার কৃপা সবকিছু পরিব্যাপ্ত করতো, যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, সত্যিকার অর্থে বলতে হয় যে, কল্যাণ লাভের জন্য পূণ্য কর্ম করা অত্যন্ত জরুরী। নেক আমলই মানুষকে কল্যাণ মন্ডিত করে বা কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। তাক্‌ওয়া বঞ্চিতরা সেই কল্যাণ পেতে পারে না। আল্লাহ্‌র কৃপা লাভের জন্য আমাদেরকে তাক্‌ওয়ার মান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবেই আশা করা যায় যে, আমরা দুই জগতেই কল্যাণরাজী লাভ করতে সক্ষম হবো, নচেৎ নয়।

খোদা তা'লার একান্ত অভিভাবকত্ব লাভের দোয়াঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٤﴾

অর্থাৎ- আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহক। (সূরা আলে ইমরান, ১৭৪) এই পৃথিবীতে যারা আল্লাহ্‌র হয়ে যায়, আল্লাহ্‌কে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয় এবং আল্লাহ্‌কে প্রকৃত বন্ধু মনে করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট হয়ে থাকে। এ দুনিয়াতে তাদের কোন প্রকার সমস্যা হয় না। আর যদি পরীক্ষা এসেও থাকে তাহলে আল্লাহ্‌ই তাকে কৃতকার্যতা দান করেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থাভাজন থাকা উচিত। তিনি বান্দার জন্য যা নির্ধারণ করবে তাতে সন্তুষ্ট থাকা মঙ্গলজনক।

সুধী পাঠক! শুভ সূচনা ও অশুভ পরিণামের দোয়াটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে শেখানো কয়েকটি দোয়া গ নম্বরে বর্ণিত দোয়াটি। যা সূরা বনী ইসরাঈলের ৮১নং আয়াতে উল্লেখিত। এছাড়া পিতা-মাতার জন্য দোয়াটি ঘ তে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পিতা-মাতার জন্য অপর দোয়াগুলো পরবর্তীতে উল্লেখ করা হলো।

(চলবে)

বাজামাত নামায আদায় করা

মৌলবী এনামুল হক রনি

নামায মু'মিনদের মিরাজ। নামায বেহেশ্‌তের চাবি। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নামায পরিত্যাগ করে সে কুফরী করে। মানুষের এবং শির্‌ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা। এসমস্ত হাদীস থেকে নামায পড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। মহান আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "ইন্নাস্ সালাতা কানাত আলাল মু'মিনিনা কিতাবাম্ মাওকুতা।" অর্থঃ নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায (আদায় করা) মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সূরা নিসা ঃ ১০৪) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) জামাতের সদস্যদের প্রতি নামায সম্পর্কে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে না, সে আমার জামাতভুক্ত নয়। তিনি (আ.) আরো বলেছেন, "সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিষ্ঠাবান চিত্তে আদায় করো যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে সাক্ষাতে দেখছ (কিশতিয়ে নূহ্)। এছাড়া যুগ খলীফাগণ প্রতিনিয়ত নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলে চলেছেন। তাহলে আমাদের নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কি কি করা উচিত তা প্রত্যেকের গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে।

নামায শ্রেষ্ঠ ইবাদত ঃ আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে তাঁর ইবাদত বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছে ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লালি ইয়াবুদু। অর্থঃ আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াহ্ ঃ ৫৭) আর এই ইবাদতের শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামায। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্য থেকে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে সেটি হবে নামায। যদি এ হিসাবটি নির্ভুল পাওয়া যায় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে গলদ দেখা যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরজগুলির মধ্যে কোন কমতি থাকে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কিছু নফল আছে নাকি, তার সাহায্যে তার ফরজগুলির কমতি পূরণ করে দাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই পূরণ করা হবে। (ইমাম তিরমিযী)

উল্লিখিত হাদীস শরীফ থেকে নামায প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে আমরা জানতে পারি। সুতরাং এই শ্রেষ্ঠ ইবাদত (নামায)কে আমরা আসুন প্রতিষ্ঠা করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর হাতে বয়আত করার সময় বয়আতের ৩নং শর্তের প্রথম বাক্যটি লক্ষ করুন ঃ "বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে। "হে আহমদী ভাই! এখন চিন্তা করুন নামায প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া কোন উপায় আছে কি?

নামায গুনাহ মুছে দেয় ঃ নামায পুণ্যকর্ম সৃষ্টি করে এবং গুনাহ দূর করে দেয়। মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ইন্নাস্ সালাতা তানসা আনিল ফাহগ্ শায়ী ওয়াল মুনকার" অর্থঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। (আনকাবুত ঃ ৪৬) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও এক জুমুআ থেকে আর এক জুমুআ পর্যন্ত পঠিত নামায এর মধ্যকার (সবগুনাহর) জন্য কাফফারাহ যে পর্যন্ত না কবীরা গুনাহ করা হয়। (ইমাম মুসলিম) অপর একটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারো ঘরের দরজায় যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করতে থাকে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবাগণ বললেন : না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্ গুনাহ মুছে ফেলে দেন। (ইমাম বুখারী ও মুসলিম) এ হাদীসে গুনাহ মাফ করানোর জন্য নামায প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। শরীরের ময়লা দূর করতে যেমন ধৌত করা গোসল করা জরুরী তেমনি মন যা হৃদয়ের ময়লা বা পাপ দূর করার জন্য নামায পড়তে হবে।

নামায বাজামাত পড়লে সওয়াব বেশী ঃ নামায প্রতিষ্ঠা বা কায়েম করার তাগীদ পাক-কালামে বারবার এসেছে। বিরাশী বার তাগীদ এর কথা শুনে বুঝা যায় গুরুত্ব কতটুকু। তবে এই নামায প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাজামাত নামায পড়া অত্যন্ত প্রয়োজন। হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে বলতে শুনেছি, যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন অবস্থান করে অথচ তারা জামায়াত কায়েম করে নামায পড়ে না তাদের ওপর শয়তান সওয়ার হয়ে যায়। কাজেই

জামায়াতের সাথে নামায পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দলছুট একক বকরীকে বাঘে ধরে খায়। (ইমাম আবু দাউদ)

উক্ত হাদীস অনুযায়ী কোন মু'মিন চাইবে না যে তার ওপর শয়তান সওয়ার হোক তাই বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অপর একটি হাদীস হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির জামায়াতের সাথে নামায তার ঘরে আর এটা তখন হয় যখন সে অযু করে এবং ভাল করে অযু করে বের হয়ে মসজিদের দিকে চলতে থাকে, একমাত্র নামাযের জন্যই সে ঘর থেকে বের হয়। এ অবস্থায় সে যতবার পা ফেলে তার প্রতিবারের পরিবর্তে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ্ মাফ করা হয়। তারপর যখন সে নামায পড়তে থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে। যতক্ষণ সে নামাযের মুসল্লার ওপর থাকে এবং অযু না ভাংগে। ফিরিশতাদের সেই দোয়ার শব্দাবলী হচ্ছে ঃ হে আল্লাহ্! এই ব্যক্তির ওপর রহমত নাযিল করো। হে আল্লাহ্! এর ওপর রহম করো। আর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে নামাযের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে থাকে। (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম)।

উক্ত হাদীস হতে বা-জামাত নামাযের সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মসজিদে ভাল করে অযু করে যাওয়ার জন্য ও বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠার জন্য। এছাড়াও ফিরিশতারা দোয়া করেন যারা বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের সকলের উচিত বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠা করে বেশী সওয়াব লাভ করা।

মসজিদে নামায পড়াই নবী করীম (সা.) এর পদ্ধতি ঃ পাঁচ ওয়াক্ত এর ফরজ নামাযগুলি মসজিদে গিয়ে আদায় করা নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কাল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌র সাথে মুসলিম হিসাবে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে তার এই নামাযগুলির প্রতি অতীব গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য, সেগুলোর জন্য আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ্ তোমাদের নবী (সা.) এর জন্য কিছু হেদায়েতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নামায এই হেদায়েতের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যদি তোমরা নিজেদের ঘরেই নামায পড়তে থাকো, যেমন এইসব ব্যক্তি জামাত ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমাদের নবীর পদ্ধতি পরিত্যাগ করে থাকলে তোমরা অবশ্যই গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছো। আর আমরা তো আমাদের লোকদের এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাদের মধ্যে একমাত্র পরিচিত মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামায়াত ত্যাগ করতো না। আর কোন কোন লোকতো এমনও ছিল যে, দু'জন লোকেরা সহায়তায় তাঁকে আনা হতো এবং নামাযের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। (ইমাম মুসলিম) এ হাদীস থেকে বা-জামাত নামায মসজিদে আদায় করা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ হয়। মুনাফিকরা ঘরে নামায পড়তো প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমাদের উচিত মসজিদে গিয়ে বা-জামাত নামায আদায় করা।

মু'মিনের সম্পর্ক মসজিদের সাথে ঃ

আল্লাহ্‌র ঈমানদার বান্দাদের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহের সাথে। মসজিদে নামায আদায় না করলে মু'মিনগণ শান্তি লাভ করতে পারে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেন, যখন তোমরা কোন লোককে বরাবর মসজিদে আসতে দেখ তখন তার ঈমানদারীর সাক্ষ্য দাও। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহে আবাদ করে তারা যারা আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান এনেছে, শেষ দিনের ওপর ঈমান এনেছে.....। (ইমাম তিরমিযী)। অতএব আসুন আমরা মু'মিন হিসাবে মসজিদে গিয়ে বা-জামাত নামায আদায় করি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, নামাযে ভাবী বিপদের প্রতিকার রয়েছে। তোমরা অবগত নও যে উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি (নিয়্যতি) আনয়ন করবে। সুতরাং দিবসের উদয়নের পূর্বেই তোমরা তোমাদের মওলার সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে। তিনি (আ.) আরো বলেছেন, প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি তাক্ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছো এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো। (কিশতিয়ে নূহ) সুতরাং আমাদের সকলের উচিত খোদা ভীতির সাথে মসজিদে গিয়ে বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠার তৌফিক দিন, আমীন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"বিশ্বের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রকৃত মুসলমানের করণীয়।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ১৫ মার্চ, ২০১৬-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

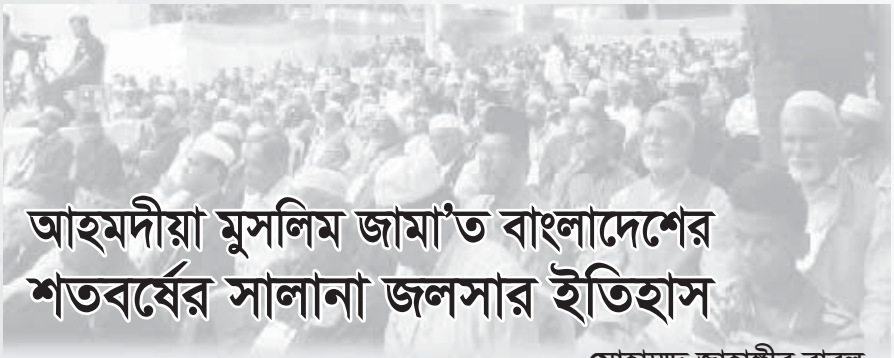

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৮ম কিস্তি)

১৯৪৭-১৯৫১

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র পরিণত হয়। তখন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে। ফলে ১৯৪৭ সালে প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কোন সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৪৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩০তম সালানা জলসা। অতঃপর ১৯৪৯ সালে ৩১তম এবং ১৯৫০ সালে ৩২তম সালানা জলসা জাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হেডকোয়ার্টার্স ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় অধিক সংখ্যক জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে প্রাদেশিক জলসা ও মজলিস শূরাসহ জামাতের বৃহৎ কর্মকান্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে জামাত বিস্তার এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপনের প্রেক্ষিতে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে প্রাদেশিক জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকায় ১৯৫১ সালে স্থানান্তর করা হয়। ফলে ১৯৫১ সালের ৩৩তম সালানা জলসা ঢাকার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে প্রাদেশিক জলসা ঢাকায় অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে।

১৯৫২–১৯৫৩

১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক আহমদী শহীদ হন। ফলে উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৫৩ সালের ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ৩৪তম সালানা জলসা। এর পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব। জলসার সাথে শুরার অধিবেশন এবং প্রাদেশিক আমীর ও তাঁর আমেলার নির্বাচন হয়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রাদেশিক সালানা জলসা

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ, ১৯৫৩ তারিখ ঢাকা দারুত তবলীগে প্রাদেশিক সালানা জলসা, প্রাদেশিক শুরা কমিটির অধিবেশন, প্রাদেশিক আমীর এবং প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সেক্রেটারী সাহেবগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে কতগুলো বিষয় নিবেদন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রাদেশিক সালানা জলসার ব্যয় নির্বাহের জন্য বন্ধুগণের প্রতি ইতিপূর্বে চাঁদার আবেদন প্রেরিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আবেদন এই, যে সমস্ত বন্ধুকে আল্লাহ্ তা'লা ইতোমধ্যে কোন সন্তান দান করেছেন এবং তাদেরকে আকিকা সম্পন্ন করবারও তৌফিক দান করেছেন, তাঁরা যদি সালানা জলসা উপলক্ষে আকিকার গরু, বক্‌রী ইত্যাদি বা এর মূল্য আদায় করে দেন তবে তাঁদের সন্তানদের আকিকার মাংশ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত আহমদীদের নিকট পৌঁছতে পারে। আশা করি এ বিষয়ে প্রত্যেক সঙ্গতি সম্পন্ন বন্ধুই এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন।

তৃতীয় কথা এই, জলসায় কোন্ জামাত থেকে কত সংখ্যক মেহমান আসবেন, তদ্বিষয়ে একটি আনুমানিক হিসাব পাওয়া গেলে জলসার জন্য প্রস্তুত আহার্য্য দ্রব্যের অপচয় হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। অতএব বন্ধুগণ প্রত্যেক জামাত হতে এ বিষয়ে একটি আনুমানিক সংখ্যা প্রেরণ করলে খাকসার বড়ই বাধিত হব।

চতুর্থ কথা এই, প্রত্যেক আগন্তুক নিজ নিজ বিছানা, মশারী ও বদনা ইত্যাদি সঙ্গে আনবেন।

পঞ্চম নিবেদন এই, প্রত্যেক আঞ্জুমান এবং প্রত্যেক আহমদী যাদের মাসিক চাঁদা, ওসিয়্যতের চাঁদা ইত্যাদি দেয়া নেই, তা প্রাদেশিক সালানা জলসার পূর্বে আদায় করবার পূর্ণ চেষ্টা করবেন। আপনাদের দোয়া প্রার্থী

খাকসার–
দৌলত আহমদ খাঁ খাদেম বি.এ. বি.এল., সেক্রেটারী মাল, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া। (পাক্ষিক আহমদী ফেব্রুয়ারী-১৯৫৩)।

১৯৫৪-১৯৫৮

বর্ষ পরিক্রমায় জলসা অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে ৩৫তম, ১৯৫৫ সালে ৩৬তম, ১৯৫৬ সালে ৩৭তম, ১৯৫৭ সালে ৩৮তম এবং ১৯৫৮ সালে ৩৯তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালের জলসায় আশি হাজার টাকা ব্যয় হয়। ১৯৫৮ সালের ২৪-২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জলসার পর ২৬ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার শুরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তখন পাক্ষিক আহমদীর অক্টোবর ১৯৫৮ সংখ্যা সালানা জলসা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯

২০-২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪০তম জলসা। তখন নিম্নলিখিত বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। ১। জনাব এস, এম, হাসান সি, এস, পি, ২। সাহেবযাদা হযরত মির্যা জাফর আহমদ বার-এট্-ল, ৩। মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ, ৪। জনাব বদর উদ্দিন আহমদ বি, এল, ৫। জনাব সৈয়দ খাজা আহমদ, ৬। জনাব ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী এম, বি, ডি, পি, এইচ, ৭। হযরত শেখ মোহাম্মদ হোসেন (রা.), ৮। জনাব আনোয়ার আলী, ৯। মওলানা মুহিবুল্লাহ্, ১০। জনাব সূফী রহিম বক্স, ১১। জনাব সোলায়মান, ১২। জনাব আব্দুর রাজ্জাক এম, এ, ১৩। জনাব আনিছুর রহমান বি, এল, ১৪। জনাব এম, বি, ভূঞা, ১৫। জনাব ওমর বশির আহমদ, ১৬। মওলানা মমতাজ আহমদ, ১৭। জনাব কে, আর, খাদেম ই, পি, সি, এস, ১৮। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বি, এ, ১৯। জনাব আজমল শাহেদ বি, এ, ২০। জনাব আবুল হোসেন, ২১। জনাব ডি, এ, কে, খাদেম বি, এল, ২২। জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী বি, এ, ২৩। জনাব মির্যা আলী আখন্দ বি, এস, সি, ২৪। মওলানা ফারুক আহমদ এইচ, এ, এবং ২৫। জনাব আহসান উল্লাহ্ সিকদার। (পাক্ষিক আহমদী, জানুয়ারী ১৯৫৯)।

সে সময় বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। যিনি পরবর্তী কালে চতুর্থ খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে ধর্ম প্রচারে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি তখন নব প্রতিষ্ঠিত নায়েম ওয়াকফে জাদীদ ও নায়েব সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এ জলসায় তাঁর পদচারণা কর্মসূচিকে আরো আনন্দঘন, প্রাণবন্ত ও সরগরম করে তোলে।

হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারার সুদর্শন সুপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পৌত্র সবার দৃষ্টি নন্দিত হন। তাঁর সাথে মুলাকাতে সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। মহানুভব বিনয়ী মানুষটি প্রাণ খুলে কথা বলেন এবং সবার সাথে আলিঙ্গন করেন। জলসার অধিবেশনে তাঁর সভাপতির আসন অলংকরণ এবং ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত ভাষণ সকলকে মোহিত করে তোলে। তিনি জামাতে আহমদীয়ার নব তাহরিক ওয়াকফে জাদীদের উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে ভাষণ দেন। বাঙালি আহমদী যুবকদেরকে ইসলামের সেবায় জিন্দেগী ওয়াকফ এবং ওয়াকফে জাদীদের ফান্ডে সকলকে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান।

কর্মসূচি অনুসারে জলসা সার্থক ও সফলভাবে সম্পন্নের পর ২২ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব থেকে মজলিস শুরার অধিবেশন হয়। সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব মহান বুযূর্গ হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব শুরার কর্মসূচির সফলতায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নবগঠিত আমেলায় নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়–ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ এবং এ পদের দায়িত্ব অর্পিত হয় মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের ওপর। তখন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব।

১৯৬০

১৯৬০ সালের ১৯-২১ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪১তম সালানা জলসা। তখন জলসার সাথে প্রত্যহ বাদ মাগরিব প্রাদেশিক জামাতের মজলিসে শুরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি অনুসারে জলসা ও শুরার অধিবেশন সার্থক ও সফল হয়। জলসা সমাপ্তির পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার সালানা জলসা

গত ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ তারিখ পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার সালানা জলসা মহাসমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জলসায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত জেলা হতে আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীগণ এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য গয়ের আহমদী ভ্রাতাগণ যোগদান করেন। জলসার প্রথম দিবস বিকাল ৩টা হতে ৬টা, দ্বিতীয় দিবস সকাল ৯টা হতে ১২টা এবং বিকাল ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিবস সকাল ৯টা হতে ১২টা পর্যন্ত মহিলাদের অধিবেশন হয়। অতঃপর সমাপ্তি অধিবেশন ৩টা হতে ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জলসায় বহিরাগত এবং স্থানীয় বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতিত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর মজলিস শুরা বা পরামর্শ সভার অধিবেশন জারী রাখা হয়। মজলিস শুরাতে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আগামী বছরের (মে ১৯৬০ হতে এপ্রিল ১৯৬১ পর্যন্ত) বাজেট, তবলীগ কার্য, পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ, আহমদী পত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ের কার্য প্রণালী নির্ধারণ করা হয় এবং প্রাদেশিক আঞ্জুমানের সেক্রেটারী নির্বাচন করা হয়। সেক্রেটারীগণের মঞ্জুরী আসলে তাঁদের নাম 'আহমদী'তে প্রকাশ করা হবে। (পাক্ষিক আহমদী ফেব্রুয়ারী ১৯৬০)।

১৯৬১

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪২তম সালানা জলসা ২১-২৩ এপ্রিল ১৯৬১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এবং মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তাদের আগমনে জলসা আনন্দমুখর হয়ে উঠে। জলসার কর্মসূচি ঢেলে সাজানো হয়। তখন জলসায় নিম্নলিখিত বক্তাগণ বক্তৃতা করবেন। ১। মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ, ২। জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, ৩। মৌলভী ডি,এ,কে, খাদেম (এডভোকেট), ৪। মৌলভী কে, আর খাদেম, (রিটায়ার্ড ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিপুটি ডাইরেক্টর), ৫। মৌলভী মোহম্মদ মোস্তফা আলী, (ডিপুটি ডাইরেক্টর), ৬। মৌলভী আব্দুল মতিন চৌধুরী, ৭। সাহেবজাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব, ৮। মৌলভী সৈয়দ এজাজ আহমদ, ৯। মওলানা মুহিবুল্লাহ, আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী, ১০। আল্লামা জিল্লুর রহমান, আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী, ১১। মওলানা ফারুক আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী, ১২। মৌলভী আনওয়ার আলী, ১৩। মৌলভী আহসানউল্লাহ সিকদার, ১৪। সাহেবযাদা হযরত মির্যা জাফর আহমদ (বার-এট-ল), ১৫। মৌলভী বদর উদ্দিন আহমদ, বি, এল, ১৫। মৌলভী মোহাম্মদ সামসুর রহমান (বার-এট-ল), ১৬। মৌলভী গোলাম সামদানী খাদেম বি, এল, ১৭। মৌলভী মোহাম্মদ বি,এ। (পাক্ষিক আহমদী, এপ্রিল ১৯৬১)।

কর্মসূচি অনুসারে ২১ এপ্রিল ১৯৬১ বিকাল ৩টায় প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ মাহমুদুল হাসান আমীর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া। অধিবেশন সমাপ্তির পর বাদ মাগরিব প্রাদেশিক মজলিসের শুরার অধিবেশন হয়। এতে সাবকমিটি গঠন করা হয়। ২২ এপ্রিল সকালে মহিলাদের অধিবেশন হয়। বিকালের অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব প্রাক্তন আমীর পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া। তখন তালিম ও তরবিয়তের ওপর এক অসাধারণ বক্তব্য রাখেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। যা বাঙালি আহমদীদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মনপ্রাণ পুলকিত হয়ে উঠে। রাতে শুরার অধিবেশন হয়। ২৩ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে সভাপতির মসনদ আরোহন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের আলোকে ঐশীবাণীর ব্যাখ্যায় এক অভূতপূর্ব ভাষণ দান করেন। মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের ওপর এক আবেগাপ্লুত বক্তব্য রাখেন। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের অনেক যুবক ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম হতে উদ্বুদ্ধ হন এবং এর কার্যক্রম অনেক বৃদ্ধি পায়। এদেশে তাঁর তত্ত্বাবধানে পূর্ণদ্যমে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। সৃষ্টি হয় খোদার রাহে জিন্দেগী ওয়াকফকারী তেজোদীপ্ত বাঙালি মোয়াল্লেম। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এবং মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের পদচারণায় এবং প্রাণবন্ত ভাষণ দানে জলসা সার্থক ও সফল হয়। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার ৪২তম সালানা জলসা

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পূর্বের ন্যায় এই বছরও পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার সালানা জলসা নির্দিষ্ট তারিখে সুসম্পন্ন হয়েছে। জলসায় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা হতে আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণ এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁয়ের অনেক গয়ের আহমদী ভ্রাতা ভগ্নী যোগদান করেন। এবারকার জলসার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হল যে, এই জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (আই.) এর সুযোগ্য পুত্র সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব এবং প্যালেষ্টাইন ও মিশরের ভূতপূর্ব মিশনারী আল্লামা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব যোগদান ও বক্তৃতা করেছেন। (পাক্ষিক আহমদী ৩০ এপ্রিল ১৯৬১)

(চলবে)

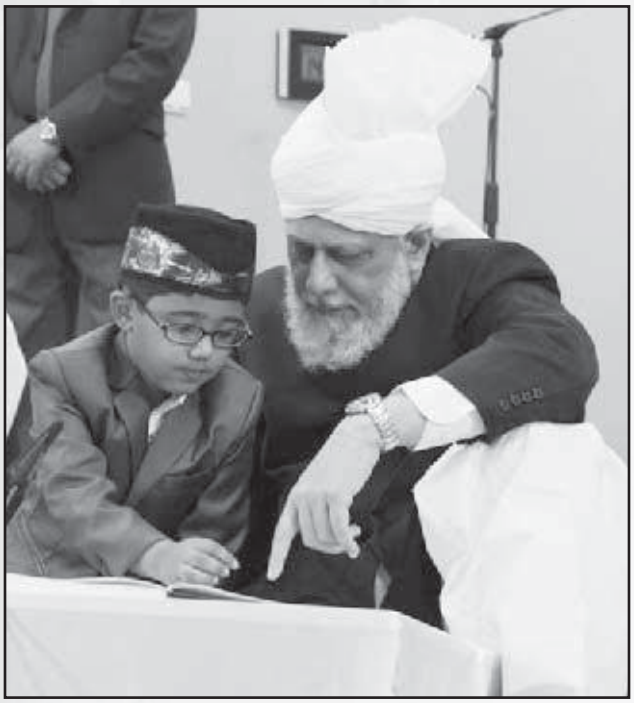

সন্তানদের উত্তম তালিম তরবিয়ত

আব্দুস সামাদ,
সাতক্ষীরা

প্রত্যেকটি পরিবার এক একটি জামাত, সেখানে আছেন লাজনা, আনসারুল্লাহ্, নাসেরাত, খোদ্দাম ও আতফাল। আর প্রত্যেক পরিবারে তালিম তরবিয়তের প্রধান ভূমিকা বা চাবিকাঠি হলেন 'মা'। পিতা হলেন পারিবারিক জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং মাতা হবেন তালিম তরবিয়ত সেক্রেটারীর মত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন প্রত্যেক পরিবার যদি সংশোধন হয় তবে জামাতের অর্ধেক তরবিয়ত হয়ে গেছে। সংসারে মায়ের কাজ হল ঘর কন্যার কাজ করা এবং সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা। যখন তারা শিশু-কিশোর তখন শিশুর প্রথম বিদ্যালয় হল মায়ের কোল। এখন হয়েছে কি? মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে একটা চাকুরী নেয় বা অর্থ আয় করার জন্য একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। ফলে কি হয়? এসব মেয়েদের বিবাহ জীবনে সংসার নামক প্রতিষ্ঠানে দেখাশুনার জন্য একটা লোক নিয়োগ করে। সংসার, সন্তান-সন্ততি কাজের লোকের তত্ত্বাবধানে রেখে বাইরে যায়। ফলে যা হবার তা হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিয়ের সময় কন্যার ধার্মিকতা সহ যদি এগুলো মিলে যায় তবে তা খুবই ভালো হয়। কিন্তু সবচেয়ে বুনিয়াদী বিষয় হল ধার্মিকতা প্রাধান্য দিতে হবে। ছোট বেলায় শিশুরা মাতা পিতাকে অনুসরণ করে। মাতাপিতা যা করে শিশুরা তা দেখে। যখন কথা বলার সময় হয় না তখন শিশু মা বাবাকে অনুসরণ করে। যখন কথা বলতে শেখে তখন শিশু তাই বলে যা মাতাপিতা বলে। তাই শিখে যা মাতাপিতা তাকে শিক্ষা দেয়। মা যদি কলম দ্বারা লেখে শিশু তখন মায়ের কাছ থেকে কলম নিয়ে মায়ের মত করে লিখতে চায়।

বাধা দিলে কান্নাকাটি করে। এই বয়সটা শিশুকে শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত সময়। একটি চারা গাছ যেভাবে বড় করতে হয় তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, সে ভাবে ছোট শিশুকে গড়তে হবে। গাছ যদি সোজা করে বড় করেন তা সোজাই হবে, বাঁকা হবে না। আমার সন্তানরা মাকে বলত "তুমি" আর পিতাকে বলত "আপনি" কেননা আমি তাদের মাকে 'তুমি' বলতাম এবং তাদের মা আমাকে বলতো "আপনি"। আজ অবধি আমার সন্তানদের সেই অভ্যাস অব্যাহত আছে। আমার মনে পড়ে আমি শিশু বয়সে আব্বাকে আব্বা বলতাম না। লোকে আমার বাবার নাম ধরে ডাকত, আমিও নাম ধরে ডাকতাম। অবশ্য তিনি কার্য্যবশত অধিকাংশ সময় বাইরে থাকতেন। বড় একটা দেখা হত না। এই অবস্থায় একদিন আমার মা তার কোলে শোয়াকালে শেষ রাত্রের দিকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আমাকে আব্বা বলার জন্য। অনেক বুঝালেন আমি মায়ের কথায় এত উৎসাহিত হলাম যে সেই ভোরে আব্বা আব্বা আব্বা বলে ডাক দিলাম। আব্বা তখন উঠে বললেন, তুমি জেগে গেছ? আমি বললাম, "হ্যাঁ আমি জেগেছি।" সেই থেকে আমি আব্বা বলা শুরু করলাম। অবশ্য বয়স হলে হয়তো বিবেকের তাড়নায় আব্বা বলতে হতো। কিন্তু শিশুকালের সেই স্মৃতি আমি ভুলিনি। সংসার নামক প্রতিষ্ঠানে 'মা' কেন্দ্রবিন্দু। কেননা বাবাকে সংসার নির্বাহের জন্য রুজি রোজগারের কারণে প্রায়শ ঘরের বাইরে থাকতে হয়। সংসার গড়তে হয় মাকে। আর মা যদি আয় রোজগার করেন তবে গৃহে সেটা করতে পারেন। যেমন হাতের কাজ, সবজি চাষ, হাঁস মুরগি, গরু ছাগল পালন। এ সব অর্থনৈতিক কাজ গৃহে থেকে করা যায়। সন্তানদের উত্তম তরবিয়তের স্বার্থে মাকে ভূমিকা নিতে হবে। এটাই সংসার প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভাবতে হবে আমার, ভবিষ্যত বংশধর কি হবে? মা যদি টেলিভিশন দেখেন আর সন্তানকে বলে পড় পড়। আবার মা বাবা সন্তান মিলে টেলিভিশন দেখেন। তখন সন্তান মা বাবাকে বলে "আব্বু আম্মু আপনারা অন্যদিকে তাকান এখন খারাপ ছবি হচ্ছে। আপনাদের দেখা যাবে না"- বলে সন্তান মা বাবাকে বাধা আর নিজে তা দেখছে। এসব মায়েরা সন্তানদের তরবিয়ত দিতে ব্যর্থ হবে। মা পাশে বসে সন্তানের পড়া দেখাবে আর দোয়া ও তসবীহ করবে। আল্লাহ্ বলেন, "নিজেকে এবং নিজ বংশধরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও" সূরা তাহরিম। আমাদের নবী (সা.) বিবাহিত জীবনে নবুওয়াত লাভের পূর্বে অঢেল সম্পত্তি পেয়েছিলেন। এক দুজন দাস দাসি থাকলে তাদের কত সম্পত্তি থাকে কিন্তু তিনি পেয়েছিলেন দেড়শ দাস দাসী সম্পদ পাহারা দিবার জন্য। অথচ তিনি সকল দাসদাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সকল সম্পদ গরিব দুঃখীদের আত্মীয়-স্বজন এতিম মিসকিনদের অসহায়দের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। রাখেন নাই। তিনি গরীবদের মত জীবন যাপন পছন্দ করতেন। নবুওয়াত জীবনেও তিনি অঢেল সম্পদ পেতেন কিন্তু বিলি করে দিতেন, না খেয়ে রোযা রাখতেন, পেটে পাথর চেপে রাখতেন। তার (সা.) গৃহে অনেক সময় হাঁড়ি জ্বলতো না। হযরত (সা.) এর এই জীবন পদ্ধতি মুসলমানদের আদর্শ।

আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা এই রসূলের অনুসরণ করলে আমি তোমাদের ভালোবাসবো, ক্ষমা করবো (আল কুরআন) হযরত উমর (রা.) হযরত (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থ সঞ্চয়ে তো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হল.....তা আমরা কি সঞ্চয় করবো? হযরত (সা.) বললেন, "সঞ্চয় কর কৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকরকারী রসনা ও ধার্মিক স্ত্রী। কাজ কর্মের ক্ষেত্রে তো আমরা সকল সময়

অন্তরে যিকর (স্মরণ) জারী রাখব বা আল্লাহ্‌র স্মরণ করব। আর কৃতজ্ঞ হৃদয় হলো যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা.... অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ তার চেষ্টা সাধ্য জীবন কাটায় সেটাই আলহামদুলিল্লাহ্‌। কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অধিকারী এক নারীর উদাহরণ হল.....একবার হযরত ইব্রাহিম (আ.) তার পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে দেখতে গেলেন, সেখানে তিনি ইসমাঈল (আ.)কে তার মায়ের সাথে ধু ধু মরুভূমিতে শিশু অবস্থায় ছেড়ে আসছিলেন। অর্থাৎ বর্তমান কাবা শরীফ। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যেয়ে দেখলেন–ইসমাঈল বাড়িতে নেই। তিনি তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসমাঈল কোথায়? তার স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গেছেন। তখন ইব্রাহীম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন সংসার কিভাবে চলে? ইসমাঈলের স্ত্রী বলল, "আলহামদুলিল্লাহ্‌ শিকারের মাংস খাই আর জমজমের পানি খাই।"

তখন তিনি তাদের মাংস ও পানিতে বরকত হওয়ার জন্য দোয়া করলেন, আর বললেন, ইসমাঈল আসলে বলবে যেন তার ঘরের চৌকাঠ বজায় রাখে। তিনি অর্থাৎ ইব্রাহিম (আ.) এজন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন কারণ সে স্ত্রী ছিল কৃতজ্ঞ হৃদয়ের মহিলা। আবার যখন ইসমাঈল (আ.) কিশোর বয়সে পৌঁছলে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাকে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে জবাই করছি। তোমার কি মত? ইসমাঈল (আ.) তখন বললেন, "হে আব্বা আপনার ওপর যে আদেশ হয়েছে তা আপনি পালন করুন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। ইসমাঈল (আ.) কেন এই কথা বললেন? এজন্য যে তিনি তার মায়ের কাছে তার পিতার সম্বন্ধে উন্নত তরবিয়ত পেয়েছিলেন, তার মা তাকে তরবিয়ত দিয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আ.) সেখানে থাকতেন না। তা হয়ত তাকে বুঝিয়ে দিলেন, তোমার পিতা একজন মহান ব্যক্তি। তিনি আল্লাহ্‌র নবী। তার কথায় পালন করবে। আল্লাহ্‌ তোমাকে মঙ্গল করবেন।

এরকম উন্নত তরবিয়ত পেয়েই ইসমাঈল (আ.) পিতার কথা নির্দ্বিধায় রাজী হয়েছিলেন। আমাদের যেন নূহ্‌ (আ.) এর স্ত্রীর মত পথভ্রষ্ট স্ত্রী ও বেতরবিয়ত সন্তান না হয়। আল্লাহ্‌ বলেন, পুরুষ নারীদের ওপর কর্তা। (সূরা নিসা) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে যেমন একজন নেতা থাকে সংসার রূপ প্রতিষ্ঠানে পিতা, স্ত্রী ও সংসারের কর্তা বা নিগরান। সুতরাং পুরুষকে দেখতে হবে তার সংসারের তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে আল্লাহ্‌ নির্ধারিত সীমার মধ্যে চলছে কিনা। আল্লাহ্‌ পাক কালামে বলেছেন, হে নবীর স্ত্রীরা...তোমরা জাহেলী যুগের মহিলাদের মত সাজসজ্জা করে বাইরে যেও না। গৃহেই থাক এবং আল্লাহ্‌র নাযেলকৃত জ্ঞানের বহুল আলোচনা কর (সূরা আহযাব)।

এই আদেশ প্রত্যেকের গৃহের জন্য এখন কার্যকারী। গৃহ যেন অশ্লীল গান, বাজনা, সিনেমা, নাটক ছবি না থাকে। এসব আমাদের প্রজন্মকে ধ্বংস করছে। অনেক বেতরবিয়ত গৃহ আছে যেখানে ছেলে মেয়েরা লাফ দিয়ে আগুনে ঝাপ দেয়। অ আহমদী ছেলেমেয়ে বিয়ে করে মুরতাদ হয়। তারা আহমদী গয়ের আহমদী কোন পার্থক্য রাখে না। আর মুরতাদরা কাফের। তারা সংশোধিত না হলে কাফের অবস্থায় তাদের মৃত্যু হবে। (সূরা বাকারা ঃ ২১৮) আর কাফেররাই যালেম। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)। যালেমদের দোযখের আগুন স্পর্শ করবে। (সূরা হুদ ঃ ১৪৪)। এই মুরতাদদের সাথে সম্পর্ক রাখবে যেসব পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন তারাও যালেম। (সূরা তওবা ঃ ২৩) একজন নারীর যদি সন্তান না হয় তবে তার মন খারাপ হয়।

আল্লাহ্‌ বলেন, "অতঃপর যখন সে (পুরষ) তাকে সঙ্গমাচ্ছন্ন করে তখন সে (স্ত্রী) এক লঘুভার ধারন করে আর সে স্ত্রী তা নিয়ে চলাফেরা করে। আর যখন সে স্ত্রী ভারাক্রান্ত হয় তখন তারা উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) এই বলে দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্‌ তুমি আমাদের একজন নেক সন্তান দাও (সূরা আ'রাফ ঃ ১৯০)। এই নারী তার সন্তান ভূমিষ্ট হলে আল্লাহ্‌ তাকে সন্তানের লালন-পালনের জন্য মাতার হৃদয়ে সন্তানের জন্য অপরিসীম দয়ামায়া স্নেহ আদর সৃষ্টি করে দেন এবং সে স্ত্রী তার সন্তানকে কষ্ট করে বড় করে। এই সন্তানকে কেন আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করলেন? যেন সে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী হয়। মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত। সন্তানের তরবিয়ত শুরু হয় শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে। মায়ের স্বভাব আচরণ সন্তানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই সন্তান পেটে থাকলে মা গান বাজনা, নাটক, সিনেমা, অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকবে।

তাই মাকে জান্নাতি হতে হবে এবং তার সন্তানকে ইবাদতকারী বানিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে তোহ্‌ফা স্বরূপ পেশ করতে হবে। তবে নারীর জীবন হবে যেমন স্বার্থক তেমনি সন্তান হবে সাফল্য অর্জনকারী দুনিয়া ও আখিরাতে। আহমদী মায়েরা যদি শিশু থেকে কিশোর পর্যন্ত "নেসাব ওয়াকফে নও" বই যে বয়সে যে সিলেবাস সে অনুযায়ী তার সন্তানদের শিক্ষা দেয় এবং সন্তানরা মাতাপিতার তত্ত্বধানে "তবলীগী গাইড" বই এর প্রতিদিন এক পাতা করে শেষ করে এবং ভালভাবে বুঝে গৃহে কুরআন পড়ে নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলে। পিতা-মাতা গৃহে ইসলামের মূর্তিমান আদর্শ হয়। সে সব গৃহের সন্তান বেতরবিয়ত হতে পারে না। প্রতিটি পরিবার আহমদীয়া জামাতে মূল শিকড় (Root of the Jamat)।

একটি সুস্থ পরিবার–একটি সুস্থ সমাজ, সুস্থ দেশ, সুস্থ জাতি। আমাদের জামাতে লাজনাদের যে প্রোগ্রাম হয় তখন মায়েদের ডেকে নিয়ে উত্তমভাবে তরবিয়তের ব্যবস্থা করতে হবে। গল্পে আছে পশু ও পাখিদের যুদ্ধ হবে। পশুদের সেনাপতি শৃগাল আর পাখিদের সেনাপতি বাজপাখি। বাজপাখি মৌমাছিদের গোয়েন্দা রিপোর্ট আনতে বলে যেন পশুদের যুদ্ধ কৌশল জেনে সে মোতাবেক যুদ্ধের সময় ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এখন মৌমাছি শুনছে সেনাপতি শৃগাল বলছে, "আমার লেজ যতক্ষণ উঁচু থাকবে তোমরা পশুরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আর যদি আমার লেজ নীচু হয় তবে যে যার মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে"। এ রিপোর্ট সেনাপতি বাজপাখি শুনে মৌমাছিদের নির্দেশ দিয়েছে, আমাদের যুদ্ধ হবে একটাই....তা হলো তোমরা মৌমাছিরা দলে দলে শিয়ালের লেজে ঝাপিয়ে পড়ে হুল ফুটাতে থাকবে। বাস! কথা অনুযায়ী কাজ। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে শৃগালের লেজ নিচু হয়ে গেল। পশুরা পালিয়ে গেল।

সুতরাং লাজনাদের প্রোগ্রাম টার্গেট করতে হবে মায়েদের। অধিকন্তু মায়েরা যদি ইসলামী নীতিদর্শন, মা আমার মা, পর্দা প্রগতির দিশারী, হযরত ফাতেমা (রা.) এর জীবনী, হযরত খাদিজা (রা.) এর জীবনী, সীরাতে হযরত আম্মাজান (রা.), বিবাহ ও জীবন এ সব বইগুলি মায়েরা পড়েন তবে প্রচুর জ্ঞান অর্জন হবে। তাঁদের সন্তানরা উত্তম তরবিয়ত পেয়ে ভবিষ্যত জামাতকে পরিচালিত করবেন। আজকের উপযুক্ত শিশু ভবিষ্যতে উপযুক্ত পিতা ও নেতা। এভাবে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধশালী হয়ে গড়ে উঠবেন। অধুনা কালে শোনা যায় নারীর ক্ষমতায়ন, নারীরা শিক্ষিত হয়ে পুরুষের পাশাপাশি বেপর্দায় তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবেন এটা নয়। নেপোলিয়ান বলেছেন,

"আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি দেব"। তবে লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, নারীর ভূষণ, যেমন পুরুষের গাম্ভীর্য। তাই নারীরা তাদের নিজস্ব সংগঠন নিয়ে নিজেদের পরিমন্ডলে এগিয়ে যাবেন। পর্দার মাধ্যমে তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবেন। আমি দেখি আমাদের জাতীয় সংসদে অনেক মহিলা পর্দা করে বসেন।

মুসলমানদের এক যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় নিশ্চিত দেখে এক মহিলার সহ্য হচ্ছিল না। তখন মহিলা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলেন, ঝাপিয়ে পড়লেন যুদ্ধক্ষেত্রে। কাটতে কাটতে ব্যূহ ভেদ করতে লাগলেন। আবার কাটতে কাটতে ফেরত আসতে লাগলেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল, মুসলমানদের বিজয় হল। তখন সেনাপতি খালিদ-বিন ওয়ালিদ বললেন, হে মহিলা তুমি কে, মুখের পর্দা খুলে ফেল– আমি তোমাকে দেখতে চাই। মহিলা উত্তর দিলেন, আমি বীরাঙ্গনা খাওয়ালা। আমি মুসলিম মহিলা। মুখের পর্দা সরাতে পারি না। সাবাস নারী। সাবাস বীরাঙ্গনা। জিন্দাবাদ খাওয়ালা। এরূপ অনেক মহিলা আছেন যারা তাদের জীবনে পর্দাবৃত্ত হয়ে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) সিফিফ্‌ফেনের যুদ্ধে সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমাদের দেশেও শোনা যায় অতীতে পর্দার ভিতর থেকে মহিলারা জমিদারী চালিয়েছেন। সুতরাং হে নারী! উঠ, জাগ। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে পুরুষের পাশাপাশি পর্দাবৃত্ত হয়ে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখ। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন– "বিশ্বে যা কিছু মহান চির কল্যাণ কর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।" অবশেষে আমাদের প্রিয় হুযূর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) তার এক বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা শেষ করবো।

হুযূর (আই.) বলেন, "হে আহমদী মায়েরা, সে সৌভাগ্যবান মায়েরা। যারা এ যুগের ইমামকে চিনতে পেরেছেন, তার আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে রেখেছেন। দুনিয়ার বিরোধিতা কবুল করেছেন, এবং এই অঙ্গীকার করেছেন যে, আমরা সর্বদা ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করব। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন এবং দেখুন আমরা এই অঙ্গীকার থেকে দূরে তো সরে যায়নি। আমাদের ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদির ওপর অগ্রাধিকার করা কেবল মাত্র নিজের সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় তো। আমরা এটিকে সম্মুখে অগ্রসর করছি কি। আমরা এই অঙ্গীকারকে সম্মুখে নিজেদের বংশধরদেরকে এবাদুর রহমান ও সালেহীনদের দলে শামীলকারী বলার অধিকার রাখি কি?

আল্লাহ্ আমাদের যে আমানত অর্পণ করেছেন। সেই আমানত যা আমাদের গর্ভ থেকে এ জন্য জন্ম দিয়েছিলেন যে, আমরা যেন তাদের উত্তম তরবিয়ত দিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে তোহফা হিসেবে পেশ করি। আমরা এবং আমাদের সন্তানরা উত্তম বলার যোগ্যতা রাখি কি? যদি উত্তর হ্যাঁ সূচক হয় তাহলে অভিনন্দন। নিজেদের ঘরের পরিবেশ উত্তম ও পবিত্র বানাতে হবে। যে ভাবে, স্বামী-স্ত্রী একটি নেক ও পবিত্র সম্পর্কের সৃষ্টি করে। আর এভাবেই প্রত্যেক আহমদী বংশানুক্রমে একটি নেক ও পবিত্র জীবন প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাবে। তাদের থেকে যে সন্তানের জন্ম হবে সে সফলতার শিখরে পৌঁছে যাবে এবং সে সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

আল্লাহ্‌পাকের দাসত্ব প্রসঙ্গে

খালিদ আহমেদ সিরাজী

আল্লাহ্‌পাকের বান্দা বা দাস হওয়া সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় এই বিশ্বাসে কারো দ্বিমত নাই। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী নবী, রাসূলগণ এবং খলীফাগণ কখনো আল্লাহ্‌পাকের বান্দা হতে লজ্জাবোধ হতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কারন খোদা তা'লার দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা, আদেশ নিষেধ পালন করা, সৌভাগ্যের ও মর্যাদার বিষয়। এক কথায় আল্লাহ্‌পাক ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করা অমর্যাদার কাজ অর্থাৎ বিদআত।

বর্তমান বিশ্বে লক্ষ্য করা যায় খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.) কে ঈশ্বর পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, মুশরিকরা ফিরিশতাদের ঈশ্বর দুহিতা ও দেবী মুর্তি নির্মাণ করে পূজা অর্চনা ইতিমধ্যে শুরু করেছে। আবার মুসলমানদের অনেকে পীর প্রথা প্রচলন করে মাজারে, মাজারে দু'আ ও মানত করে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌পাক এই ধরনের কাল্পনিক বিশ্বাসীদের হিসাব নিবেন। পবিত্র কুরআনে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা দিয়েছে এই বলে, 'ফাদখুলী ফী ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতি'- তোমরা আমার আল্লাহ্‌র দাসত্বের আওতায় প্রবেশ কর এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। এতে পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে প্রদত্ত সর্বশেষ পুরষ্কার হচ্ছে জান্নাত লাভ করা।

এই কাংখিত জান্নাত লাভের অন্যতম যোগ্যতাধারী হলেন আল্লাহ্‌পাকের খাস বান্দাগণ ও আল্লাহ্‌পাকের অনুগত দাসগণ। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌পাকের অনুগত হতে হলে আল্লাহ্‌পাকের আদেশ, নিষেধ ইহজগতে পালন করতে হবে। তারাই চূড়ান্তভাবে সফলতা লাভে সক্ষম হবেন। তাদের পরকালে ভয় নাই। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌পাকের দাসত্বকে গ্রহণ করতে চায় না, যুগের ইমামকে মানতেও চায় না, বরং অবাধ্যতা প্রকাশ করবে, অহংকারে নিমজ্জিত হবে, আল্লাহ্‌পাক তাদের সকলকে বিচার দিবসে জিজ্ঞাসিত ও বিচার করবেন এবং বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তখন কোনক্রমেই আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পীর, ফকির অভিভাবক খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্ পাকের দাসত্বকে মেনে নিয়ে ঈমান আনয়ন করবে, সৎ কাজে আত্মনিয়োগ করবে, এবং যুগের ঈমামকে মানবে, তারাই পরিপূর্ণ সওয়াব ও আল্লাহ্ পাকের ভালবাসা লাভ করবেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ পাবেন। হয়তো বা আল্লাহ্ পাকের দীদার বা দর্শন লাভ করবেন। মনে রাখতে হবে, দাসত্বের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি তখনই মানুষের মাঝে দেখা যায় যখন বান্দাহ্ সেজদায় নিপতিত হয়, এই সেজদাহরত অবস্থায় বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্‌পাককে স্মরণের মাধ্যমে নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। এই অধিকতর নৈকট্য লাভ বান্দার জন্য আল্লাহ্‌পাকের দীদার লাভের পথকে সুগম করে চূড়ান্ত মঞ্জিলে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

তাই আল্লাহ্‌পাকের দাসত্বকে স্বীকার করে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা উচিত।

মালী কুরবানীর এক উন্নত দৃষ্টান্ত

ডা. শেখ হেলালউদ্দিন আহমদ

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পার না যদি না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৩)।

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আরো বলা হয়েছে, "এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করো আর নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংস করো না আর পুণ্য বা সৎকর্ম কর নিশ্চয় সৎকর্মশীলগণকে আল্লাহ্ ভালবাসেন" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)।

পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাৎপর্য ও মর্ম উপলব্ধি করে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে সকল সাহাবীগণ মালী কুরবানী করতে অধিক অগ্রগামী ছিলেন, তারা হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত উমর (রা.) ও উসমান গনী (রা.) এবং হযরত তালহা ও হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)।

উল্লেখিত সাহাবীগণ দ্বীনের খেদমতে মালী কুরবানীতে অনেক অনেক অগ্রগামী ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে তারা খুবই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীগণের মধ্যেও মালী কুরবানী করার এমন নজির পাওয়া যায় তবে এখানে শুধু তাঁর একজন অতি নিষ্ঠাবান সাহাবীর কথা উল্লেখ করা হলো। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীগণের মধ্যে এক নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন হাফেজ ডা. রশীদ উদ্দীন সাহেব। যার পিতা-মাতা দু'জনই কুরআনের হাফেজ ছিলেন। আরো উল্লেখ্য যে, তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাও কুরআনের হাফেজ ছিলেন। তঁর সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) খুব ভাল জানতেন। তাঁরা বংশ পরম্পরায় খলীফা বংশ ছিলেন, তাই নামের পূর্বে খলীফা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হযরত খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব কোন এক হসপিটালের মেডিকেল অফিসার ছিলেন। তিনি যা বেতন পেতেন তার অর্ধেকের বেশী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে তুলে দিতেন।

তিনি এত বেশী মালী কুরবানী করতেন যে, ভাবতেও অবাক লাগে। তাঁর এই কুরবানীর অবস্থা দেখে হযরত (আ.) তাঁকে লিখে জানাতে বাধ্য হন যে, আপনাকে এখন আর মালী কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য বলতে হয় জাযাকুমুল্লাহ।

একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেবকে ডেকে বললেন, আমি জানতে পারলাম, আপনার বিবি এবং আপনার কন্যা কুরআনের হাফেজ।

আমি আমার পুত্র মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের সাথে আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব রাখছি। এমন প্রস্তাব শুনে তিনি খুশীতে যারপর নেই বলতে লাগলেন যে, এতো আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। এরপর তিনি তারিখ ঠিক করে এহেন শুভ কর্ম সম্পন্ন করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব একদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সাহাবী অপর দিকে জাগতিক দিক থেকে বেয়াই এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর শ্বশুর। পরবর্তীতে হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর নানা হন কেননা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল মুসলেহুল মাওউদ (রা.) এর প্রথম সন্তান সাহেবযাদা হযরত মির্যা নাসের আহমদ। যিনি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা নিযুক্ত হন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এটি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মালী কুরবানীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বা একটি ঐতিহাসিক স্মরণীয় ঘটনা।

যেহেতু হযরত খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব মালী কুরবানীর তাৎপর্য ও এর কল্যাণের বিষয় বুঝেই স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে তা মান্য করতেন।

আর মহান আল্লাহ্ ও তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে উচ্চ মোকামে স্থান করে দিয়েছেন। পরিশেষে দোয়া করি আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে মালী কুরবানী করার প্রেরণা দান করুন, আমীন।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত গভীর দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের মরহুম মাসউদুল হক সিরাজী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব তাহের আহমদ সিরাজী গত ৪ জানুয়ারী ২০১৬ দিবাগত রাত ২-৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম মেকিকেল কলেজ হাসপাতালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ও হৃদযন্ত্রের জটিলতার কারণে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী ও পুত্র সন্তান রেখে গিয়েছেন। চট্টগ্রামস্থ আহমদীয়া মসজিদ 'বাইতুল বাসেত'-এ বাদ যোহর মরহুমের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়।

বিপুল সংখ্যক আহমদী সদস্য/সদস্যা ছাড়াও বহু অ-আহমদী ভ্রাতাও জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করেন এই জন্য জামা'তের সকলের কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

খালিদ আহমেদ সিরাজী
সেক্রেটারী ইশায়াত, চট্টগ্রাম

নবীনদের পাতা-

একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়-দায়িত্ব

রেজোয়ানা করিম রোদেলা,
আহমদনগর

একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার রয়েছে অনেক দায়-দায়িত্ব, এখানে গুরুত্বপূর্ণ চারটি দায়িত্বের কথা আমি উল্লেখ করতে চাই–

প্রথমত একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে, আমাদের কর্তব্য হবে, আমরা যেন ঘরে বসে নাটক, সিনেমা, গান-বাজনায় মেতে না থাকি। ফলে প্রাশ্চাত্যের কালচারের প্রভাবে, ঘরের পরিবেশ নষ্ট হবে এবং বিভিন্ন সামাজিক কদাচার আমাদের অভ্যাসে পরিণত হবে। আমাদেরকেও প্রভাবিত করবে। ফলে সামাজিক বিশৃংখলা ও সামাজিক অবক্ষয় প্রতিষ্ঠিত হবে–আহমদী সমাজে ও ঘরে ঘরে। আর এ অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং নিজ পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখার জন্যই–খলীফাতুল মসীহ্ নিয়মিত এমটিএ দেখার তাগিদ করেছেন।

দ্বিতীয়ত আহমদী হিসেবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো– খিলাফত ব্যবস্থাপনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখা। আর এটিকে যদি নিশ্চিত করতে পারি, তবে ১০০% সংশোধন আশা করা যেতে পারে। কেননা, খিলাফতের কল্যাণেই ইসলামী সৌন্দর্য বার বার আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হচ্ছে। ধর্মীয় বিভিন্ন মিটিং, তালিম-তরবিয়তী প্রোগ্রাম, ইজতেমা ও জলসার মাধ্যমে খোদাপ্রদত্ত শিক্ষাগুলো সম্বন্ধে বার বার আমরা অবহিত হতে পারছি। ফলে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে পারছি, পাপমুক্ত থাকতে পারছি। খিলাফতের কল্যাণে যে জামাত তৈরী হয়েছে, সেই জামাত ও নিয়ামত থেকে যারা পুরোপুরি বঞ্চিত রয়েছে তারাই মূলত দুনিয়াতে গান-বাজনায় মত্ত থাকছে এবং নিজেদের চরিত্র, ঈমান, ধর্ম, কর্ম সব কিছুকে নষ্ট করে ফেলছে। ইসলাম থেকে তারা অনেক দূরে সরে গেছে।

আজকাল ইসলামী শিক্ষার মূল্যায়নতো কোথাও দেখা যায় না। একমাত্র আহমদীয়াতই ইসলামকে ধরে রেখেছে। ইসলামের সৌন্দর্য বার বার সমস্ত বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করছে। এ সমস্ত কিছু সম্ভব হচ্ছে– একমাত্র খিলাফতের কল্যাণে। খিলাফত ব্যবস্থা আছে বলেই আমাদের জামাত আছে। আর জামাত আছে বলেই– ধর্মীয় মূল্যবোধ টিকে আছে। আমরা যদি খিলাফতের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত না থাকি তবে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর ন্যায়, আমাদের মাঝেও ফাটল দেখা দিবে। আর এ ফাটল থেকে রক্ষা পাবার জন্যই আমাদের প্রিয় খলীফা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ দোয়ার তাহরীক করেছেন–যা আমাদেরকে বিভিন্ন অপকর্ম ও ফাটলের হাত থেকে রক্ষা করবে। আর এ দোয়ার বরকতেই আমরা ইনশাআল্লাহ্ আহমদীয়াত তথা ইসলামের বিজয় আনতে সক্ষম হবো। শুধু তাই নয় এ দোয়ার বরকতে আমরা নিজেদের ঈমান, কর্ম, চরিত্র উন্নত করতে শিখবো এবং খোদাকে লাভ করতে শিখবো। তাই খিলাফত ব্যবস্থা মুসলমান ঐক্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

তৃতীয়ত আহমদী হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো– আনুগত্য। কেননা খিলাফত ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় রাখার একটি মাধ্যম হলো আনুগত্য আর ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও আনুগত্যের মূল্যায়ণ চূড়ান্ত। তাই খিলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতি আমাদের আনুগত্যশীল হওয়া প্রয়োজন এবং খিলাফতের কল্যাণের মাধ্যমে আমাদের যে খলীফা রয়েছেন– তাঁর প্রতিটি নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলা ও বাস্তবায়ন করা উচিত। তবেই খিলাফতের সুশীতল ছায়ায় আমরা নিজেদেরক সতেজ রাখতে পারবো।

চতুর্থত একজন মুসলিম দায়িত্বশীল আহমদী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো, তবলীগের কাজকে প্রসারিত করা এবং ইসলাম ধর্মের যাবতীয় সৌন্দর্য সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করা। আর শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে তবলীগের কাজটি যদি না করি, তাহলে পৃথিবীতে আর কোন্ সম্প্রদায় এ দায়িত্বটি পালন করবে? আমরা যদি পিছিয়েই থাকলাম তবে শ্রেষ্ঠ উম্মত হবার দাবি কেন করছি?

তবলীগ করার সুবর্ণ-সুযোগ আমরা সব সময়ই পেয়ে থাকি। তাই আমাদের উচিত হবে– স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি যে, যেখানেই থাকি না কেন নিজ নিজ দায়িত্বে–শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে, শ্রেষ্ঠ উম্মতের কাজটি সর্বদাই করে যাবো, তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন– শুধু মুখের সুন্দর সুন্দর কথাই মানুষকে আকৃষ্ট করে না বরং ব্যক্তির চরিত্র, আচার-ব্যবহারই মানুষকে বেশী আকর্ষণ করে।

সুতরাং আহমদী ছেলেমেয়ে হিসেবে প্রথমে আমাদের নিজেদের মাঝে ইসলাম ও আহমদীয়াতের শিক্ষা মোতাবেক আমূল পরিবর্তন আনতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য আমাদের সাথে থাকে এবং অন্যেরা এটা দেখে যেন প্রভাবিত হয়। আর সেই সাথে আমাদের তবলীগের কাজটিও যেন সফল হয়।

আর এমনটিই যদি হয়, তবেই আমরা একজন প্রকৃত মুসলমান আহমদী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারি এবং নিজের দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যশীলতারও পরিচয় দিতে পারি।

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
“আত্মসংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব।”
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

আত্মা-সংশোধনের সর্বোত্তম মাধ্যম জুমুআর খুতবা

শুধুমাত্র জুমুআর খুতবা শুনলে বা দেখলেই চলবে না বরং হুযূর (আই.) আমাদেরকে যা বলেন তা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।

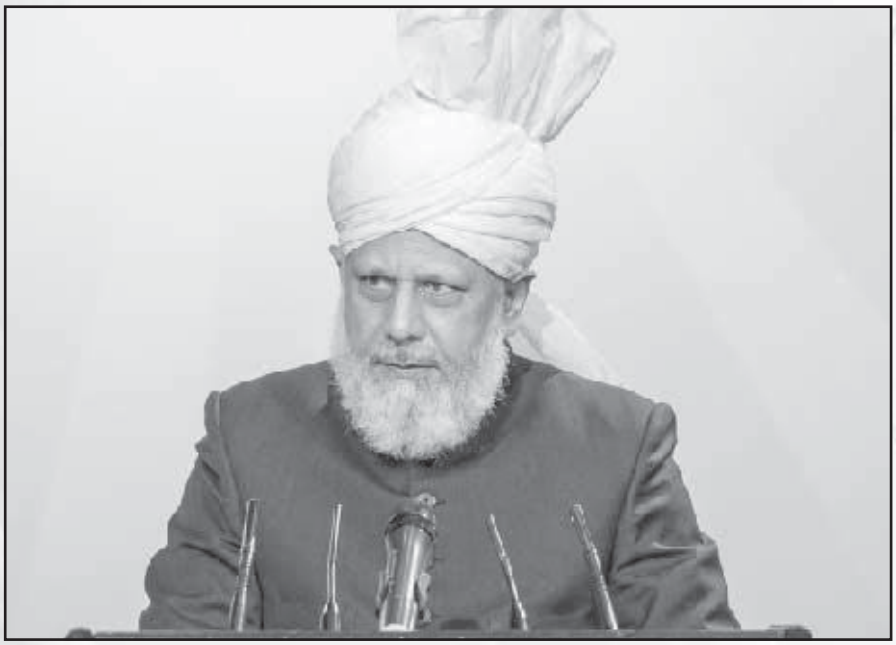

আত্ম সংশোধন বা আত্মশুদ্ধি হল আত্মার সংশোধন বা আত্মার তুষ্টি। এটা যেমন সত্যি তেমনি অনেকেই আছেন যারা নামে মাত্র আহমদী। আর তাদের আত্মার সংশোধনের দরকার, তবেই এরা প্রকৃত আহমদী হতে পারবে। আর এই আত্মার সংশোধনের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো জুমুআর খুতবা দেখা বা শোনা। আমরা যদি হুযূর (আই.) এর দেওয়া জুমুআর খুতবা সঠিক ভাবে দেখি বা শুনে থাকি তাহলে আমাদের না জানা অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি। হুযূর আমাদেরকে অনেক বিপদ থেকে মুক্তি লাভের পথ দেখান যা জুমুআর খুতবাই হুযূর (আই.) বর্ণনা করে থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা আমরা জুমুআর খুতবার মাধ্যমে জেনে থাকি। বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া চলছে। জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.) আমাদেরকে বার বার এই ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্য বেশি বেশি দোয়া ও দরূদ পাঠ করতে বলেছেন।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে জুমুআর খুতবা প্রদান করতেন। এতে তিনি (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন এবং উপদেশ বাণী প্রদান করতেন। হুযূর (আই.) আমাদের জন্যেও কুরআন পাঠ করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)কে মান্য করে আমরা তাকে মান্য করি এবং আত্মার সন্তুষ্টি লাভ করি। আমরা যদি পরিবারের সবাই মিলে হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা শুনি বা দেখে থাকি তাহলে অনেক অজানা জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।

পরিবারের ছোট সদস্যটিকে নিয়ে আমরা যদি জুমুআর খুতবা শুনি বা দেখে থাকি তাহলে ছোট থেকে তার মনের মধ্যে সেটি গেঁথে যাবে। পরবর্তী জীবনে তার ওপর এর প্রভাব বিস্তার করবে এবং সে কখনো ভুল পথে পা বাড়াবে না। আত্মার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যেমন নামায কায়েম করি, কুরআন পড়ি, তেমনি আত্মার সন্তুষ্টির জন্য হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুতবা শুনা বা দেখাও জরুরী। তাই বলে শুধুমাত্র জুমুআর খুতবা শুনলে বা দেখলেই চলবে না হুযূর আমাদেরকে যা বলেন তা বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেইভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর তবেই না হবে সত্যিকারের আত্মার সংশোধন। হুযূর (আই.) আমাদের জন্য যা তাহরীক করেন তা সঠিকভাবে পালন করলেই আমাদের আত্মার সন্তুষ্টি হবে।

তাই আমাদের উচিত আত্মার সংশোধনের জন্য নামায কায়েম করা, প্রত্যহ কুরআন পাঠ করা আর পরিবারের সবাই মিলে হুযূর (আই.)-এর খুতবা শোনা বা দেখা এবং সেই হিসাবে জীবন অতিবাহিত করা।

মোছাঃ বিনতে ইয়াসমীন
তেবাড়ীয়া, নাটোর

আজ লাখ লাখ মানুষ হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার মাধ্যমে নিজেদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। আসুন না, আমরাও চেষ্টা করি, নিজেদের জীবনকে পবিত্র করতে, প্রকৃত আহমদী হতে।

হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবায় আমরা নব জীবন লাভ করি

সমসাময়িক বিষয়াবলী এবং যুগের চাহিদা মাফিক বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের শিক্ষা প্রদান করে থাকেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা। যুগের নানাবিধ অপকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং নিজেদের চারিত্রিক বিভিন্ন দিকের প্রতি ভুলত্রুটি বের করে তা শোধরানোর জন্য হুযূর (আই.) প্রতি শুক্রবার জুমুআর খুতবায় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এভাবে আমাদের জীবনের আত্মসংশোধনে খলীফাতুল মসীহ্‌র জুমুআর খুতবা এক অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাগতিক জীবনে চলতে গেলে নানাবিধ চারিত্রিক দিকের কিছুটা হলেও ভুল পথে আমরা চলে যাই, হুযূরের খুতবা শোনার পর তা সংশোধনের আমরা চেষ্টা করি। হুযূর (আই.) আমাদেরকে চলার পথের সব ধরণের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের এই শিক্ষাও দেন, আমরা যেন মিথ্যা, অহংকার, রাগ বিদ্বেষ ইত্যাদি পরিহার করি, কারণ আমাদের আহমদীদের অন্যদের নিকট উত্তম আদর্শ হতে হবে। তাছাড়া বাহ্যিকভাবে অন্যদের প্রভাবিত করাই শুধু লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় বরং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যও আমাদের এসব অপকর্ম হতে বিরত থাকা উচিত।

আর প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের কারণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আমরা সকল প্রকার পাপ কাজ, ব্যভিচার, অন্যায়, যুলুম, অত্যাচার, মিথ্যা এসব কিছু হতে বিরত থাকবো। আর কোন মুসলমানকে বরং কোন অমুসলমানকেও কষ্ট দেব না আর কখনও নিজের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কিছু করবো না, এভাবে বিভিন্ন সামাজিক কদাচার ও বেদাত থেকে দূরে থাকবো আর মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর জামাতের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেকে অটুট রাখবো। এরকম আরো অনেক অঙ্গীকার আমরা করেছি যা আমাদের পালন করা অবশ্য কর্তব্য। নয়তো অঙ্গীকার তথা ওয়াদার বরখেলাফ করা হবে। যা একজন সত্যিকার মুসলমানের তথা মু'মিন বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা মুনাফিকের কাজ।

তাই আমাদেরকে সর্বদা হুযূরের মুখনিঃসৃত বাণীগুলো কর্ণ দিয়ে শোনা মাত্র পালন করা উচিত। এছাড়া সর্বদা নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো আত্মবিশ্লেষণ করে আত্মসংশোধন করা প্রয়োজন। হুযূর (আই.) গত ১ জানুয়ারী ২০১৬ এর খুতবা জুমুআয়ও বলেছেন, "আমাদের এই ইবাদত ও পুণ্যকাজ ১/২ দিনের জন্য হওয়া উচিত নয় বরং বছরের বারো মাসই আমাদের সৎকাজে রত থাকা উচিত। এক রাতের ইবাদত দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে অবিচলতা প্রয়োজন।" তাই আমাদেরকে হুযূরের এ কথামত কার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন তথা অবশ্য পালনীয়। এভাবে হুযূর আমাদের অন্যান্য মুসলমানদের মত বেহুদা বিভিন্ন কার্য হতেও বিরত থাকতে বলেছেন, আমরা অন্য মুসলমানদের মত হৈ হুল্লোর করে, আতসবাজী পুড়িয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাইনি বরং মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করে তাহাজ্জুদ ও দোয়ার মাধ্যমে নতুন বছরকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছি তেমনি সারা বছরই এভাবে আমাদের ইবাদত বন্দেগী করে যাওয়া উচিত।

হুযূর (আই.) তাঁর খুতবায় আরো বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ অনুসারীদের কাছে কিরূপ নেকী ও পুণ্যকর্মের প্রত্যাশা রেখেছেন এবং এলক্ষ্যে জামাতের সদস্যদের কি কি নসীহত করেছেন তাঁর রচনাবলী থেকে উল্লেখ করে বলেন, "রাগ, ক্রোধ, অহংকার, বিদ্বেষ, আত্মশ্লাঘা পরিহার করার আহ্বান জানিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যারা বিচক্ষণ ও খোদাভীরু তারা কখনো ক্রোধান্বিত হয় না এবং অহংকার বশে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় করে না। যারা তাকওয়ার পথে বিচরণ করে তারা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে, নামায কায়েম করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদ হতে তাঁর রাস্তায় খরচ করে। আর এরাই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতি করতে থাকে। তাই আমাদের জামাতের প্রত্যেক সদস্যদের আত্মজিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে, তার মাঝে কতটা তাকওয়া আছে। আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করবে এটি আমি চাই না।" এভাবে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আমাদের অনেক নসীহত করেছেন যা আমরা পালন করছি কিনা তা ভেবে দেখা দরকার এবং নিজেদের আত্মসংশোধন করা উচিত।

আজ লাখ লাখ মানুষ হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার মাধ্যমে নিজেদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। আসুন না, আমরাও চেষ্টা করি, নিজেদের জীবনকে পবিত্র করতে, প্রকৃত আহমদী হতে। মহান আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সবাই হুযূরের নসীহত মূলক কথাগুলো নিজ জীবনে পালন করতে পারি, আমীন।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও

আত্ম-সংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব

যুগ-খলীফার জুমুআর খুতবাগুলো শ্রবণের ফলে শুকনো জমিতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় হৃদয়ে উর্বরতা পায়!

যুগ-খলীফার জুমুআর খুতবা সরাসরি শ্রবণের মূল উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য করা। খুতবার গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্লেষণ করেই মূলতঃ চলমান বিশ্বের সমসাময়িক বিষয়াবলীর আলোকপাত করে খুতবা পরিবেশন করে থাকেন। বর্তমান সময়ের যুগান্তকারী মিডিয়া এম.টি.এ-এর কল্যাণে বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশের আহমদীগণ খুতবা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন আলহামদুলিল্লাহ্। সময়োপযোগী এই খুতবা না শোনাও কিন্তু অহংকারের পর্যায়ে পড়ে। দৈনন্দিন দুনিয়াদারীর চাপে পড়ে মানুষের আধ্যাত্মিকতা যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অবস্থান করছে তখন যুগ-খলীফার জুমুআর খুতবাগুলো শ্রবণের ফলে তা সচেতন অবস্থায় ফিরে আসে, মনে শুকনো জমিতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় উর্বরতা পায়! মানুষের নেক কর্মগুলি পরিপূর্ণতা পায়। নিজ আত্মাকে আত্মিক জেহাদের জন্য তৈরী করার সুযোগ পায় এবং আধ্যাত্মিক অগ্রযাত্রায় শরীক হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করা যায়। যুগ-ইমাম এমনি মুক্তা দু'হাতে বিলাচ্ছেন যে, মানুষ তা নিয়ে কুলাতে পারছে না।

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে–কারণ মিথ্যা তো দূরীভূত হওয়ারই ছিল। প্রত্যেকের সামনেই এমন রূহানী খাদ্য বিলানো হচ্ছে–অতএব সকলেরই উচিত এমন রূহানী-খাদ্য গ্রহণ করে পারলৌকিক ফায়দা হাসিল করা। খলীফায়ে ওয়াক্ত তথা যুগ-খলীফার খুতবাগুলো জামাতের রূহকে জীবিত রাখে। মানুষের আত্মা দুর্বল। তাই সে সর্বদা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছুই জানে না, তাই সে ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে থাকে। জুমুআর খুতবা শ্রবণের জন্য এহেন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রত্যেক আহমদী সদস্যের জুমুআর খুতবার সু-প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া উচিত।

আত্ম-সংশোধনে হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবার প্রভাব বিষয়টি খুবই মূল্যবান। কেবলমাত্র শোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের চলমান জীবনে তা বাস্তবায়িত করতে হবে–তবেই তো খুতবা শুনা সার্থক হবে! ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বা তাঁর খলীফার হাতে বয়আত নিয়ে আমাদের জীবনে এক আমুল আধ্যাত্মিক পরিবর্তন এসেছে, তেমনি তা সুদৃঢ় করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজেদের আখ্‌লাকে তার প্রভাব অবশ্যই ফেলতে হবে। ভুল-ত্রুটির সময়ে মানুষ– অতএব এমন কি কোন নিশ্চয়তা আছে যে, আমাদের পদস্খলন হবে না?

আমরা যদি শতভাগ তাঁর সকল নির্দেশের ওপর আমল করে চলি, তাহলেই আমাদের দায়িত্ব আমরা সঠিকভাবে পালন করছি বলে বিবেচিত হবে। নেযামের আনুগত্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি যুগ-খলীফার প্রত্যেকটি আদেশ যথাযথ বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য কর্তব্য। মুখে যতই পরিপাটি হই না কেন ব্যক্তি চরিত্র বা আমল যদি উন্নত না হয় তাহলে বিশ্বের সাধারণ মুসলমান ও আমাদের মধ্যে তো কোন তফাতই থাকবে না। প্রত্যেক সপ্তাহের জুমুআর খুতবাগুলি শোনার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। কারণ পরিবারের সকলেই একতাবদ্ধ হয়ে খুতবা শুনা–এই ব্যবস্থাপনা যা আল্লাহ্ তা'লাই প্রবর্তন করেছেন এবং এর মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বের সকল প্রান্তে যুগ-খলীফার আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে।

অতএব এর অংশে পরিণত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। জুমুআর খুতবার মূল কথাগুলিই হলো আলোকবর্তিকা–আমরা যেন এ থেকে স্খলিত হয়ে অন্ধকারে তলিয়ে না যাই এবং অন্যকেও আহ্বান করি। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–"তোমরা নিজে দোযখের অগ্নি থেকে বাঁচো এবং পরিবার পরিজনকেও বাঁচাও"। বস্তুতঃ সত্যিকারের মানুষের পরিচয় তার সুন্দর, সংযত ও বিনয়ী ব্যবহারে। "দৈনন্দিন কার্যক্রমে অবৈধ বা অন্যায় ক্রোধ এবং রাগ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত যা তাকওয়ার একটি শাখা। যারা সামান্য সামান্য কথায় রেগে যায়, তাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত যে, তার চিন্তা পার্থিবতার জন্য বেশি নাকি ধর্মের উন্নতির জন্য বেশী ?" (মলফুযাত)। আমরা যারা মু'মিন হবার দাবিদার, আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, নিজেদের ভেতরটায় তাকানো এবং দেখা দরকার যে, খোদার ভালোবাসায় বলীয়ান হয়েছি কিনা? মনোযোগের অভাবের কারণে যে সব মানবীয় গুণ ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, সেগুলো আদৌ অনুশীলন না করায় মানুষ নেক কাজ করা থেকে বাঞ্চিত হয়। কর্ম-সংশোধনের ক্ষেত্রে অভ্যাসের এক বড় ভূমিকা রয়েছে। বাস্তব সংশোধন কেবল অল্প কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না।

প্রত্যেক আহমদী নিজ আত্মার সংশোধনার্থে নিজেই নিজের অভিভাবক, নিজ অন্তরাত্মাকে যাচাই করলে এক মহাবিপ্লব সাধিত হবে। একটি প্রশ্ন মনে আসে–আমরা কি নিজেদের জীবনাচার সংশোধনের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যেভাবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আমাদেরকে শিখিয়েছেন? আমাদের জীবন-যাপন পদ্ধতির বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়া যে, কুরআনের আদেশ নিষেধ সঠিক ভাবে মেনে চলছি কি? আমরা প্রায়শই সঠিক কথাও বলি না।

সর্বদা এটাই স্মরণ রাখা উচিত যে, জীবনাচারের দুর্বলতাগুলো যখন সামাজিক-পরিমন্ডলকে দূষিত করে, তখন তা ঈমানের শিকড়গুলোতেও নাড়া দিতে পারে! যা কিনা জামাতের নেযাম থেকে দূরে চলে যাবার পাশাপাশি খিলাফত থেকেও দূরে নিয়ে যায়–কারণ একটি দুর্বলতা আরেকটি দুর্বলতার উদ্ভব ঘটায়, ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইজন্য জুমুআর খুতবাগুলি মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা উচিত।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

যুগ-খলীফা পবিত্র কুরআনেরই আলো বিতরণ করে যাচ্ছেন

আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রত্যেকেরই প্রার্থনা শুনে থাকেন তবে কার্যক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য মনোনীতদের মাধ্যমেই আমাদের পরিচালনা করে থাকেন। যেমন করে মক্তব, মাদ্রাসায়, স্কুল, কলেজ ও ইউনির্ভার্সিটি শিক্ষক ছাড়া চলে না। কেউ যদি বিশেষ করে গয়ের আহমদীরা যদি বলেন, এ হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির প্রয়োজন নাই বরং আমরাই যথেষ্ট–তবে তার উত্তর পবিত্র কুরআন দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাদের কথা 'আমরাই তো তোমার উপাসনা করি, তখন আর খলীফার প্রয়োজন কি, তা গ্রহণযোগ্য নয়। খলীফার আনুগত্যেই সঠিক পথ নির্ধারিত, অন্য কারো মাধ্যমে নয়। আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠিতে আমাদের দেখা অন্ধের হস্তি দর্শনেরই নামান্তর যা না দেখার মতই। একটি ফার্মেসিতে সব ধরনের ঔষধ থাকা সত্ত্বেও একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া যদি ফার্মেসীর সব ঔষধই খেয়ে ফেলা হয় তাতেও উপকার তো দূরের কথা বরং মৃত্যুর সম্ভাবনাই অধিক। হাদীসে আছে, কেউ যদি একাধারে তিন জুমুআর নামাযে অনুপস্থিত থাকে তবে সে অন্ধ (আত্মীক) হয়ে যায়। এতেই খুতবার গুরুত্ব বিশেষ করে যুগ খলীফার খুতবার গুরুত্ব কত অপরিসীম তা অনুধাবন করা যায়।

যুগ খলীফার মাধ্যমে এক হাতে সব নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আহমদীরা বাস করেন। তাদের আচার-আচরণ প্রাত্যহিক জীবনে অগ্রগতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির ঘটনা হুযূর (আই.)-এর নখদর্পনে। তদুপরি আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমত সর্বদা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ওপর এহসান। আল্লাহ্ পাক তাঁর ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর মহান খলীফাকে সাহায্য করে থাকেন। হুযূর (আই.) যে খুতবা প্রদান করে থাকেন তা আদর্শিক দৃঢ়তা এবং বাস্তব জীবনে কার্যকর করা ও গতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যেই প্রদান করে থাকেন।

মানুষের স্বভাব হলো, ভুলে যায়। এটিই বাস্তবতা। একটি গাছের আঁড়াল হলেই আঁড়াল সৃষ্টি হয়ে যায়। অনেক সময় নিজের অজান্তেই বিচ্যুতি এসে যায়। এ ছাড়া আমরা যারা ছোট খাট বিষয়কে গুরুত্ব না দিয়ে ভুল করি এবং ভুল করতেই থাকি তারা ও তো অন্ধকারের দিকেই অগ্রসর হই। যুগ-খলীফা মহান আল্লাহ্ পাকের তত্ত্বাবধানে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বিষয়াদি যা ইসলামী জীবনে উৎকর্ষ সাধনকারী ও গতিশীলতা আনয়নকারী সে বিষয়ে আমাদের উৎসাহ প্রদান এবং যেগুলো তার পরিপন্থী সেগুলোর সূচনালগ্নেই তা থেকে বিরত থাকতে আমাদের সতর্ক করেন এবং সাবধানতা অবলম্বনে পথনির্দেশনা দান করেন।

অতএব, হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর প্রত্যেকটি খুতবা গভীর মনযোগের সাথে শুনা এবং তাৎক্ষণিক অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে নিজেদের আত্ম-সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন যার কোন বিকল্প নেই। স্মরণ রাখতে হবে, যুগ খলীফার দিক নির্দেশনা এমন মহৌষধ যার একটি ফোটাও মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর সুস্থতার জন্য যথেষ্ট যদি তা আমরা আমাদের জীবনে যথাযত যথা সময়ে প্রয়োগ করি।

আজকের দিকে ব্যক্তি সমাজ, দেশ রাষ্ট্র এবং গোটা বিশ্বই সমস্যা জর্জরিত। সমস্যা এত প্রকট যে কেউই এর সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। যার যার মত প্রত্যেকেই ব্যবস্থা নিচ্ছেন আর তাতে সমাধান না হয়ে বরং সমস্যা আরো বাড়ছে। তার কারণ কি? কারণ হল কেউই প্রকৃত সত্যিকে চিহ্নিত বা নির্ধারণ করতে পারছেন না।

যুগ-খলীফা (আই.) পবিত্র কুরআনের আলোই বিতরণ করে যাচ্ছেন। আমাদের কাজ হল সে আলোতে পথ চলা এবং আত্মসংশোধন করে নিজ নিজ জীবনে সফলতা অর্জন করা। হযরত আমীরুল মুমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) এর খুতবার একটি বিশেষ দিক হল, তাঁর খুতবাতে প্রায়শ এমন কিছু সত্য ঘটনা তুলে ধরেন যা হত দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং সম্পদশালীদের জীবনের বাস্তব ঘটনা হোক বা নও মোবাঈন আহমদীই হোন না কেন ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সে সব ঘটনাবলী তা সে চাঁদা সংক্রান্তই হোক বা মোখালেফাত মোকাবেলাই হোক বা জীবন উৎসর্গ সংক্রান্ত ঘটনাবলীই হোক না কেন তা ঈমান বর্ধক, উৎসাহ ও মনোবল সৃষ্টি ও আত্ম-সংশোধনের জন্য খুবই কার্যকর।

হুযূর আনোয়ার (আই.) এর পবিত্র চেহারা এবং শত ভাগ সত্য বলার শক্তি ও মহিমা সবাইকে এমন ভাবে আকর্ষণ করে শ্রোতার ভিতর এমন এক শক্তি সঞ্চার করে যা অতুলনীয় এবং প্রকৃতই বিপ্লব। যা রাজনৈতিক উচ্চকণ্ঠের ভাষণ ও নাটকীয়তা যা সাব্যস্ত হওয়ার পরই নিস্তেজ হয়ে তার বহু ঊর্ধ্বে আধ্যাত্মিকতার আলোকে আলোকিত যা হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করে সত্যি সত্যি সাধনার জীবনে অংশগ্রহণ করে তাতে বিজয়ী হওয়ার বলিষ্ঠ ভূমিকা ও শক্তি দান করে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবার হৃদয়ই হুযূর (আই.)-এর খুতবার আলোকে আলোকিত ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে আত্ম সংশোধনকারীতে পরিণত করুন, আমীন।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

যুগ খলীফার দিক নির্দেশনা এমন মহৌষধ যার একটি ফোটাও মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর সুস্থতার জন্য যথেষ্ট যদি তা আমরা আমাদের জীবনে যথাযত ও যথা সময়ে প্রয়োগ করি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের উদ্যোগে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৩ জানুয়ারি ২০১৬, শাহবাগস্থ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি সম্মেলন। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও চলমান পরিস্থিতি'। শান্তি সম্মেলনে বক্তাগণ সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠির ওপর আক্রমণ ও বোমা হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল দেশে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট এবং উগ্র ধর্মান্ধতা ও জঙ্গীবাদ বিস্তারের অপচেষ্টায় চালাচ্ছে। সম্প্রতি হিন্দু মন্দির ধ্বংস, খ্রিষ্টান যাযকদের ওপর আক্রমণ এবং শিয়া ও আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ওপর বোমা ও জঙ্গী হামলার উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, সব ধর্মই শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ধর্মের অপব্যাখ্যা করে কিছু মানুষকে উগ্রবাদ ও জঙ্গীবাদের দিকে

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন– ড. কামাল হোসেন, আহমদ তবশির চৌধুরী, সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু এবং ফাদার তপন ডি' রোজারিও।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন– মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, স্বামী চন্দ্রনাথা নন্দজী মহারাজ, শাহরিয়ার কবির এবং ব্যারিষ্টার তুরিন আফরোজ।

আকৃষ্ট করছে। বক্তাগণ বলেন, শত শত বছর ধরে এদেশে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করে আসছে। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন উৎসব পার্বন ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে একত্রে মিলে মিশে উদযাপন করা হচ্ছে। আমাদের জাতীয় উৎসবগুলোরও রয়েছে একটি অসাম্প্রদায়িক রূপ ও চরিত্র। কিন্তু আজ উদ্বেগের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের সেই শাশ্বত চরিত্র বিনষ্ট করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দেশীয় ও বৈশ্বিক অঙ্গনে জঙ্গীবাদের উত্থান ও এর পরিনামের কথা উল্লেখ করে বক্তাগণ বলেন যে, কোন দেশেই জঙ্গীবাদের পরিণাম ভাল হয় নি। যেখানেই জঙ্গীবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে সেখানেই ধ্বংস ও জন-মানুষের অবর্ননীয় দুর্ভোগ নেমে এসেছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদি দেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বক্তারা বলেন, তালেবান, বকোহারাম, আইসিস, জেএমবি ইত্যাদি মূলতঃ একটি বিকৃত ও বিপথগামী মানসিকতার নাম। তারা বলেন, জঙ্গীবাদ নির্দিষ্ট কোন জাতীয়তা বা নাগরিকত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন দেশে এরা ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করলেও এদের আদর্শ ও লক্ষ্য মূলতঃ এক। এরা নিজ হীন স্বার্থে ইসলামকে ব্যবহার করে, অথচ এদের সব কর্মকাণ্ড ইসলাম বিরোধী।

সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ দমনে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর জোর দিয়ে বক্তাগণ বলেন, কেবল শক্তি বা আইন প্রয়োগ করে এদের নির্মূল করা সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন জন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক প্রতিরোধের। উগ্র ধর্মান্ধতার বিপরীতে ইসলামের সুস্থ ও শান্তি প্রিয় শিক্ষা তুলে ধরে পরিবার থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোটিভেশন বা উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন বক্তারা।

দু'টি ভাগে বিভক্ত সম্মেলনের প্রথম ভাগে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় আমীর জনাব মোবাশশের উর রহমান। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, বহি:সম্পর্ক ও গণ-সংযোগ সম্পাদক, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। বিভিন্ন ধর্মের আলোকে শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেনঃ সিলেট রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী চন্দ্রনাথা নন্দজী মহারাজ, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার বাড্ডা-র প্রতিনিধি সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন– শ্রী কাজল দেবনাথ, মওলানা সাইয়েদ হাবিব রেজা হোসাইনী, জুলফিকার আলি মাণিক এবং ব্রাদারগিওম।

প্রধান ফাদার তপন ডি' রোজারিও এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

এরপর বিশ্বশান্তি এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বব্যাপী প্রয়াসের ওপর একটি ১০ মিনিটের ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবি ও সংবিধান প্রনেতা ড. কামাল হোসেন। এরপর প্যানেল আলোচনায় অংশ নেনঃ লেখক-সাংবাদিক জনাব শাহরিয়ার কবির, ব্রাদারগিওম, বিশিষ্ট আইনজীবি ব্যারিষ্টার তুরিন আফরোজ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের শ্রী কাজল দেবনাথ, শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মওলানা সাইয়েদ হাবিব রেজা হোসাইনী, দি নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর বংলাদেশ প্রতিনিধি জুলফিকার আলি মাণিক, নিরাপত্তা বিশ্লেষক মে. জে. আব্দুর রশিদ (অব.) এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের নায়েব আমীর ও বিশিষ্ট স্থপতি প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন অধ্যাপক নাজমুল হক এবং আহমদ তবশির চৌধুরী।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন–
মে. জে. আব্দুর রশিদ (অব.) এবং প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী।

ড. কামাল হোসেন তার শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, অসাম্প্রদায়িকতা বাঙালীর হাজার বছরের ঐতিহ্য। বাংলাদেশে আহমদীয়া জামাতের ১০৩ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ন্যায়ের পক্ষে আমরা একবার নয়, বহুবার বিজয়ী হয়েছি। সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে যারা আমাদের শোষণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে বারবার লড়াই করেছি। ৭১'র ১৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতার পরাজয় ঘটে ছিল, অসাম্প্রদায়িকতার বিজয় হয়েছিল। একাত্তরের শহীদরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য জীবন দিয়েছে, আমরা জীবন দিয়ে হলেও অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করব।

ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ বলেন, ধর্ম সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম নেই। তাদের আমি এবং আমরা সবাই ঘৃণা করি। সংবিধান অনুযায়ী কোন সংগঠন যদি সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রীতি বিনষ্ট করে তারা বাংলাদেশে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার রাখেনা।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী বলেন, ইসলামে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের কথা বলা হলেও আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর জন্য ইসলামের নাম ব্যবহার করে জিহাদের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। মুসলিমদের বিপদগামী করা হচ্ছে। উগ্রবাদ ও জঙ্গীবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তিনি জঙ্গীদের অর্থের উৎস বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শিক লড়াই জারি রাখার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ফাদার তপন ডি রোজারিও বলেন, প্রতিটি ধর্মেই শান্তির কথা বলা হয়েছে। স্থপতি এবং নায়েব আমীর প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী তিনিও তার বক্তৃতায় বিশ্বে একে অপরের সাথে শান্তিময় পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে আলোকপাত করেন। শেষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর অনুষ্ঠানের সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং এক সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকলে শান্তির জন্য কাজ করারও আহ্বান জানান।

সম্মেলনের সংবাদ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও ২৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে দৈনিক প্রথম আলো, সমকাল, জনকণ্ঠসহ বেশ কিছু পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের ৩৫তম আঞ্চলিক সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় গত ১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের ৩৫তম বার্ষিক জলসা চকবাজারস্থ স্থানীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জলসার অধিবেশন শুরু হয় ১৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামাতের আমীর মোকাররম মোবাশ্বের উর রহমান সাহেব। জলসার কার্যক্রম শুরু হয় মৌলভী মোজাম্মেল হক এর পবিত্র কুরআন পাঠ ও জনাব মতিউর রহমান ভুঁইয়ার নযম পাঠের মধ্য দিয়ে। উদ্বোধনী বক্তৃতায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর জলসায় যোগদানের বরকত ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাহ্যিক যত অনুষ্ঠান হয় তাতে কোন কল্যাণ থাকে না কিন্তু আহমদীয়া জামাতের জলসাগুলোতে আল্লাহ তা'লার রহমত ও কল্যাণে থাকে ভরপুর। এছাড়া এ জলসায় যোগদানকারীদের জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বিশেষভাবে দোয়াও করেছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তা'লা যেন আমাদেরকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সেই সব দোয়ার অংশীদার করেন। তিনি আরো বলেন, আজ আমাদেরকে প্রকৃত ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছানোর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। এরপর তিনি নিরব দোয়া পরিচালনা করেন।

এরপর উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব মুর্তজা আহমদ তানভীর। বক্তৃতা পর্বে 'বিভিন্ন ধর্মের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের পরিচয়' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ধর্মের আলোকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-ই যে আগমনকারী মহাপুরুষ তা স্পষ্ট করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন 'বিশিষ্ট আহমদীগণের চট্টগ্রামে আগমণের ঘটনাবলী' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জলসার চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্জ নেছার আহমদ। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাহাবী হযরত আহমদ কবীর নুর মোহাম্মদ (রা.), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.), প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবসহ বিশিষ্ট আহমদী বুযর্গদের কথা উল্লেখ করেন।

এরপর 'তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে আমরা এর যথাযথ মূল্যায়ন এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা প্রচারের কাজ কিভাবে

জলসায় বক্তব্য রাখছেন–
মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, আলহাজ্জ নেছার আহমদ এবং মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন।

জলসায় বক্তব্য রাখছেন– মৌ. মোজাফফর আহমদ, মওলানা তারেক আহমদ, আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী এবং মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান।

করতে পারি তা কুরআন হাদীসের আলোকে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির এ যুগ ইসলামের সত্যতার কথা প্রমাণ করে, প্রমাণ করে মহানবী (সা.)-এর সত্যতা। কেননা পবিত্র কুরআন করীমে তথ্য প্রযুক্তির এই উন্নতির কথা পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কিভাবে তথ্য-প্রযুক্তিকে ইসলামের সেবায় কাজে লাগিয়েছেন তা-ও তিনি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। আর বর্তমান যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এমটিএ-এর মাধ্যমে এবং রেডিও-এর মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাপী কিভাবে ইসলামের সেবা করছে তাও তিনি তুলে ধরেন। তিনি যুবকদের আহ্বান করে বলেন, তারা যেন তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করেন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় সকাল ১০টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোর্শেদ আলম সাহেব, ভারপ্রাপ্ত আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ ইয়াছিন আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব দৌলত আজিম ভূইয়া। বক্তৃতা পর্বে 'আগমনকারী ঈসা (আ.)-এর পরিচয় এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌ. মোজাফফর আহমদ। তিনি তার বক্তৃতায় কুরআন হাদীসের আলোকে আগমনকারী ঈসা (আ.)-ই যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তা স্পষ্ট করেন। এরপর 'মুসলমানের জীবনে নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা তারেক আহমদ। তিনি তার বক্তৃতার একাংশে বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা। এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একথাও বলেছেন যে, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে পাঁচ বেলার নামায আদায় করে না সে আমার জামাতভুক্ত নয়। এ পর্যায়ে নযম পাঠ করেন জনাব আলাউদ্দিন মেজবাহ। এরপর 'বিশ্ব মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় সূরা আলে ইমরানের ১১১, সূরা বাকারার ১৭৮ এবং সূরা নিসার ৩৭ নং আয়াত উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে মানবতার সেবার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর মহানবী (সা.) ছিলেন দয়ার মূর্তিমান আদর্শ তাঁর দয়া থেকে কেউ বঞ্চিত ছিলেন না। তিনি বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের

জলসায় বক্তব্য রাখছেন– মওলানা জাফর আহমদ, নূরুল ইসলাম হুলাইনী, আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ এবং মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন।

জলসায় বক্তব্য রাখছেন– মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ, মওলানা বশীরুর রহমান, মাহবুবুর রহমান এবং আহমদ দাউদ।

সেবামূলক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন এবং হিউমেনিটি ফার্স্টের কার্যক্রম সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩ টায় হাফেজ মোস্তাক আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। কাসিদা পাঠ করেন জনাব মোসাউয়ের আহমদ ও তার দল। বক্তৃতা পর্বে 'খাতামান নাবীঈন-এর মোকাম ও মর্যাদা' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ।

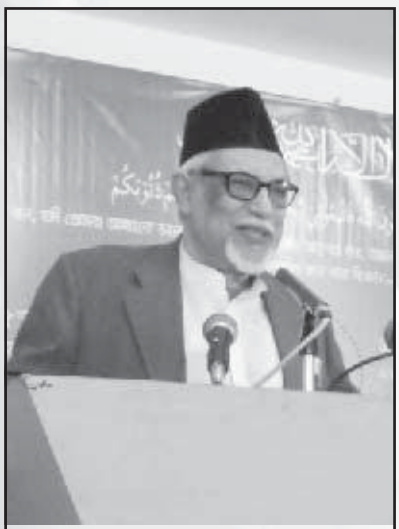

জলসায় বক্তব্য রাখছেন–
প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী।

তিনি তার বক্তৃতায় সূরা আহযাবের ৪১ নং আয়াতের আলোকে এবং পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

এরপর 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর মেহমানদারীর ঈমান-উদ্দীপক ঘটনাবলী' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা জাফর আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআনের আলোকে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হযরত লূত (আ.) এর আতিথেয়তার ঘটনা উল্লেখ করেন এবং সেই সাথে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর মেহমানদারীর ঈমান-উদ্দীপক ঘটনাও তুলে ধরেন। তারপর একটি নযম পরিবেশন করেন জনাব ইমরান সাঈদ। এরপর 'আমার আহমদী হওয়ার প্রেক্ষাপট' বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেন জনাব নূরুল ইসলাম হুলাইনী। এরপর 'হযরত রসূল করীম (সা.)-এর অতুলনীয় উত্তম আদর্শ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় মহানবী (সা.)-এর জীবনের উত্তম আদর্শের বিভিন্ন ঘটনা এমনভাবে উপস্থাপন করেন যা ছিল হৃদয়গ্রাহী। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর নামায, কুরবানী সবই যে ছিল কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র জন্য তাও তিনি তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন।

সন্ধ্যা ৭টায় এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সকলেই শ্রবণ করেন।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ১৬ জানুয়ারি, শনিবার সকাল ৯টায়। প্রথমে সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত লাজনা অধিবেশন, লাজনা অংশেই হয়, যাতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ, চট্টগ্রাম। এরপর মূল জলসাগাহে অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে সভাপতিত্ব করেন, আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। বক্তৃতা পর্বে 'ইসলাম সেবায় নারীগণের ভূমিকা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় হযরত বিবি হাজেরার অবদান এবং মহানবী (সা.)-এর যুগে ইসলামের সেবায় নারীদের যে অবদান তা তুলে ধরেন। সেই সাথে তিনি বর্তমান যুগে বিশ্বে আহমদী নারীরা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যে সেবা করে যাচ্ছেন তার বিবরণও তুলে ধরেন। এরপর 'যোগ্য সন্তান-সন্ততি গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই সূরা ইব্রাহিমের ১২৯ থেকে ১৩৩ নং আয়াতের অর্থ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে যোগ্য সন্তান হতে হলে প্রথমে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। প্রকৃত মুসলমান ছাড়া যোগ্য সন্তান বা আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

এ পর্যায়ে নযম পরিবেশন করেন জনাব নূরে এলাহী। এরপর 'আমি কিভাবে আহমদী হলাম' এ বিষয়ে অনুভূতি প্রকাশ করেন ইঞ্জিনিয়ার জামাল হোসেন। তিনি কিভাবে এমটিএ-এর মাধ্যমে প্রথম আহমদীয়া জামাতের সংবাদ পান এবং বিভিন্নভাবে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হোন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতই সত্য, তা তার অনুভূতিতে তুলে ধরেন। সেই সাথে এটাও বলেন যে, আমার সৌভাগ্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতে অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছি এছাড়া এখানে এসে তিনি যে আত্মার প্রশান্তি লাভ করছেন তাও উল্লেখ করেন। এ অধিবেশনের সর্বশেষ বক্তা ছিলেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। তিনি 'একজন আদর্শ আহমদীর বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে

জলসায় নযম পাঠ করছেন–
মুর্তজা আহমদ তানভীর এবং দৌলত আজিম ভূইয়া।

বক্তব্য রাখেন। একজন মানুষ পবিত্র হতে চাইলে কি প্রয়োজন তা উল্লেখ করে বলেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আমাদেরকে পবিত্র হওয়ার নীতিমালা দিয়েছেন আর তা বয়আতের ১০টি শর্তে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি বয়আতের এ ১০টি শর্ত পাঠ করে বলেন, এটি ইসলামের সারাংশ, একজন আহমদীর দায়িত্ব হচ্ছে নিজের জীবনে এই শর্তগুলো বাস্তবায়ন করা। এছাড়া তিনি প্রত্যহ দূরুদ শরীফ, ইস্তেগফার, বাড়িতে সত্য কথা বলার এবং সবার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের বিষয়েও তাগিদ প্রদান করেন।

জলসার সমাপনি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩টায় জনাব নিজাম উদ্দিন এর পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। নযম পাঠ করেন এসএম রহমতুল্লাহ।

বক্তৃতাপর্বে 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশীরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় এটি স্পষ্ট করেন যে, আজকে সমগ্র বিশ্বে যে, কেবল মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতেই ঐশী খেলাফত বিদ্যমান আর এই খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বে প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচার করা হচ্ছে। তিনি সকলকে ঐশী খেলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এরপর 'ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, জনাব মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর লেখনির আলোকে ওসীয়্যতের বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন এবং যারা এখনও ওসীয়্যতের এই বরকতময় নেযামে অন্তর্ভূক্ত হন নি তাদেরকে এতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

এরপর 'হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর রসূল প্রেম' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ দাউদ, অডিটর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম। তিনি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেমের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন যাতে স্পষ্ট হয় তিনি (আ.) কত বেশি মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসতেন। তিনি তার বক্তৃতার একাংশে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচিত আয়নায়ে কামালতে ইসলাম পুস্তকের এই উদ্ধৃতিটিও তুলে ধরেন, যেখানে রসূল প্রেমে তিনি (আ.) বলেছেন, 'সেই সর্বোচ্চ মানের জ্যোতি যা মানবকে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ উৎকর্ষ মানবকে, যা ফিরিশ্‌তাদের মাঝে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না আর সূর্যেও ছিল না। যা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীগুলোতেও ছিল না, ছিল না মণি-মানিক্যে, পদ্মরাগ মণিতে, চুনিপান্না এবং হীরা-জহরতে। তা ছিল কেবল মানবের মাঝে অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মাঝে; যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ, সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের নেতা ও মনিব, নবীকূল শিরোমনি, জীবন প্রাপ্তদের সর্দার, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। অতএব ঐ নূর বা জ্যোতি দান করা হয়েছে সেই মানবকে এবং পদমর্যাদার নিরিখে একই বৈশিষ্ট্যধারী অন্য লোকদেরও অর্থাৎ তাদেরকে যারা কিছুটা হলেও সেই রঙ ধারণ করেছেন...। এই সুমহান মর্যাদা, পরিপূর্ণ ও সর্বোৎকৃষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল আমাদের নেতা ও মনিব, আমাদের পথপ্রদর্শক, নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর মাঝে; যিনি পরম সত্যবাদী ও সত্যায়িত।'

এরপর 'পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূমিকা' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন, মোহতরম প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, ইসলাম যেভাবে সহনশীলতা প্রকাশ করে তা অন্য কোন ধর্মে প্রকাশ করে না। এটা ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একমাত্র ইসলামই দাবি করে যে, সকল মানুষকে একই উৎস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামে কোন প্রকার ভেদাভেদের শিক্ষা দেয়া হয়নি। সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত একক খলীফার নেতৃত্বে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে রত তাও উল্লেখ করেন। জলসার সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। তিনি তার সমাপনি বক্তৃতায় সকলকে ইসলামী আদর্শে নিজেদের জীবন পরিচালনার এবং নিজেকে একজন আদর্শ আহমদী হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সেই সাথে বিশ্বের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষার জন্যও সকলকে দোয়ার প্রতি আরো বেশি জোর দেয়ার তাগিদ প্রদান করেন এবং বিশ্বের শান্তি কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার মাধ্যমেই জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে।

জলসায় প্রতিদিন বাদ মাগরিব জেরে তবলীগ মেহমানদের নিয়ে তবলীগি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাতে বয়আত গ্রহণ করেন ৯জন। জলসায় চট্টগ্রাম, চরদুখিয়া, ফাজিলপুর, মাহিল্যা, কুটিরহাট, অম্বরনগরসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩দিনে প্রায় ৩ হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ডেস্ক রিপোর্ট

সহযোগিতায়: চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি ও খালিদ আহমেদ সিরাজী
ছবি: ওয়াহিদ খান ও মাসুদ আহমদ কুরাইশী

জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১২ ও ১৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত চানতারা বানিয়াজান, রাংটিয়া, বকশীগঞ্জ, জামালপুর, ছোনটিয়া সরিষাবাড়ী ও হোসনাবাদ জামাতসমূহের যৌথ উদ্যোগে ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক সালানা জলসা হোসনাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত ময়দানে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ১২/১১/২০১৫ তারিখ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব তবলীগি সেশন অনুষ্ঠিত হয় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর-এর সভাপতিত্বে। এতে অংশ নেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন এবং প্রশ্নোত্তরসহ সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। এ অনুষ্ঠানে অত্র অঞ্চলের বিভিন্ন পকেট থেকে আগত অতিথিদের মাঝ থেকে ২৯ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন। দোয়ার মাধ্যমে তবলীগি সেশন শেষ হয়।

জলসাগাহে সুপরিসর প্যান্ডেলে প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ১৩ নভেম্বর শুক্রবার সকাল সাড়ে নয় টায় মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ইমরান আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ দান ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। এরপর জনাব মাসুদ আহমদ কুরাইশীর উর্দু নযম পরিবেশনের পর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব আব্দুর রহিম ভূইয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হোসনাবাদ।

অতঃপর ***'মহান আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও অস্তিত্বের প্রমাণ'*** এ বিষয়ে সারগর্ব বক্তৃতা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর। বাংলা নযম পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া। তারপর ***'রহমাতুল্লিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)'***-এর ওপর বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন। দুপুর ১২টার দিকে এ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। দুপুরের খাবার এবং জুমুআর নামাযের সাথে আসর নামায জমা পড়ার পর জলসার ২য় অধিবেশন শুরু হয় বেলা ৩ ঘটিকায়। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর এর সভাপতিত্বে। প্রথমে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবু সাঈদ। উর্দু নযম পরিবেশন করেন

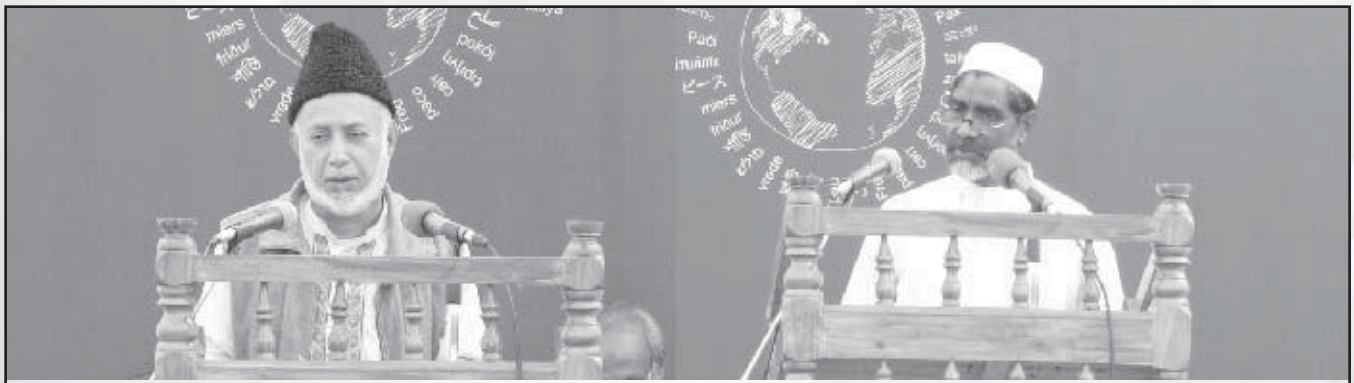

জলসায় বক্তব্য রাখছেন– মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এবং মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন।

জনাব নাসের আহমদ। এরপর ***'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর রসূল প্রেমের*** ওপর বক্তৃতা করেন মওলানা আসাদুজ্জামান রাজীব। এ পর্যায়ে অত্র এলাকার চেয়ারম্যান জনাব আজমত আলী মাষ্টার সাহেব শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ***'নামাযের গুরুত্ব ও কবুলিয়তে দোয়া'*** বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা ও মালি কুরবানীর গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব হাবিবুর রহমান। 'যুদ্ধ শান্তি ও ইসলাম'-এর ওপর বক্তব্য করেন জনাব আনোয়ারুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জামালপুর জামাত। অতঃপর বক্তব্য রাখেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর। মাগরীব ও এশার নামাযের বিরতীর পর জলসাগাহে হুযূর (আই.)-এর খুতবা প্রদর্শনের পর তবলীগি প্রশ্নোত্তর আলোচনা চলে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীর পরিচালনায়। রাত ১০টার দিকে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর-এর সমাপনি দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

তাহ্‌রীক-ই-জাদীদের (৮২তম বছর) ওয়াদা প্রেরণ প্রসঙ্গে

সকলের অবগতির জন্য যানানো যাচ্ছে যে, আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) গত ০৬/১১/২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবায় তাহ্‌রীক জাদীদের ৮২তম বছরের ঘোষণা করেছেন,আলহামদুলিল্লাহ।

৮১তম বছরে তাহ্‌রীকে জাদীদের চাঁদা আদায়ে সহযোগিতার জন্য তাহ্‌রীকে জাদীদ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জামা'তের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, গত ৭/১১/২০১৫ তাং এ এতদ্বসংক্রান্ত একটি সার্কুলার প্রেরণের পরও এখনও পর্যন্ত কোন জামা'ত হতে (২০১৫-১৬) অর্থ বছরের ওয়াদার তালিকা পাওয়া যায় নি।

আপনাদের সকলের সহযোগিতায় গত বছরের তুলনায় ৮১তম-বছর-এ চাঁদা আদায়কারীর সংখ্যা ও চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে সেটা আমাদের লক্ষমাত্রা পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। যদি প্রত্যেক জামা'ত তাঁর তাজনীদ মোতাবেক আজকে জন্মগ্রহণকারী শিশুসহ নওমোবাঈন পর্যন্ত (১টাকা করে হলেও) প্রত্যেককে এ ঐশী তাহরীকে অংশগ্রহণ করানো গেলে তা বিশ হাজারের অধিক হতো। আশা করি ৮২তম বছরে আপনার জামা'তের কোন সদস্য-সদস্যা এ তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত হবেন না।

এ ব্যাপারে তাহ্‌রীকে জাদীদ সেক্রেটারীকে কাজে লাগান এবং জামা'তের মুরুব্বী/ মোয়াল্লেম সাহেবদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিন। হুযূর আনোয়ার (আই.) আমাদেরকে গত কয়েক বছর যাবৎ ২০ হাজার টার্গেট দিয়েছেন যা আমরা এখনও পূরণ করতে পারি নাই। সুতরাং আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে আমরা এ লক্ষে পৌঁছাতে পারব, ইনশাআল্লাহ্‌।

* হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, সুতরাং কল্যাণমণ্ডিত সেই, যে অগ্রবর্তী হয়ে এই তাহরীকে অংশগ্রহণ করে কেননা তাদের নাম সম্মানের সাথে ইসলামের ইতিহাসে সর্বদা জীবিত থাকবে এবং খোদা তা'লার দরবারে এই সকল লোক খাস সম্মানের স্থান পাবে। কেননা তারা নিজেরা কষ্ট করে ধর্মের মজবুতীর জন্য চেষ্টা করেছেন এবং তাদের সন্তানদের খোদা তা'লা নিজেই আশ্রয়দাতা হবেন আর আসমানী নূর তাদের বুকে জ্বল জ্বল করতে থাকবে এবং পৃথিবীকে আলোকিত করতে থাকবে।

সুতরাং আপনার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু জামা'তের সাথে যোগাযোগ তেমন নেই তাঁদের নিকট খলিফার পয়গাম পৌঁছাতে হবে এবং তাঁদেরকেও এই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আপনার মজলিসে এমন অনেক বুজুর্গ গত হয়ে গেছেন, যাদের অনেক কুরবানী রয়েছে জামা'তের উন্নতির জন্য, তাঁদের কুরবানী ও ত্যাগকে জীবিত রাখার জন্য বংশধররা তাঁদের নামে এ খাতে চাঁদা দিতে উৎসাহিত করুন এবং যত দ্রুত সম্ভব ওয়াদার তালিকা কেন্দ্রে প্রেরণ করুন।

মহান আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে বেশি বেশি জামা'তের খেদমত করার তৌফিক দিন।

ইনসান আলী ফকির
সেক্রেটারী তাহ্‌রীক-ই-জাদীদ, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭১৬৯৭৩৩৭৭

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কবিরপুরের মসজিদ উদ্বোধন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কল্যাণে বাংলাদেশের কবিরপুরে গত ১ জানুয়ারী, ২০১৬ শুক্রবার জুমুআ নামাযের মাধ্যমে মসজিদের শুভ উদ্বোধন হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এটি ২০১৩ সনের শেষ দিকে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আশুলিয়া থানার শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ বেতারের সীমানা প্রাচীর সংলগ্নে অবস্থিত। গত ১ জানুয়ারী, ২০১৬ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেবের খুতবা প্রদানের মাধ্যমে মসজিদটির শুভ উদ্বোধন হয়। বাদ জুমুআ ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি মসজিদ নির্মান এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি মসজিদ সংলগ্ন প্রতিবেশী অ-আহমদী মোহমানদের কাছে তুলে ধরেন।

উদ্বোধনী জুমুআয় ১৭ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন এবং সর্বমোট পুরুষ-মহিলা ৭৯ জন উপস্থিত ছিলেন। মসজিদ উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্র থেকে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি নায়েব ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন এবং কবিরপুর জামা'তের পুরুষ-মহিলা শিশুসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মসজিদের আশে-পাশে অ-আহমদীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় থাকায় মসজিদ নির্মাণে তারা সহযোগিতাও করেন। আহমদীয়া মসজিদটি এলাকার জন্য শান্তির কারণ হবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

দূর্গারামপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০৪/০১/২০১৬ তারিখ রোজ সোমবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ দূর্গারামপুরের উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে তার নিজ বাসভবনে 'সীরাতুন নবী (সা.)' জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আরবি কাসিদা পাঠ করেন মহিমা-ই-ইলাহী, বাংলা নযম পাঠ করেন রাহিদা-ই-ইলাহী। হযরত রসূল করীম (সা.) এর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন নাজমা বেগম, কঁচি আক্তার রোজিনা ও রেহানা বেগম এবং সুলতানা রাজিয়া পলি। সভায় লাজনা, নাসেরাত ও ৪ জন জেরে তবলীগ বোন সহ মোট ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন, দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সুমাইয়া ফেরদৌস

বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস'১৫ উপলক্ষ্যে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ দিবাগত রাতে মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ বাজামাআত তাহাজ্জদ নামাজ আদায় করা হয়। নামাযের ইমামতি করেন স্থানীয় মুরব্বী সাহেব। এতে ৪২জন অংশ নেন।

আকবর আহমদ সোহাগ

রঘুনাথপুর বাগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ০১/০১/২০১৬ রঘুনাথপুর বাগ যশোর সাতক্ষীরা অঞ্চলের অধিনে রঘুনাথপুর বাগ মসজিদে বাদ জুমুআ জনাব আতিয়ার রহমান প্রেসিডেন্ট রঘুনাথপুর বা-এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ ওসমান গনি। নযম পাঠ করেন জনাব জাহিদ হাসান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব জাহিদ হাসান। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি হয়। উক্ত জলসায় ৭৫ জন আহমদী এবং ২৫ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান

তেজগাঁও-এ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

২২/০১/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ তেজগাঁও-এর উদ্যোগ স্থানীয় জামে মসজিদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসা স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার শিখার সভাপতিত্বে এবং কুরআন পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। বক্তৃতাপর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শের ওপর প্রদত্ব হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা পাঠ করে শোনান ফারহানা মাহমুদ তন্বী। প্রেসিডেন্ট সাহেবার নযম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শারমিন আক্তার শিখা

তেরগাতি জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ০২/০১/২০১৬ স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার আলী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আশরাফুল ইসলাম ছোটন। নযম পরিবেশন করেন আফজাল আহমদ ইয়াছিন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনাদর্শ, রসূল প্রেম, মহানবী (সা.) এর বাল্য জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় বক্তাগণ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তারা হলেন জনাব আশরাফুল ইসলাম ছোটন, জনাব নূরুল ইসলাম, আফজাল আহমদ এবং জনাব গোলাম রসূল। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৪জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ মোট ৬২ জন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ

চরসিন্দুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

১০/০১/২০১৬ রোজ রবিবার, বেলা ৩টায় চরসিন্দুর জামা'তের হালকা সুলতানপুরে লাজনা ইমাইল্লাহ চরসিন্দুরের উদ্যোগ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসা স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট নুরুন্নাহার বেগম-এর সভাপতিত্বে এবং কুরআন পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে আরবী কাসিদা পাঠ করেন তুলি আক্তার। বক্তৃতাপর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ এবং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন রাহাতুল ফেরদৌস পুতুল, জোবেদা বেগম, হেলেনা বেগম এবং সভাপতি সাহেবা। সভাপতি সাহেবার নযম পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এতে ৭ জন মেহমানসহ ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

নুরুন্নাহার বেগম

রংপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

১৫/০১/২০১৬ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রংপুরের উদ্যোগ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান স্থানীয় প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ডাঃ রেজওয়ানুল্লাহ্। নযম পাঠ করেন ডাঃ আশরাফুন্নেসা জ্যোস্না। অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন বিষয়াদির ওপর বক্তব্য পেশ করেন, সর্বজনাব খলিলুর রহমান, ডাঃ রেজওয়ানুল্লাহ্, মৌঃ শামসুল হুদা, খন্দকার মাহবুবুল ইসলাম, মসীহাজ্জামান (শাহীন), মনওয়ারুল হক এবং দিলরুবা জামান প্রমুখ। এরপর উর্দু নযম পেশ করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একজন জেরে তবলীগসহ মোট ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ

ভাতগাঁও-এ 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

দেশের খ্যাতনামা আলেম ওলামাদের ওয়াজ মাহফিল ও জুমুআর খুতবায় জঙ্গিবাদের বিপক্ষে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন পুলিশের মহাপরিচালক (আইজি) এ, কে সহিদুল হক। তিনি বলেছেন, জঙ্গি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকি স্বরূপ, এটি মানুষের কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তার এই মূল্যবান পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কাহারোল থানাধীন ৪টি মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন, মসজিদ কমিটির সভাপতি ও মসজিদ নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের নিয়ে গত ২৮ শে ডিসেম্বর সোমবার বিকালে আহমদীয়া মসজিদ ভাতগাঁও প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাহারোল থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) জনাব মনসুর আলী সরকার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুর রশিদ, প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. ভাতগাঁও। কুরআন তেলাওয়াতের পর অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মৌলবী শাহ আলম খান, তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের আদর্শ, ইসলামিক খেলাফতের গুরুত্ব ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করনীয় বিষয় তুলে ধরে বলেন, একজন নিরহ মানুষকে হত্যা করা, সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। সবশেষে ওসি সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যগণকে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে দেশের কল্যাণে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। দেশ ও জাতির মঙ্গল, নিরাপত্তা কামনা করে দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়। উক্ত আলোচনা সভা স্থানীয় দু'টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

মৌ. শাহ আলম খান

ফতুল্লায় নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়

গত ০১/০১/২০১৬ ফতুল্লা বাজামাত তাহাজ্জুদ আদায় করে ইংরেজী নববর্ষ ২০১৬ কে স্বাগত জানায়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত নামাযে ২৯ জন সদস্য অংশ নেন। নামায শেষে জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হাসেম, বীর প্রতীক, নববর্ষের শুভেচ্ছা ও দোয়া পরিচালনা করেন। তাহাজ্জুদ নামায পড়ান মৌলবী এনামুল হক রনি।

ডাঃ আবু নাছের

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা

গত ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ রোজ শনিবার বাদ মাগরীব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মহান সীরাতুন নবী (সা.) জলসা মৌড়াইল হালকার মরহুম সালেক আহমদ সাহেবের বাড়ির হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। কায়েদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আতাই রাব্বি, নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে নাবিল আহমদ স্বপ্ন ও নূর উদ্দিন আহমদ। এতে মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় জীবনাদর্শের ওপর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন জনাব মেহেদী হাসান আকাশ, মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা সমাপ্ত হয়। শেষে একটি তবলিগী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২৫জন খোদ্দাম, ৭জন আনসার, ২২জন আতফাল, ০৩জন মেহমান, ৩৫জন লাজনা নাসেরাতসহ মোট ৯২জন উপস্থিত ছিলেন।

ইশতিয়াক আহমদ নির্জন

শালসিড়ী জামা'তে তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ রোজ শুক্রবার থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া শালসিড়ীর উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও ইজতেমা পালিত হয়। ৩১ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় স্থানীয় কায়েদ জনাব সালেহ আহমদ এর সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সানোয়ার হোসেন দ্বিপ এবং নযম পেশ করেন সাজ্জাদ আহমদ দেওয়ান। বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌ. ইসরাইল দেওয়ান, স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. সেলিম আহমদ কাজল, স্থানীয় নাযেম আতফাল জনাব শাহরিয়ার নাজিম জয় এবং নায়েব জেলা কায়েদ ডা. শের আলী। প্রতিদিন ক্লাসের পর বিকেলে খেলাধূলা প্রতিযোগিতা হয় এবং শেষের দিন ধর্মীয় প্রতিযোগিতা হয়। এতে ১৩০ জন আতফাল উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে দোয়ার মাধ্যমে আতফালদের তালিম তরবিয়তী ক্লাসের কার্যক্রম শেষ হয়।

মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম

হেলেঞ্চাকুড়ি মজলিসে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

হেলেঞ্চাকুড়ি মজলিস গত ২৬/১২/২০১৫ তারিখ হতে ০১/০১/২০১৬ পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী আতফলুল আহমদীয়ার স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস সুসম্পন্ন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ৬ ঘন্টা ৬ দিন ক্লাস নেয়া হয়। ০১/০১/২০১৬ তারিখ শুক্রবার ১ দিনের ইজতেমা করা হয়। এতে ক্লাসে নিয়মিত অংশগ্রহণকারী ৮ জন আতফাল বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। ৮ জন আতফাল ২ জন শিশু ছেলে ও ৪ জন ছোট নাসেরাত নিয়মিত ক্লাস করেন। নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বা জামা'ত তাহাজ্জুদ নামাযেও তারা অংশ নেয় এবং শুক্রবার বাদ জুমুআ পুরস্কার বিতরণ ও মাধ্যমে দোয়ার পর সমাপ্ত হয়। রিজিওন ও জেলা প্রতিনিধি ২ জন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তালিম তরবিয়তী ক্লাসকে সফলতা দানের জন্য যারা যেভাবে শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ্ সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

মৌ. শাহ্ আলম খান

ফতুল্লায় সপ্তাহব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৩/১২/২০১৫ হতে ৩০/১২/২০১৫ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ফতুল্লার উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস সাফল্যজনক ভাবে সম্পন্ন হয়। উক্ত ক্লাসের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ডা. কামরুল হাসান সরকার, কায়েদ এর দোয়ার মাধ্যমে। প্রতিদিন ক্লাস পরিচালনা করেন মৌলবী এনামুল হক রনি। সপ্তাহব্যাপী ক্লাস শেষে ০৩/১২/২০১৫ইং প্রতিযোগিতা নেওয়া হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় মজলিসের কায়েদ, জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম মোস্তফা ও স্থানীয় মোয়াল্লেম। উক্ত ক্লাসে ১১ জন আতফাল ও ৭ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন।

ডা. কামরুল হাসান সরকার

লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের ৪র্থ কেন্দ্রীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের পরিচালনায় ৫দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকার বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগে সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত ক্লাসে ২০টি স্থান থেকে লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যারা অংশ নেয়-যার মধ্যে রয়েছে, তেজগাঁও, ঢাকা, মাদারটেক, ফতুল্লা, মিরপুর, চরসিন্দুর, নারায়নগঞ্জ, হুসনাবাদ, মাহিল্যা, নুসরাতাবাদ, তারুয়া, খুলনা, উত্তর বাহেরচর, কবিরপুর, আশুলিয়া, আশকোনা, সিলেট, পটুয়াখালী এবং ক্রোড়া। এতে সর্বমোট ১৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয় যার মধ্যে ৭৮জন লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যা, ৪৮ জন নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যা, ১০জন শিশু এবং ১জন নও মোবাইন। ক্লাস শেষে কৃতী ছাত্রীদের মাঝে সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

সিলেটে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৮/১২/২০১৫ তারিখ হতে ২২/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সিলেট এর উদ্যোগে ৫ দিন ব্যাপী ৪র্থ তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাসে কুরআন নাযেরা ও মুখস্ত সূরা, দোয়া, হাদীস, অর্থসহ নামায ও দ্বীনিমালুমাত প্রশ্ন শিখানো হয়েছে। তালিম তরবিয়তী ক্লাস নেন মৌ. মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মওলানা সৈয়দ মুজাফ্ফর আহমদ এবং ভারপ্রাপ্ত কায়েদ জনাব শরিফুল হক। ২২ ডিসেম্বর বাদ যোহর সমাপনী অনুষ্ঠান হয়। এতে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ ইকবাল চৌধুরী সভপতিত্ব করেন। তরবিয়তী আলোচনা করেন মওলানা সৈয়দ মুজাফ্ফর আহমদ। সবশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তৃতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেয়া সহয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস সমাপ্ত হয়।

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মাহিগঞ্জে মহান বিজয় দিবস পালন

গত ১৬/১২/২০১৫ রোজ বুধবার সকাল ৯টায় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন আকরামুল হাসান আকাশ ও দোয়া পরিচালনা করেন মাহিগঞ্জ জামা'তের সেক্রেটারী মাল জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এবং আহাদনামা পাঠ করেন নাযেম সেহত-ই-জিসমানী জনাব গোলাম রাব্বি। এরপর জাতীয় সংগীত পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করা হয়। তারপর মহান বিজয় দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মৌ. আসলাম আহমদ। এরপর খেলাধূলা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়।

গোলাম রাব্বি

মাহিগঞ্জে তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৬/১২/২০১৫ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৫ তারিখ পর্যন্ত আতফালুল আহমদীয়া মাহিগঞ্জ এর তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন নাযেম আতফাল জনাব গোলাম রাব্বি। ক্লাসের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মৌ. আসলাম আহমদ ও জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের ২য় বর্ষের ছাত্র রনি আহমদ। ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেয়া হয়। শেষে পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। এতে ২৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

গোলাম রাব্বি

ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ই ডিসেম্বর বাদ ফজর আহমদী পাড়া এলাকায় এক ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত হয়। এতে খোদ্দাম ৫ ও আতফাল ১০জন অংশ নেয়। ওয়াকারে আমলে মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ, মসজিদের আশপাশ, আহমদী পাড়া মসজিদের সামনের রাস্তা, কবরস্থান এর সামনের রাস্তা ও কান্দিপাড়া এলাকার উত্তর পূর্ব দিকের পুরো রাস্তা পরিস্কার করা হয়।

আতাই রাব্বি

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হিউম্যানিটি ফার্স্টের সেবাদান কার্যক্রম

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর ব্যানারে মানব সেবামূলক একটি কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক এর অনুমোদনে জেলা নিয়াজ মুহাম্মদ স্টেডিয়াম মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানকালে একমাত্র বরাদ্দকৃত স্টল ছিল হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর মানব সেবা দানের ভেন্যু। দিবসের দিন ভোর ৬.৩০মি.-এ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর মোহতরম কায়েদ সাহেবের পরিচালনায় খোদ্দামরা স্টেডিয়ামে নির্ধারিত স্টলে সেবা দান কার্যক্রম শুরু করে।

অত্র মজলিসের ৩৬জন স্বেচ্ছাসেবক খোদ্দাম ও আতফাল যেসব বিভিন্ন সেবা দান করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি পান, রক্তের গ্রুপ সনাক্তকরণ, ওজন পরিমাপ, রক্ত চাপ পরীক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা। মুক্তিযোদ্ধা, জেলা প্রশাসন এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, পুলিশ ও শিক্ষার্থীরা এই সেবা গ্রহণ করে অনেক খুশি হন এবং এ সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মহতী এ কর্মসূচীর প্রতিবেদন চ্যানেল ২৪-এ দেখানো হয় এবং স্থানীয় ৮টি দৈনিক পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশ করে।

দেলোয়ার হুসেন মুন্না

মনোহরদীর রামপুরে ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৫ইং রোজ শনিবার নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার রামপুর গ্রামে নতুন মসজিদ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে কটিয়াদী/তেরগাতী মজলিসের উদ্যোগে এক বিশেষ ওয়াকারে আমল করা হয়। খোদ্দাম ও আতফাল ১৫ থেকে ২০ কি:মি: দূর হতে সাইকেল যোগে নতুন মসজিদে মাটি ভরাট করার জন্য ২১ জন খোদ্দাম ও আতফাল সমন্নয়ে সকাল ৯টা হতে দুপুর ২টা পর্যন্ত একটানা ৫ ঘন্টা মাটি ভরাটের কাজ করে। মসজিদের ভিত্তি স্থাপন উদ্বোধন করেন কটিয়াদী জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব এম.এ হান্নান, ডা: খালেদ আহমদ ফরিদ, মওলানা রাসেল সরকার ও স্থানীয় সদস্য জনাব শাহাব উদ্দিন। এ কর্মসূচী জনাব সুলতান আহমদ লিটন (কায়েদ) কটিয়াদীর নিগরানীতে সম্পূর্ণ হয়। দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল কর্মসূচী শেষ হয়।

সুলতান আহমদ লিটন

ক্রোড়ায় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৪ ডিসেম্বর হতে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে ২১তম স্থানীয় তালিম তরবিয়ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে ২৬ জন আতফাল এবং ১২ জন খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন। চারজন শিক্ষক এর সমন্বয়ে খোদ্দাম ও আতফালদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে জেলা মোতামাদ উপস্থিত ছিলেন।

কায়েদ, ক্রোড়া

ক্রোড়ায় বিজয় দিবস উদযাপন

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। তাহাজ্জুদ নামাযের পর ফজর নামায এবং পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। দিনব্যাপী খেলাধূলা হয় এবং বাদ মাগরিব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

কায়েদ, ক্রোড়া

পুরুলিয়ায় নববর্ষ উপলক্ষে তাহাজ্জুদ নামায

গত ৩১/১২/২০১৫ তারিখ দিবাগত রাত্রিতে ইংরেজী নববর্ষ ২০১৬ উপলক্ষে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া পুরুলিয়ার উদ্যোগে বিশেষ তাহাজ্জুদ নামাযের আয়োজন করা হয়। উক্ত নামাযে ১২জন অংশ নেন।

আল-আমিন হক তুষার

মাহিগঞ্জে নববর্ষ উপলক্ষ্যে তাহাজ্জুদ নামায

গত ০১/০১/২০১৬ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে খোদ্দামুল আহমদীয়া মাহিগঞ্জের উদ্যোগে ইংরেজী নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। এ উপলক্ষ্যে মাহিগঞ্জ জামা'তের কায়েদ জনাব আহমদ হোসেন ও মোয়াল্লেম মৌ. আসালাম আহমদের যৌথ বেদারীর মাধ্যমে সকল বাড়িতে গিয়ে তাহাজ্জুদ নামাযে অংশ নেয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। উক্ত তাহাজ্জুদ নামাযে ৩৮ জন অংশ নেন।

আকমল হোসেন মনির

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায়

কৃতজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকতার কল্যাণ অর্জনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী নববর্ষ ২০১৬ পদার্পণ উপলক্ষ্যে গত ৩১শে ডিসেম্বর' ১৫ইং তারিখ দিবাগত রাতে মসজিদুল মাহদী ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয়। এতে নামাযের ঈমামতি করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ বাংলাদেশ। নামাযে খোদ্দাম ৭৭জন সহ সর্বমোট ৮১জন মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন।

আকবর আহমদ সোহাগ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর উদ্যোগে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫ জানুয়ারী ২০১৬, শুক্রবার বিকাল ৪টায় তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আমাতুল হাফিজ। নযম পাঠ করেন মোছাঃ তাজবীহা রহমান। অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল, খাতামান নাবীঈন, ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ, ওফাতে ঈসা (আ.), দাজ্জাল ইয়াজুজ ও মাজুজ ইত্যাদি। উপস্থিতির সংখ্যা জেরে তবলীগ ১২ জন, লাজনা ৩ জন, নাসেরাত ২জন, খোদ্দাম ২ জন ও ১ জন আনসার। বিভিন্ন বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করেন মওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ। সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। মেহমানদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মোছাঃ সেলিনা আক্তার

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বেনিন এর বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় গত ১৮, ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বেনিনের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে জলসার মূল শিরোনাম ছিল 'আমরা আহমদী মুসলমান'। খোদ্দামরা স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে পুরো জলসা গাহ প্রস্তুত করেন। জামাতের এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অপরাহ্ন চারটায় জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জামাতের আমীর মোকাররম রানা ফারুক আহমদ সাহেব। এ সময় অতিথিদের মধ্য হতে মোকাররম ইমাম ইউসুফ ইগালী সাহেব শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন, তিনি বলেন, আজ কেবলমাত্র আহমদীয়া জামাতই সঠিক ইসলাম উপস্থাপন কছে। পোর্তনো শহরের গভর্ণরের প্রতিনিধি জামাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, আমরা এ কথার স্বাক্ষী যে, আহমদীয়া জামাত একটি শান্তিকামি জামাত। হাইতির রাষ্ট্রদূত বলেন, আহমদীয়া জামাত আমাদের অনেক সেবা করে, আমরা সর্বদা আপনাদের সাথে আছি।

মোকাররম আমীর সাহেব শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বৈশ্বিক উন্নয়নে আহমদীয়া জামাতের উদ্যোগ ও ভূমিকা সম্পর্কে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। সেন্ট্রাল রিপাবলিক আফ্রিকার কনসূলার জেনারেল আহমদীয়া জামাতের মানবসেবা মূলক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জলসায় নিমন্ত্রণ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। দ্বিতীয় দিন কান্ডি রিজিওনের একজন প্যারামাউন্ট চীফ তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এছাড়া স্থানীয় ভাষায়ও জলসার বিভিন্ন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, এর বিষয়বস্তু ছিল যুগ খলীফার দোয়া গৃহীত হওয়া সম্পর্কিত ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী।

জলসার চতুর্থ এবং সমাপনী অধিবেশনে অর্থোডক্স চার্চের পার্দ্রি, জাতীয় সংসদের সভাপতির প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা, একজন মিশরীয় ডেন্টাল সার্জন ডা. আহমদ, বেনিন এর জাতীয় সংসদের অতিরিক্ত সচিব এবং সুপ্রিম কোর্ট এর প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজ নিজ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। জলসার মোট উপস্থিতি ছিল ৪৩১৭জন।

কানাডায় তবলীগ স্টল স্থাপন

এই প্রথম বারের মত টরন্টোর ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল এক্সিবিশন, (একনা সিএনই)-তে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডা, তবলীগ স্টল স্থাপন করেছে। কানাডায় এ ধরনের প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে বড় এই প্রদর্শনীটি ২১ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সাল থেকে পরিচালিত এ প্রদর্শনীতে ১৩ লক্ষ মানুষ দর্শনার্থী করেন।

জামাতের স্টলের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'যুগ মসীহ্ আবির্ভূত হয়েছেন'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আপাদমস্তক একটি ছবি স্টলে চমৎকারভাবে প্রদর্শন করা হয়। স্টলের পরিধি ছিল ১০ ফুট বাই ১০ ফুট। অন্যান্য বই ও সাহিত্যের পাশাপাশি স্টলে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রদর্শন করা হয়। জামাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও তথ্যচিত্র পর্দায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। দর্শনার্থীদের স্বাগত জানাতে ও তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে জামেয়া আহমদীয়া কানাডার শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

জামাতের এই গোটা আয়োজনই "সিএনই"র প্রদর্শনীর দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। ১৮ দিনে ২,৮৪০ জন স্টলে এসে জামাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। এদের মধ্যে ৬৫০ জন বিস্তারিত আলোচনা করেন, এর মধ্যে কোন কোন আলোচনার দৈর্ঘ ১ ঘন্টারও বেশি ছিল। তারা ইসলামের শিক্ষা প্রচারে জামাতের এ ধরনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কানাডা জামাতের আমীর লাল খান মালিক সাহেব স্টলে এসে কিছুক্ষণ সময় কাটান।

আয়ারল্যান্ড জামাতের উদ্যোগে বন্যাকবলিতদের মাঝে সাহায্য বিতরণ

ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় নদী "শ্যানন" তীরবর্তী ক্যাচমেন্ট এলাকায় সম্প্রতি বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, যা কমপক্ষে ৪০০ বাড়ীঘরের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং প্রায় ৫০টি পরিবারকে নিঃস্ব করে দেয়। পাশাপাশি এ বন্যার ফলে হাজার হাজার কৃষি জমি লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আয়ারল্যান্ড এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অ্যাথলন শহরবাসীর উদ্দেশ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নেতৃত্বে ১৮ সদসস্যের একটি তরুণ দল গ্যালওয়ে, ডাবলিন, কিলডেয়ার, অ্যাথলোন এবং লংফোর্ড শহরে সাহায্যের জন্য ছুটে যায় এবং বন্যাদুর্গত এলাকায় রেডক্রস এবং সিভিল ডিফেন্স এর সাথে মিলিত হয়ে রাস্তার ওপরে বালুর বস্তা ফেলে। এ সময় এলাকার মানুষ যেন খাদ্য এবং বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারে সেটিও নিশ্চিত করা হয়।

উক্ত এলাকার আইরিশ সংসদ সদস্য গ্যাবরিয়েল ম্যাকফাডেন এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই মহতী উদ্যোগ সম্পর্কিত একটি সংবাদ পুরো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

একটি সংবাদ সম্মেলনে সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আয়ারল্যান্ড ড. মামুন রশিদ সাহেব বলেন, "মানবজাতি এবং স্বদেশবাসীর সাহায্য করা ইসলাম ধর্মের একটি মুল শিক্ষা, যা ভবিষ্যতে জাতীয় প্রয়োজনে যেকোন সময় খোদ্দামদের আরও সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাবে।" মহান আল্লাহ্ এই বিনীত প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করুন, আমীন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

Majlis Ansarullah, Bangladesh

4, Bakshibazar Road, Dhaka – 1211
Bangladesh

Phone: +8802-730-1117, Email: Sadr Majlis: atabshir@gmail.com; Qaid Umumi: sobhan.amj@gmail.com

অফিস আদেশ

মআবা/সদর/০০১/২০১৬-২০১৭ জানুয়ারি ১০, ২০১৬

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর বিগত মজলিসে শুরার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে হুযূর (আই.) খাকসারকে ২০১৬-২০১৭ সালের জন্য সদর এবং জনাব আবু নাঈম আল-মাহমুদকে নায়েব সদর সফে দওম হিসাবে নিযুক্তি প্রদান করেছেন। হুযূর (আই.) খাকসারের প্রস্তাবনা অনুযায়ী মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর নতুন মজলিস আমেলা ২০১৬ এরও অনুমোদন প্রদান করেছেন। নীচে পূর্ণাঙ্গ মজলিসে আমেলার তালিকা প্রদান করা হলো :

ক্রমিক	নাম	পদবী
০১	*আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী*	*সদর*
০২	*জনাব আব্দুল জলিল*	*নায়েব সদর আউয়াল*
০৩	*জনাব আবু নাঈম আল-মাহমুদ*	*নায়েব সদর সফে দওম*
০৪	*মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*	*নায়েব সদর*
০৫	*জনাব গোলাম কাদের*	*নায়েব সদর*
০৬	*জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল*	*নায়েব সদর*
০৭	*জনাব নাঈম আলম খান*	*নায়েব সদর*
০৮	*জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান*	*কায়েদ উমুমী*
০৯	*জনাব মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম মিঠু*	*কায়েদ তালীম*
১০	*জনাব ফজল-ই-ইলাহী*	*কায়েদ তরবীয়ত*
১১	*জনাব হাসিব আহসান রতন*	*কায়েদ তরবীয়ত নও-মুবাঈন*
১২	*জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম*	*কায়েদ ইসার*
১৩	*জনাব আবু তারেক*	*কায়েদ তবলিগ*
১৪	*জনাব এনাম আহমদ*	*কায়েদ জিহানাত ও সেহেতে জিসমানী*
১৫	*জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ*	*কায়েদ মাল*
১৬	*জনাব মসিহুর রহমান*	*কায়েদ ওয়াকফে জাদীদ*
১৭	*জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান*	*কায়েদ তাহরিকে জাদীদ*
১৮	*জনাব আবুল কাশেম ভূঁইয়া*	*কায়েদ তাজনীদ*
১৯	*জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	*কায়েদ ইশায়াত*
২০	*জনাব ইনসান আলী ফকির*	*কায়েদ তালিমুল কুরআন*
২১	*জনাব পারভেজ আহমদ ফারুকী*	*অডিটর*
২২	*জনাব শফিকুল হাকিম আহমদ*	*যয়ীম আলা, ঢাকা*
২৩	*জনাব আবু জাকির আহমদ*	*যয়ীম আলা, মিরপুর*
২৪	*জনাব মোহাম্মদ মাকসুদুল হক*	*যয়ীম আলা, তেজগাঁও*
২৫	*আলহাজ্জ নাজির আহমদ*	*কারকুনে খাস*
২৬	*জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান*	*কারকুনে খাস*
২৭	*জনাব সারোয়ার মোর্শেদ*	*কারকুনে খাস*
২৮	*জনাব হালিম আহমদ হাজারী*	*কারকুনে খাস*
২৯	*জনাব নাসিরুদ্দিন মিল্লাত*	*মোয়াবিন সদর*
৩০	*জনাব খালেদ বিন কাসেম*	*মোয়াবিন সদর*

মহান আল্লাহ্ তা'লা উপরোক্ত সকল নিযুক্তি মোবারক করুন এবং সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

আহমদ তবশির চৌধুরী
সদর

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

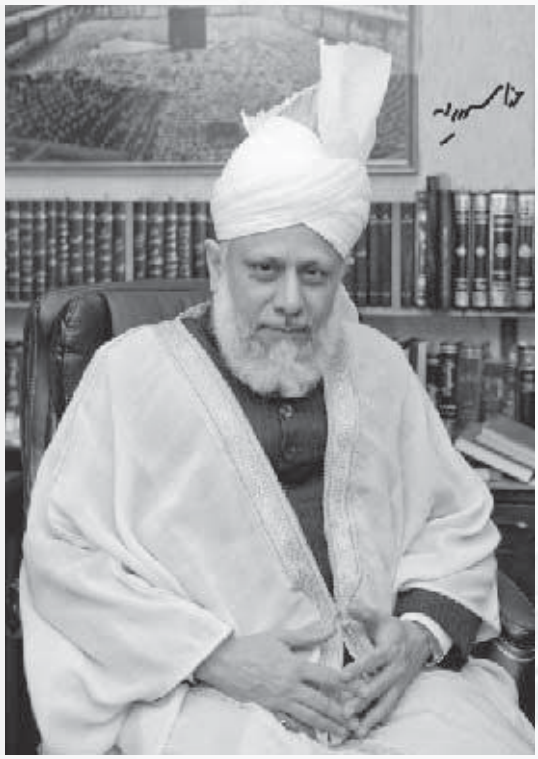

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

N AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. **78** | 14th & 15th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th February, 2016 Tk. 40.00
Regd. No. D. A.-12

গত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, দুই দিন ব্যাপী আঞ্চলিক সালানা জলসা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়ায় সফলতার সাথে সমাপ্ত। জলসায় বক্তব্য রাখছেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com